রহস্যময় রাজগৃহ

মনোরঞ্জন চক্রবর্তী

ভোলানাথ প্রকাশনী
৩৭/১১, বেনিয়াটোলা লেন • কলিকাতা-৯

এমন একদিন ছিল, যখন পাঠশালা নামক বিদ্যায়তনে কিশোর ছাত্রগণ গুরুমশায়ের কাছ থেকে বিদ্যা এবং জ্ঞানার্জনের সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত একটি যোগপ্রক্রিয়া লাভ করত। বিশুদ্ধ ভাষায় তাকে বলা চলে 'কর্ণবিমর্দন'। সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। শিক্ষা সংস্কারের প্রভাবে গুরুমশায়রা পাঠশালা সহ অন্তর্ধান করেছেন। কিন্তু পূর্বার্জিত সংস্কার নষ্ট হবার নয়। সত্যি-মিথ্যে জানি না; শোনা যায়, এখনও নাকি দিকপালগণ সর্ব লোকচক্ষুর অন্তরালে, গোপনে অন্তঃপুরে কোমল হস্তের যোগনির্দেশ গ্রহণ করেন।

তা আমি তো সর্বরসে বঞ্চিত ভোম্বল শ্রীগোবিন্দ দাস। বিদ্যালাভের জন্য পাঠশালায় যাবার সৌভাগ্য হয় নি। কোমল হস্তের যোগনির্দেশ লাভ করবার যোগ্য অন্তঃপুরও সৃষ্টি হয় নি। তবুও সংস্কারমুক্ত হতে পারলাম না। ললাটলিপি সেই 'কর্ণবিমর্দন' অক্ষয় হয়ে থাকল। তাই সমুদ্রমন্থনসঞ্জাত উর্বশীর মত, রেলের চাকরীজাত "পাশ সুন্দরী" তার কোমল হস্তে আমার শ্রবনেন্দ্রিয় আকর্ষণ ক'রে ইচ্ছেমত তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়।

এমনি এক তাড়নার শিকার হয়ে একদিন ভোরবেলা ঘুমঘুম চোখে বক্তিয়ারপুর ষ্টেশনে নেমে পড়লাম এবং রাজগীর গামী অন্য একটি ট্রেনে উঠেও পড়লাম। যথা সময়ে গাড়ী ছাড়ল।

রাজগীরে এটা আমার দ্বিতীয় যাত্রা। প্রথম যাত্রার সঙ্গে এর সময়ের ব্যবধান আনুমানিক দশ বছর। এই দশ বছরে আমার দেহে ও মনে কতখানি পরিবর্তন হয়েছে, তার পরিমাপ করা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। কিন্তু যে গাড়ীতে আমরা চলেছি, তার অঙ্গে এবং পরিবেশে পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়। সেদিনের সেই ছোটরেলের

কিশোরী-সুলভ গমনের মধ্যে ছিল নৃত্যছন্দ। আজ সময়ের ব্যবধানে এর অঙ্গে অঙ্গে যৌবনতরঙ্গ। বয়োপ্রাপ্তি জনিত সকল গরিমা আজ এর সর্বাঙ্গে পরিব্যাপ্ত। পরিপূর্ণতার সমারোহে আজ যেন লঘুপদে চলার পরিবর্তে পরিণত যৌবনের সুঠাম গমনভঙ্গী।

ছোট ছোট পায়ে চলা বালিকাকে সামান্য প্রলোভনে যাত্রাপথে বিরত করা যায়। বক্তিয়ারপুর থেকে ছেড়ে-আসা সেদিনের সেই ছোট্ট রেলগাড়ীটিও অতি সামান্য কারণেই যেখানে-সেখানে থেমে যেত। কিন্তু আজ এই গরবিনী সুঠাম গমনভঙ্গীর মধ্যে ক্ষুদ্র প্রলোভন জয় করবার মত বলিষ্ঠতা অর্জন করেছে।

: এই নিন স্যার, স্মোক করুন।

আপ্যায়নে মুখ ফিরিয়ে দেখি, এক ভদ্রলোক একটি সিগারেট আমার দিকে এগিয়ে ধরেছেন। দেখতে চেহারা একটু অবাঙ্গালীর মত, কিন্তু ভাষা পরিষ্কার বাংলা।

ভদ্রলোক সপরিবারে যাচ্ছেন। সঙ্গে যাঁরা আছেন মনে হয়, স্ত্রী এবং মেয়ে। কিন্তু এঁদেরকে দেখলে অবাঙ্গালী বলে বিশ্বাস করা কঠিন। আমি বললাম—

: থ্যাঙ্কস্, আমি অভ্যস্ত নই।

: মাদুলি নিয়েছেন নাকি ?

: না—না, মাদুলী নিই নি। এমনিই খাই না।

: আরে মশায়, এতো মদও নয়, গাঁজাও নয়। কালেধর্মে একটা খেলে আপনার সতীত্ব নষ্ট হবে না। আর তাছাড়া……

বলেই এদিক ওদিক একটু দেখে নিলেন। মনে হয় আমার সতীত্ব রক্ষার দায়িত্ব নিয়ে নিকটে কাছে কেউ আছে কিনা দেখলেন একবার। পুনরায় বলতে লাগলেন—

: আমি ত মশায়, বডিগার্ডের রক্তচক্ষুকে ফাঁকি দিয়ে সতীত্ব ধর্মে জলাঞ্জলী দিচ্ছি। ঐ দেখুন, আমার বডিগার্ডের রক্তচক্ষু দেখুন ! কিন্তু ওটা শরতের মেঘের উল্লম্ফন, বর্ষায় না।

বডিগার্ডের মুখ অন্যদিকে ছিল বলে প্রতিক্রিয়া বুঝতে পারলাম না। কিন্তু মেয়েটি তার হাসিমুখ অন্যদিকে ফেরাল। ভদ্রলোককে আর কিছু বলবার প্রয়োজন থেকে অব্যাহতি দেবার জন্যই আমি সিগারেট গ্রহণ করলাম। তিনি লাইটার ধরিয়ে হাত এগিয়ে দিতেই আমি বৈদিকযুগের অনুকরণে অগ্নি গ্রহণ করলাম।

তিনি বললেন—

: আপনি ত দেখলাম, ফার্স্টক্লাস-প্যাসেঞ্জার। কিন্তু এ গাড়ীতে ও বস্তু নেই। কাজেই আপনাকে কষ্ট করেই যেতে হ'বে।

: কষ্ট কেন? সকলেই যাচ্ছেন, আমিও যাচ্ছি।

: সকলে গেলে বুঝি আর কষ্ট থাকে না?

এই বলেই তিনি ভারতব্যাপী রেলের ব্যবস্থাপনায় তস্করবৃত্তির বাহুল্যের কথা বিশদভাবে বলতে লাগলেন। এই চৌর্যবৃত্তি বন্ধ না হ'লে যাত্রী সাধারণের কষ্ট কিছুমাত্র লাঘব হবে না—এরূপ ভবিষ্যৎ-বাণীও করলেন।

ভদ্রলোক জানেন না যে আমি রেলে চাকরী করি। যদি জানতে পারেন তবে হয়ত অপ্রস্তুত হবেন—একথাও ভাবছি। আবার ভাবছি যে ভদ্রলোকের অভিযোগ কতখানি সত্য। রেলে চুরি ইত্যাদি কিছু আছে কিনা, আমি জানি না। চুরি বন্ধ হ'লে যাত্রী-সাধারণের কষ্ট কতটা লাঘব হবে, তা অনুমান করাও আমার অসাধ্য। তবে একথা সত্যি যে "রেল" খুব ভদ্রলোক। এই যেমন আমি। সারাটা মাস কি করি, না করি সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র মনোযোগ না দিয়ে মাসান্তে বেতনটা ঠিক দিয়ে দেয়। হাজার হোক—কৃতজ্ঞতা বলে একটা কথা ত আছে! তাই কথার মোড় ঘোরাতে বললাম—

: আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

: বনবাসে।

: রামের বনবাস জানি। সীতার বনবাসও জানি। কিন্তু

আপনার বনবাসটা কি রকম ?

: ঐ রামেরই বনবাস। সীতাও সঙ্গে আছে।

: কিন্তু লক্ষ্মণ ?

: নেই। ঐটেই অভাব।

: তা বলে আমি লক্ষ্মণ হ'তে চাচ্ছি না। কিন্তু আপনার বনবাসের কাহিনী বলুন।

: কাহিনী আর কি বলব ? ঐ ব্যাটা দশরথের কাণ্ড।

আমি ভেবে চিন্তিত হ'লাম যে হয়ত অভিযোগটা ভদ্রলোকের পিতার বিরুদ্ধে। যদি তাই হয় তবে প্রসঙ্গ বন্ধ হ'লে বাঁচি। কিন্তু দেখলাম আমার অনুমান মিথ্যে।

তিনি বললেন—

: আমার সারাটা জীবন কাটল কলকাতায়। দিব্যি ভবানী-পুরের মত জায়গায় ছিলাম। ব্যাঙ্কে চাকরী করি। সারা জীবন ঘষতে ঘষতে এই চার-পাঁচ বছর হ'ল ব্রাঞ্চ-ম্যানেজার হয়েছি। এর মধ্যে বলে কিনা—তুমি রাজগীরে চলে যাও।

: রাজগীর ত ভাল জায়গা। লোকে কত পয়সা খরচ করে ওখানে যায়। আপনার দশরথ তো ভাল লোক মশায় !

: রেখে দিন মশায় ভাল লোক। ওখানে কোন ভদ্রলোক থাকে ?

চারদিকে তাকিয়ে স্থান এবং পাত্র বিবেচনায় আমি কণ্টকিত হ'লাম। বাংলা ভাষা সহযাত্রীদের কাছে কতটা বোধগম্য জানি না। কিন্তু রাজগীরে বসবাসকারীদের মধ্যে ভদ্রলোক নেই, এ-কথার বিন্দুমাত্র সারাংশ যদি তাদের বোধগম্য হয়, তবে আমার পক্ষে অঘটন অনিবার্য্য। তাই প্রসঙ্গ বন্ধ করবার জন্য আমি চোখে-মুখে যতটা সম্ভব নির্লিপ্ততার ভাব ফুটিয়ে তুললাম।

প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তিত হ'ল। এক অন্ধ ভিক্ষুক এলো। কণ্ঠে তার সঙ্গীত। ভাষা আমার কাছে দুর্বোধ্য। ভিক্ষুকের পেছনেই এক

বালকের স্কন্ধদেশ থেকে বিলম্বিত হারমোনিয়মের সুর যোজনা। সুরযোজনা এই জন্যে যে, দু'জন একসঙ্গে আছে—একজনের কণ্ঠে সঙ্গীত, অপরের যন্ত্রে সুর। এই যোগাযোগ ভিন্ন, দুইজনের মধ্যে কোনও যোগসূত্র আছে, এরূপ মনে করবার কিছু কারণ নেই।

আমি তখনও জানি না যে ঐ সঙ্গীতের মধ্যে আমার আশঙ্কার বীজ লুক্কায়িত ছিল।

আমার নব পরিচিত ভদ্রলোক হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে চিৎকার করে সঙ্গীত বন্ধ করালেন। আবার কোন নতুন বিপদের আশঙ্কায় আমি কণ্টকিত হলাম।

যাকে নিয়ে বিভ্রাট, সে হতবুদ্ধির মত দাঁড়িয়ে আছে। যন্ত্র-শিল্পীও স্তব্ধ। কিন্তু একমাত্র আমি ভিন্ন, যাত্রীসাধারণ কমবেশী উত্তেজিত।

আমি মনে মনে বললাম, "ওগো বহুজন-বল্লভা পাশসুন্দরী, আমি তো নিজের সত্ত্বা বিসর্জন দিয়ে তুমি যেমন চালাও তেমনি চলি। তবে এই নিরীহ গো-বেচারিকে ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়ে রজ্জুসংবদ্ধ করে এনে অকারণে এই বিপদের মুখে ফেললে কেন?"

ভদ্রলোক এত উত্তেজনাতেও বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে যা বললেন, তার অর্থ এই যে রুচি এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এখনও কলকাতায় শেখবার অনেক কিছু আছে, এটা অনেকের কাছে শুনতে অরুচিকর লাগলেও কথাটা সত্যি। তিনি আরও বললেন যে তিনি "ইধারকাই রণেবালা।" বাঙ্গালী নন। সুতরাং তার কলকাতার প্রশস্তি কোনও স্বজনতোষণের পক্ষপাত দুষ্ট নয়।

ভদ্রলোকের কথায় কতটা কাজ হ'ল জানি না, কিন্তু ষ্টেশন এসে পড়ায় বিদ্বেষটা ভদ্রলোকের ওপর থেকে সরে গিয়ে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে গেল। ভাবখানা এই যে স্বদেশের (সংজ্ঞা আমি জানি না) কুখ্যাতির বিচার মাথায় থাক্‌। এখন স্বদেশবাসীকে ঠেলে ফেলে সর্বাগ্রে নেমে যাওয়াটার মধ্যেই মর্য্যাদা নিহিত।

ভদ্রলোক আরম্ভ করলেন—

: আমি তো মশায়, রাণাঘাট, নৈহাটি, সোদপুরে গাড়ীতে গান শুনেছি। তার অর্থ আছে, রুচি আছে। কিন্তু এটা কি?

গানের মধ্যে অর্থহীন এবং রুচিবিগর্হিত কি ছিল আমি জানি না। সুতরাং নির্বোধের মত তাকিয়ে থাকলাম। তিনি বললেন—

: ওর গানের ভাষা কি জানেন?

: না।

: ও সীতার রূপ বর্ণনা করছিল।

: তা হ'লে তো ভক্তি-প্রাণ ব্যক্তি!

: ভাষা বুঝলে আপনি ও কথা বলতেন না।

আমি কিছু না জানার ভাব করে চুপ করেই থাকলাম। কিন্তু ভদ্রলোক নাছোড়বান্দা। তিনি বললেন—

: যৌবন সমাগমে নারী-দেহে যে সব লক্ষণ প্রকাশিত হয়, সীতারও তা হয়েছিল। কিন্তু সীতার রূপ বর্ণনায় ঐ সব কুরুচিপূর্ণ কথা ছাড়া ও আর কিছু পেলে না?

: তা হ'লে বলতে হয় কালিদাসের নব্য সংস্করণ।

এতক্ষণে ভদ্রমহিলা আমার দিকে তাকালেন। মনে হয় আমার বয়েসটা অনুমান করবার জন্য। তারপর স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন—

: সুযোগ পেলে তোমাদের বিক্রম প্রকাশের মাত্রাজ্ঞান থাকে না। ঐ অন্ধ বেচারা কি বলেছে না বলেছে তার মানেও ও হয়ত জানে না। তাতেই তোমাদের ভীষ্মদেব শুকদেবের সদাজাগ্রত নীতিবোধ অতলে তলিয়ে গেল!

ভদ্রলোক হেসে হেসে বলতে লাগলেন—

: ভীষ্মদেব শুকদেব আমরা হ'তে যাব কেন? তবে......

: চুপ কর। তোমাদের সবতাতেই বাড়াবাড়ি। এতই যদি তোমাদের নীতিবোধ তবে "শকুন্তলা" "রঘুবংশ" পড়তে তোমাদের

বাধে না কেন ?

: ওরে বাবা, তার নাম কালিদাস। তার সঙ্গে এই শ্রীমানের তুলনা ?

বলেই ভদ্রলোক দুই চক্ষু মুদ্রিত করে আবৃত্তি আরম্ভ করলেন—

"ইমাং তটাশোক-লতাং চ তন্বীং স্তনাভিরাম স্তবকাভিনম্রাম্।

ত্বৎপ্রাপ্তি বুদ্ধ্যা পরিবব্ধুকামঃ সৌমিত্রিনা সাশ্রুরহং নিষিদ্ধঃ॥"

আমি বললাম, ইতর-জনকে অর্থটা বুঝিয়ে দিন।

মেয়েটি এতক্ষণে চিৎকার করে উঠল—

: বাবা, তোমাকে ব্যাখ্যা করতে হবে না। এখানে তোমার ছাত্র কেউ নেই।

লজ্জারক্ত মুখখানা তুলে একবার আমার দিকে তাকিয়ে মুখটি নিচু করে নিল। নিজের বাচালতায় নিজেই লজ্জিত হ'লাম। আমি দেবভাষায় প্রাজ্ঞ নই বলে অর্থটা সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারি নি। কিন্তু এতক্ষণে বুঝলাম উপরোক্ত শ্লোকের মধ্যে কালিদাসের শৃঙ্গার রস বিদ্যমান। আমি পরে এই শ্লোকের সন্ধানে কালিদাসের "রঘুবংশে"র ত্রয়োদশ স্বর্গের বত্রিশ নম্বর শ্লোকটি খুঁজে বার করেছি। এই অনুসন্ধানের প্রচেষ্টায় আমি রস-সাগরের সন্ধান পেয়ে ধন্য হয়েছি। রাবণ কর্তৃক সীতা অপহরণের পরিণতিতে, বিরহ-কাতর রামচন্দ্র উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পুষ্পিতা অশোক শাখাকে সীতাভ্রমে আলিঙ্গন করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। রামচন্দ্রের বিভ্রান্ত নয়নে অশোকতরুর পুষ্পস্তবক সীতা দেবীর স্তন বলে প্রতিভাত হয়েছিল। অর্থবোধ না থাকায় সেদিন আমি এরই ব্যাখ্যা ভদ্রলোকের কাছে শুনতে চেয়েছিলাম। মেয়েটি সেদিন তার বাবাকে নিবৃত্ত করার মধ্যে আমার কোনও অভিসন্ধি অনুমান করেছিল কিনা কে জানে।

গাড়ী এসে ষ্টেশনে দাঁড়াল। নাম দেখলাম, "বিহার-শরীফ্"। "শরীফ্" অর্থে মুসলমান সম্প্রদায়ের তীর্থস্থান বোঝায়। মনে মনে ভাবলাম যে আমাদের তো দেব-দেবী সমন্বিত তীর্থস্থানের

অভাব নেই। কিন্তু ওদের এ কী তীর্থস্থান কে জানে।

এর আগে যখন এসেছিলাম, তখন আমার বয়স দশ বৎসর কম ছিল। বয়স বাড়লে নানা যন্ত্রণা। এখন মনে নানা প্রশ্ন আসে। ওয়ার্ডস্‌ওযার্থ তাঁর বিখ্যাত কবিতা "Immortality"তে বলেছেন, "The things which I have seen I now can see no more". একথাও যেমন সত্যি, আবার "যা আমি দেখিনি, তা আমি দেখছি" একথাও তেমনি সত্যি। দশ বছর আগে "বিহার-শরীফ্‌" শুধু একটা ষ্টেশনের নাম মাত্র ছিল। আজ তার মধ্যে প্রশ্ন জেগে উঠেছে। আমি বললাম—

: এটা মনে হয় মুসলমান সম্প্রদায়ের কোনও তীর্থস্থান।

ভদ্রলোক বললেন—

: চুপ করুন স্যার। তীর্থস্থান শুনলেই প্রণামী দিতে হবে।

ভদ্রমহিলা মৃদু হেসে বললেন—

: তোমার পয়সা আদায়ের ফন্দিতে পৃথিবীতে যত তীর্থস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে পুনরায় মৃদু হেসে বললেন—
: হ্যাঁ ভাই। সুফি সম্প্রদায়ের সিদ্ধ ফকির মখদুম শাহ শরফুদ্দিন মনেরী এই বিহার-শরীফে দেহরক্ষা করেন এবং এখানে তাঁর সমাধি আছে। এখানে "চিরাগ" উৎসবের সময় অনেক লোক-সমাগম হয়।

আমি বললাম: রাজগীরে এঁরই নামে মনে হয় একটি কুণ্ড আছে।

: ঠিকই বলেছেন। বিপুলগিরির উত্তর-পশ্চিম পাদদেশে উষ্ণ জলের কুণ্ডটি এঁরই নামে। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলেরই ঐ কুণ্ডে স্নানের অধিকার আছে। মখদুমের নামকরণের পূর্বে এই কুণ্ডের নাম ছিল, "ঋষ্যশৃঙ্গ কুণ্ড"।

মনে মনে ভাবলাম "রাজগীর" নামে অধুনা পরিচিত যে ক্ষেত্রটি

এখন খাজা আর প্যাড়ার জন্য বিখ্যাত হয়ে আছে, সেখানে ত্রেতা-দ্বাপরে চরণ-ধূলো দিতে কেউ বাকী নেই। রামায়ণ, মহাভারত, পূরাণ ইত্যাদিতে রাজগীরের গুণগান করতে কেউ বাকী রাখে নি। কিন্তু এই ঋষ্যশৃঙ্গ সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করতেই ভদ্রলোক বললেন—

ঃ ঋষ্যশৃঙ্গ বেচারা হরিণীর গর্ভে ছয়মাস কাটিয়ে যখন জন্ম নিলেন তখন তাঁর মানুষের মত দেহ, বৃহস্পতির মত বুদ্ধি, সরস্বতীর মত জ্ঞান আর হরিণের মত একজোড়া সিং।

আমি বললাম ঃ এতো অদ্ভুত সমন্বয়!

ভদ্রলোক বললেন ঃ মাতৃকুল এবং পিতৃকুলের সহাবস্থান। হরিণীর গর্ভে জন্ম হলেও বিভাণ্ডক মুনির পুত্র।

আমি বললাম ঃ এত বড় একজন মুনি নিজের সন্তানের ঐ শৃঙ্গগুলোর কিছু একটা ব্যবস্থা করলেন না?

ঃ বড় বড় রাজসভায় তাঁর নিমন্ত্রণ হ'ত। তিনি ঐ শিং দুলিয়ে দুলিয়ে যেতেন এবং দশরথের পুত্রহীনতার তিনি সমস্যা-সমাধান করে এলেন। কিন্তু নিজের সমস্যা থেকেই গেল।

বড়ই ব্যথিত হৃদয়ে ভদ্রমহিলা এবার স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন—

ঃ ঠাকুর-দেবতা নিয়ে এত উপহাস করতে নেই।

ঃ আমি কাহিনী বলেছি মাত্র। উপহাস ত করি নি।

ভদ্রমহিলার মুখখানা দেখে আমি অন্তরে ব্যথা অনুভব করে বললাম—

ঃ দিদি, আপনার মুখ থেকে আমি মখদুম শাহের কথা শুনব।

আবেদনে দিদি শান্ত হয়ে বলতে লাগলেন ঃ রাজগীরে গেলে দেখতে পাবেন কুণ্ডের কাছ থেকে সিঁড়ি উঠে গেছে পাহাড়ের ওপর একটা ছোট গুহা পর্য্যন্ত। ঐ গুহাটিকে "দেবদত্ত গুহা" বলা হয়। মখদুম শাহ মাঝে মাঝে এই গুহায় বাস করতেন।

মেয়েটি এতক্ষণে কথা বলল। কিন্তু সামান্য ক'টি কথা বলতে তার দেহের অর্দ্ধেক রক্ত মুখে চলে এলো।

: সেই লাল দাগের কথা বললে না মা?

: কি জানি বাপু। আমার অত মনে থাকে না। তুই বল্ না।

মেয়েটি কথা বলবে কি! সে মায়ের পিঠের ওপর মুখটা ঘষে ঘষে আরও লাল করে ফেলল। সে একবার আমার দিকে তাকিয়েই পুনরায় মায়ের পিঠের ওপরে মাথাটি রেখে অন্যদিকে তাকিয়ে বলতে লাগল: ঐ দেবদত্ত গুহা পার হয়ে সিঁড়ি দিয়ে আর একটু উঠলে আর এক জায়গায় পাথরের ওপরে একটা লাল দাগ দেখা যায়। লোকে বলে মখদুম শাহ যখন এখানে ছিলেন তখন একটি বাঘ তাঁকে আক্রমণ করতে এলে তিনি অলৌকিক শক্তিবলে ঐ বাঘকে নিহত করেন। নিহত বাঘের রক্তে পাথরটি লাল হয়ে আছে।

আমি বললাম: একজন মহাপুরুষের পক্ষে অলৌকিক শক্তিবলে একটা বাঘকে হত্যা করা হয়ত সম্ভব হ'তে পারে। কিন্তু লৌকিক রক্তচিহ্ন চিরস্থায়ী হল কি করে তাই ভাবছি।

ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি গম্ভীর হয়ে বলে উঠলেন: নিপীড়িত বাঘের লাল সেলাম ঐ রক্ত-চিহ্নে চিরস্থায়ী হয়ে আছে।

সকলে হেসে উঠলাম, এমন কি ভদ্রমহিলা পর্যান্ত।

[দুই]

রাজগীরে পৌঁছে ষ্টেশন প্লাটফরমের বাইরে এসে চক্ষুস্থির। পূজার ছুটি প্রায় এসে পড়েছে। ছেলেমেয়েদের ইস্কুল ছুটির সুযোগে যে অগুণতি লোক কলকাতা থেকে বেরিয়ে পড়েছে, তার বেশ একটা বড় অংশ মনে হয় রাজগীরে চলে এসেছে। স্ত্রী-পুরুষ ছেলে-মেয়ে মিলিয়ে একটা বিরাট জনতা মালপত্র নিয়ে অসহায় অবস্থায় বসে আছে। ষ্টেশন থেকে শুনেছি রাজগীর শহর এখন বেশ কিছু দূরে। সুতরাং বাহন ছাড়া এখন গন্তব্যস্থলে যাবার উপায় নেই।

কমবেশী দশ বছর সময়ের ব্যবধানে রাজগীরের চিত্রে এই পরিবর্তন দেখে আমার বিস্মৃতপ্রায় প্রতিবেশী-কন্যা সুরমার কথা মনে পড়ল। সুরমা আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী অভয়দার একমাত্র আদরিনী মেয়ে। শিশুহীন আমাদের গৃহেও সুরমার বড়ই আদর। হঠাৎ একদিন বদলীর চাকরীতে অভয়দার দূর দেশে যাবার ডাক এলো। অভয়দা, তাঁর স্ত্রী এবং সর্বোপরি সুরমা সকলে মিলে অনেক চোখের জল ফেলে এবং আমাদের অনেক অশ্রুপাত ঘটিয়ে বিদায় নিলেন। বেশ কিছুদিন মায়ের মুখে অন্ন রুচল না এবং আমাদেরও বেশ নিরানন্দেই দিন কাটল। মহাকালের বিধানে একদিন আমরা সকলে সুরমার কথা ভুলেই গেলাম। দিন বয়ে যায়।

একদিন সকালে দেখি আঙ্গিনায় একটি মেয়ে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি কোনও অপরিচিতা মেয়ে মনে করে মাকে ডাকব ভাবছি, এমন সময় সে এগিয়ে এসে আমাকে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করল, "জেঠিমা কোথায়?" কণ্ঠস্বরে বুঝলাম মেয়েটি অন্ধ

কেউ নয়—আমাদের সুরমা। কুশল বার্তাদি বিনিময় হ'ল, মা এলেন, সুরমাকে ভেতরে নিয়ে গেলেন—সবই হ'ল। কিন্তু দশ বছর আগে ফেলে আসা সেই অন্তরঙ্গতা ফিরে এলো না। সমস্ত অতীতকে বিস্মৃত হয়ে অন্তঃপুরের সামনে এসে সেই সুরমা থমকে দাঁড়িয়েছে। আমি মনে মনে ভাবলাম, ভালমন্দের বিধানদাতা অন্তরীক্ষের দেবতা সেদিনের সেই ছোট্ট মেয়েটির ছোট ছোট পায়ে নৃত্যছন্দে চলার গতিকে স্তব্ধ করে, রাজ্যের লজ্জা-সরমের বোঝা চাপিয়ে আজ আঙ্গিনার পাশে এনে দাঁড় করিয়েছে। এও বুঝি সৃষ্টিকর্তার রূপরসে ভরা সৃষ্টির মহিমা।

সেই সৃষ্টির মহিমা অঙ্গে ধারণ করেই বুঝি আজ ট্রেনখানা আগের মত কেন্দ্রস্থলে প্রবেশ না করে, শহরের বাইরে থমকে দাঁড়িয়েছে। সময়ের ব্যবধানে অর্জিত সর্ববিধ অঙ্গসজ্জা সত্বেও অন্তঃপুরে অবাধ প্রবেশের পথ তার কাছে আর অবারিত নয়।

ষ্টেশন আর শহরের মধ্যে যাত্রী বহনকারী যানবাহনের মধ্যে টাঙ্গা এবং রিক্সই প্রধান। দু'একখানা ট্যাক্সিও দেখা গেল। কিন্তু সব মিলিয়ে তারা অপেক্ষমান যাত্রীর তুলনায় নিতান্তই নগণ্য। ফলে যে কোন একটি বাহনকে দূরে আসতে দেখলেই নারী-পুরুষ মিলে দৌড়ে গিয়ে তাকে ঘিরে ধরছে। বিধাতার আশীর্বাদে দৈহিক সম্পদের অধিকারিণী কোন কোন মহিলা অল্প আয়াসে বাহন সংগ্রহে সক্ষম হলেও, পুরুষদের মধ্যে যাঁরা কৃতকার্য্য হচ্ছিলেন তাদের সহায় বাহুবল।

উপরোক্ত গুণরাশির কোনটাই আমার নেই। সুতরাং গন্তব্য-স্থলে পৌঁছাবার শেষ যাত্রী আমি—এইরূপ ভেবে প্রায় নিস্পৃহ হয়েই ছিলাম।

অদূরে হোল্ডলের ওপরে বসা একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোকের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং মুখখানার ভাব দেখে আমার মনে হ'ল কোনও দুষ্টু ছেলে কিছু অন্যায় কাজ করতে

করতে হঠাৎ ধরা পড়ে গেলে যেমন হয়, এ যেন তাই। তিনি একটু এগিয়ে এসে বিনয়ে বিগলিত হয়ে আমাকে তার হোল্ডলের ওপরে বসতে বললেন। কোনও সম্মানিত অতিথি সমাগমে তাঁকে অভ্যর্থনায় যেমন গৃহস্থের মুখখানা হয়, এও তেমনি। আমি মনে মনে ভাবলাম যে একেবারে "বিনয়ে"র অবতার। মনে মনে নাম রাখলাম "বিনয়বাবু"।

কিছু কথা বলা দরকার। দাঁড়িয়ে থেকেই বললাম: গাড়ী-ঘোড়ার যা অবস্থা দেখছি, তাতে আজ সারাদিনে শহরে গিয়ে পৌঁছতে পারব, এমন মনে হয় না।

সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক বিনয়ে দন্তরাজির প্রায় বারো আনা অংশ অবারিত করে দক্ষিণে এবং বামে মস্তক আন্দোলনের দ্বারা আমাকে সমর্থন করলেন। আমি বললাম—

: তা হ'লে কি আজ এখানেই থাকতে হবে? তা তো হয় না।

এ বিষয়েও তিনি একমত। অর্থাৎ তিনিও স্বীকার করলেন যে এখানে থাকা যায় না। আমি বললাম—

: কিন্তু যাবার উপায় ত কিছু দেখছি না।

: তা অবশ্যি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

: আমার কিন্তু মনে হয় হেঁটেই চলে যাওয়া যায়।

: আমারও মনে হয় সেটা অসম্ভব নয়।

: কিন্তু রাস্তা যদি বেশী হয়?

: তা রাস্তা বেশী হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নয়।

: তবে?

তার ভাবনার দৌড়টা চিন্তা করতে করতে একটা অঘটন ঘটল: আমি এবং বিনয়বাবু সর্ব বিষয়ে একমত হয়ে যখন আলাপে রত তখন পেছন থেকে একটা "দাদা" ডাক পুনঃ পুনঃ কানে আসছিল। আমি মনোযোগ করি নি, কারণ, আমার কোনও অনুজ উপস্থিত নেই। কিন্তু আহ্বান-কর্তার হস্ত সঞ্চালন অনুসরণ করে বিনয়বাবু

জানালেন যে আহ্বানের লক্ষ্য আমি।

নিজের ললাটকে চিরদিন দগ্ধ বলেই জানি। কিন্তু কি অসম্ভব ব্যাপার! একটা গোটা টাঙ্গার ওপরে মোটে একটি ভদ্রলোক বসে আছেন এবং তিনিই আমাকে যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন।

আমি অঙ্গ সঞ্চালনে এবং চোখে-মুখের অভিব্যক্তিতে যতটা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা সম্ভব, তাই করে একহাতে সুটকেশ এবং অন্য হাতে ছোট হোল্ডলটি নিয়ে জয়যাত্রায় অগ্রসর হতেই বিনয়বাবু পুনরায় বিকশিত দন্তপংক্তি নিয়ে নমস্কার জানাতেই আমার সম্বিৎ ফিরে এলো। মনে মনে ভাবলাম যে ভদ্রলোক গদগদ হয়ে আমাকে এত সমাদর করলেন আর আমি কিনা নিতান্ত স্বার্থপরের মত তাঁকে ফেলে রেখে এগিয়ে চলেছি!

আমি আহ্বান-কর্তাকে ইঙ্গিতে আমার অসহায় অবস্থার কথা জানাতেই তিনিও ইঙ্গিতে বিনয়বাবুকেও আমন্ত্রণ জানালেন। বিনয়বাবু ইঙ্গিতে সহযাত্রিনীকে দেখালেন। ভদ্রমহিলার পেছনটা ছিল আমার দিকে আর মুখখানা ছিল আহ্বান-কর্তার দিকে। সম্ভাব্য সহযাত্রিনীর সাহচর্য্য-প্রস্তাবে আমাদের আহ্বান কর্তা উৎ-সাহের বন্যায় টাঙ্গা থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লেন। বুঝলাম আমার না-দেখা আননখানির প্রভাব সামান্য নয়।

আমি ত বিনয়ে বশ হয়েছি। একমাত্র দারোগাবাবু ছাড়া বিনয়ে কে বশ না হয়। দারোগাবাবুদের শুনেছি বশীকরণের ভিন্ন উপকরণ আছে। কিন্তু আমাদের উদার আহ্বান-কারীর আতিশয্য দেখে ভদ্রমহিলার রূপ সম্বন্ধে আমার অনুমান বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত হ'লাম। কিন্তু শালীনতার প্রশ্নে নিস্পৃহ থাকলাম।

নিজ নিজ মালপত্র তুলে দিয়ে আমরা সকলে উঠে বসলাম। আমি এবং স্বয়ং কাণ্ডারী সম্মুখ দিকে আর বিনয়বাবু সঙ্গিনী-সহ পেছনে। কাণ্ডারী নানা অছিলায় মুখ ঘুরিয়ে ভদ্রলোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কথাবার্তা ছাড়াও পুনঃ

পুনঃ মুখ ঘোরাবার অন্য কারণ ছিল কিনা জানি না।

আমাদের লম্ফঝম্পের পালা শেষ। এবার যার কর্মকুশলতায় আমাদের এগিয়ে যাবার ভরসা, সে কিন্তু পাঠশালার অবাধ্য ছেলের মত গোঁ ধরে দাঁড়িয়ে থাকল। এ যেন সেই অসহযোগ আন্দোলনের দৃশ্য।

মহাত্মা গান্ধী নির্দেশিত অসহযোগ আন্দোলনে যেমন বৃটিশ সরকারের আস্থা ছিল না, অবাধ্য ঘোড়ার অসহযোগেও তেমনি চালকের আস্থা নেই। মৃদু ভর্ৎসনায় যখন কাজ হ'ল না তখন চাবুকটি আস্ফালন করতে করতে মনিব ঘোড়ার পিতৃকুল এবং মাতৃকুলের সঙ্গে যুগপৎ এমন সব পরস্পর-বিরোধী বৈবাহিক আত্মীয়তা-সূচক সম্বোধন করতে লাগল, যা শাস্ত্রমতে অমার্জনীয়।

তা যতই পরস্পরবিরোধী হোক, আত্মীয়তা-স্থাপনে কাজ হ'ল। ঊর্দ্ধপুচ্ছ হয়ে কিছু কিছু জৈব ক্রিয়া সমাপনান্তে ঘোড়া রথ সহ এগিয়ে চলল।

আমি বিনয়ে বশ হয়েছি, ঘোড়া আত্মীয়তায় বশ হয়েছে আর আমাদের কাণ্ডারী অজ্ঞাত কারণে বশ হয়েছে। এইরূপ পরস্পর-বশীভূত আমরা ক'জন এগিয়ে চললাম।

কাণ্ডারী তখন আমাদের নিজ নিজ অবতরণ-ক্ষেত্র জানতে চাইলেন। তখনো জানি না যে আমাদের ক্ষেত্র জানতে পারলে তিনি নিজের ক্ষেত্র স্থির করবেন।

আমি বললাম : আমাকে যেখানে হয় নামিয়ে দেবেন। আমি থাকবার মত যা হোক কিছু একটা জায়গা দেখে নেব।

ইতিমধ্যে বিনয়বাবুর সঙ্গে তাঁর সঙ্গিনীর কি আলোচনা হতেই তিনি বললেন : আমরা ভুবনেশ্বর পাণ্ডার বাড়ীতে যাব। এবং উনিও আমাদের সঙ্গেই যাবেন।

আমি অনেক কষ্টে এই পরামর্শদাত্রীর মুখখানা দেখাবর লোভ সম্বরণ করলাম। আমার ত ভোজনং যত্রতত্র শয়নং হট্টমন্দিরে।

সুতরাং ভূবনেশ্বর না হয়ে পাতালেশ্বর হ'লেও কিছু আপত্তি নেই। কিন্তু এই অযাচিত আতিথ্যে আনন্দিত হব না শঙ্কিত হব, এই কথা ভাবতে ভাবতে নব-পরিচিত কাণ্ডারীর নির্দেশে একটা হোটেলের সামনে গাড়ী থামল।

মালপত্র নিয়ে নেমে যাবার আগে তিনি আমার কানে কানে গাড়ীর ভাড়া বিষয়ে নির্দেশ দিলেন এবং বিনয়বাবুকে ডেকে নীচে নামিয়ে তাঁকেও অনুরূপ কিছু বললেন।

আরও কিছুদূর এগিয়ে মাঠের প্রান্তে এক বিশাল অশ্বত্থগাছের নীচে গাড়ী এসে দাঁড়াতেই বুঝলাম যে সংলগ্ন নানা আকৃতি এবং প্রকৃতির গৃহগুলোর সমন্বয়ে ভূবনেশ্বরের ভূবন।

আমি নেমেই ভাড়া মিটিয়ে দেবার জন্য পকেটে হাত দিতেই বিনয়বাবু নিতান্ত দুর্বিনীত হ'য়ে দৌড়ে এসে আমাকে ক্ষান্ত করলেন। আমি নিষেধের সম্ভাব্য উৎসস্থলের সন্ধানে মুখ ঘোরাতেই দেখি, আমার দ্রষ্টব্য মুখশ্রী বিপরীতমুখী। বিনয়বাবু টাঙ্গাওয়ালার সঙ্গে এমন একটা অর্থনৈতিক হস্তান্তর করলেন যে গ্রহীতা জনে জনে সেলাম জানাল এবং ভবিষ্যতে প্রয়োজনে তাকে আহ্বানের অনুরোধ জানিয়ে বিদেয় হ'ল।

বুঝলাম আমি স্বাধীনতা হারিয়েছি। বিনয়বাবু বিকশিত দন্ত এবং প্রসারিত দৃষ্টিদ্বারা যথাসম্ভব বিনয় প্রকাশ করে বললেন: মণি বলছে……

তিনি পুনরায় বললেন: মণিমালা বলছে যে—বলেই তিনি পার্শ্ববর্তিনীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন।

"শব্দব্রহ্ম" কথাটি শুনেছি কিন্তু অর্থবোধ হয় নি। "মণিমালা" নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আমার সমগ্র চৈতন্য দৃষ্টিশক্তির মধ্যে কেন্দ্রীভূত হতেই সম্মুখে যাকে দেখলাম তার হাস্যময় প্রশান্ত দৃষ্টি আমার ওপরে আবদ্ধ। তারই নাম মণিমালা। সে বিনয়বাবুর সঙ্গিনী। কিন্তু কী অধিকারে জানি না।

মণিমালা আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে গলবস্ত্র হয়ে আমার পায়ের ধূলো নিয়ে নিতান্ত দ্বিধাহীন ভাবে বলল: আমার এই মামাটিকে বলেছিলাম, "মামা গো! বিদায় বেলার প্রণামটা বাকী থাকল। রওনা হয়ে যাবার সময় যেন দেখা পাই।" তারপর থেকে উন্মুক্ত দ্বারপথে দাঁড়িয়ে কত অজ্ঞাত পদশব্দে সচকিত হ'তে হ'তে দেখলাম, ট্রেন এলো, বাঁশী বাজিয়ে মসীকৃষ্ণ ধোঁয়া ছেড়ে চলেও গেল। কোথায় আমার মামা! আমি ভাবলাম, আমার কপালে শুধু বিষের ধোঁয়া।

তারপরেই মৃদু হেসে আবার বলল: সেই বকেয়া পাওনা আজ এতদিন পরে আদায় হ'ল। আমি যে কাবলীওয়ালা, মামা।

দেনাপাওনার হিসেব নিকেশে সচকিত হয়ে সহসা চপ্পল পরিহিত অনাবৃত-প্রায় নিজের চরণযুগলের দিকে তাকিয়ে দেখি, তা একেবারে ধূলি ধূসরিত। মনে মনে ভাবলাম যে মণিমালার প্রাপ্য যদি কিছু থাকে এবং তা যদি চরণধূলি হয়, তবে সুদসহ আদায় উসুলে কোন অসুবিধে নেই। কিন্তু চলার পথে সঞ্চারিত ধূলিরাশি যদি চরণযুগল আশ্রয় করেই থাকে, তবে তার মধ্যে এমন কি ধনরত্ন লুকিয়ে থাকতে পারে—যার জন্য এই মণিমালা শবরীর প্রতীক্ষা নিয়ে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করে থেকে, আজ প্রাপ্তির আনন্দে ধন্য হ'ল।

কিন্তু বিধাতার একি পরিহাস! সাহিত্যের দরবারে অভ্যর্থনার মঙ্গল-শঙ্খ আমার জন্য নয়। তবে এত উপন্যাসের বিন্যাস আমার জন্যেই সঞ্চিত হয়ে থাকে কেন!

[তিন]

শৈশবে নামকরণ হয়, মানুষের চরিত্র গঠনের অনেক আগে। সুতরাং নামের অর্থ মানুষের চরিত্রে প্রতিফলিত হবে, এমন আশা কেউ করে না। তা সত্ত্বেও যদি নাম-মাহাত্ম্য চরিত্রে পরিস্ফুট হয় তবে তাকে কাকতালীয় বলি, আর ইংরেজিতে কয়েনসিডেন্স-ই বলি আশ্চর্য হতে হয়, এতে কিছু সন্দেহ নেই। এতক্ষণ যাকে 'বিনয়বাবু' বলেছি, তিনি যে সত্যি বিনয়বাবু—তা জানতে পারলাম যখন মনিমালা বলল—

: বিনয়বাবু, এইবার অতিথি সৎকারের ব্যবস্থা কর।

বিনয়বাবু আমার পরিচয় কতটা পেয়েছেন জানি না। আমিও বিনয়বাবুর পরিচয় কিছুই জানি না। বিনয়বাবু যেই হোন, তাতে আমার কিছু এসে যায় না। কিন্তু মণিমালার সঙ্গে তাঁর গ্রন্থি-বন্ধনের সূত্রটা কোথায়, এ কৌতূহল আমি মন থেকে কিছুতেই ঝেড়ে ফেলতে পারি নি।

মণিমালার অজ্ঞাত নির্দেশে এবং বিনয়বাবুর ব্যবস্থাপনায় ভুবনেশ্বরের ভুবনে আমার রাজগীর প্রবাসের ভবিতব্য যখন প্রায় স্থির হয়ে গেল, তখন আমি মনে মনে ভাবছি যে এই বন্ধন প্রথমেই ছিন্ন করা দরকার। মণিমালার গৃহিণীপনায় সববিধ নিশ্চিন্ত আরাম-প্রদ ভবিষ্যতের হাতছানি আমাকে নির্মম ভাবে উপেক্ষা করতে হবে। আমি বললাম: অনেক তো করলে, এবার বিদায় দাও।

: এটা কিন্তু নতুন।

: কোন্‌টা?

: এই যে ঘটা করে বিদায় নেওয়া।

: তুমি কি সেই কুচবিহারের কথা বলছ? না বলে না কয়ে

চলে গিয়েছিলাম—সেই আঘাত ?

: আপনি দু-পা এগিয়ে তিন-পা পিছিয়ে অজস্র চোখের জলে বিদেয় নেবেন—এমন দাবী আমি কি করে করব ? তার জন্য নয়। আর আজকের সমস্যাটা আমাকে ঘিরেও নয়। আমি ভাবছি আজ এই অবস্থায় চলে গেলে আমি বিনয়বাবুকে কি বলে বোঝাব ?

: কিন্তু এই বিদেশ বিভুঁইএ তোমাদের ক্লেশ দিতে চাই না।

: আমাকে ক্লেশ দিতে গিয়ে আপনার অনন্ত যন্ত্রণার কথা আমি তো জানিই। নতুন করে আর নাই বা জানালেন।

অদ্ভুত একটা দৃষ্টি আমার দিকে নিবদ্ধ করে হঠাৎ মণি বলে উঠল—

: ভয় নেই গো মামা, ভয় নেই। বিনয়বাবু সঙ্গে আছেন।

: কি আশ্চর্য! ভয়ই বা কিসের আর সে ভয় নিবারণের জন্য বিনয়বাবুকেই বা ডাকাডাকি করতে হবে কেন ?

: আপনি আমার গা ছুঁয়ে বলতে পারেন যে আপনি ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছেন না ?

: না, না। ভয়-ডর কিছু নেই আমার।

: যে ভয়ে আপনি কণ্টকিত, তার বিন্দুমাত্র আভাষ পেলে বিনয়বাবুর অন্তরে প্রতিফলিত হবে এবং তার ফলে ওঁর চোখে-মুখে এমন কাতরতা ফুটে উঠবে যে অন্যায়ের প্রবৃত্তি-দাতা অপদস্থ হবে। সুতরাং আপনি নির্ভয়ে অবস্থান করুন।

যোগানন্দবাবুর মৃত্যু-সংবাদ আমি কাগজে অনেকদিন আগে দেখেছি। এয়োতীর চিহ্নহীন মণিমালার বেশভূষায় তার সাক্ষাৎ মিলেছে। কিন্তু বিনয়বাবুর সঙ্গে তার লৌকিক সম্বন্ধটা এখনও অন্ধকারেই থাকল। শুধু বোঝা গেল যে মণির ওপরে কোনও পুরুষের প্রভাব বিনয়বাবুকে ব্যথিত করে। কিন্তু এই ব্যথা ঈর্ষা-প্রসূত হতে পারে কিংবা মঙ্গলকামনা-সম্ভূতও হতে পারে।

যাই হোক, আমার ভালমন্দ কিছু নেই। এই তো কতকাল

পরে দেখা। ক'দিন পরে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাব। কোথায় থাকব আমি, আর কোথায় বা থাকবে মণিমালা। হয়ত জীবনে আর দেখাই হ'বে না। আমার কি মাথাব্যথা।

অন্যদিকে চিন্তা করলে, আমার সাহচর্য্য কোন নারীর অন্তরে একান্ত কাম্য—এই অনুভূতির মধ্যে একটা রোমাঞ্চ আছে। তারপর সেই শিশুকাল থেকে ভাগ্য-দেবতা আত্মীয়-অনাত্মীয় কত জনের কাছে পাঠালেন। দূর-দূর করে ঠেলে না দিলেও, অভ্যর্থনার সমারোহ কোথাও মেলেনি। সুতরাং মণিমালার আতিথ্যকে উপেক্ষায় প্রত্যাখ্যান না করে তারই সাহচর্যে রাজগীর-প্রবাস আমার স্থিরই হয়ে গেল।

*

অপরাহ্ণে বিনয়বাবু এবং মণিমালার সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছি। "অজাতশত্রু" গড়ের কাছে এসে দুজনেরই গতি স্তব্ধ হ'ল। বুঝলাম গড়ের প্রাচীরের প্রাচীনত্ব এবং বিরাটত্ব উভয়েব দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আমি বললাম—

ঃ একে বলে "অজাতশত্রু গড়"।

মণিমালা হেসে জিজ্ঞাসা করল ঃ এ কেমন কথা হ'ল? শুনেছি পূরাকালে রাজারা গড় তৈরী করতেন শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্য। কিন্তু যার শত্রুই জন্মেনি, তার আবার গড়ের দরকার কি?

আমি মনে মনে ভাবলাম, নামে এবং চরিত্রে বিনয়বাবুর মত এত মাখামাখি কোথায় পাবে? মুখে বললাম ঃ নামটা অজাতশত্রু হলেও সে রাজার শত্রুর শেষ ছিল না। তাই আত্মরক্ষার জন্য গড় তৈরী করতে হয়েছিল।

এই কথা বলতে বলতে দেখি উভয়ের দৃষ্টি অন্যত্র নিবদ্ধ হয়েছে। আমি মুখ ঘুরিয়ে দেখি একটি তরুণী এগিয়ে আসছে। লক্ষ্য করতেই

বুঝলাম মেয়েটি আর কেউ নয়। এ সেই সকালে ট্রেনে দেখা ভদ্রলোকের মেয়েটি। সে চঞ্চল-পদে হাসিমুখে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। মনে ভাবলাম আমিই তার পরিচিত এবং তার আগমনের লক্ষ্য আমি। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই, সকালে যে লজ্জায় জড়সড় হয়ে বিশেষ কথাই বলেনি, শুধু মায়ের অঙ্গে মুখ লুকিয়েছে, অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে সে এত সপ্রতিভ ভাব কি করে আয়ত্ত করল!

একটু পরেই আমার ভুল ভাঙল। মেয়েটি এসেই প্রথমে বিনয়বাবু, পরে মণিমালাকে প্রণাম করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। ভাবখানা এই যে, আমি প্রণামের যোগ্য কি না, সেই বিচার চলছে।

সংসারে কামনা-বাসনা হয়ত আমার কিছু আছে; কিন্তু সংশয়ের বেড়ায় কণ্টকিত প্রণামে আমি রুচিবোধ না করে সম্ভাবনাকে এড়িয়ে যাবার জন্য পেছনে যাবার চেষ্টা করে দেখি, পশ্চাদপসরণের স্থান নেই। তাই বাধ্য হয়ে ওষুধ গেলার মত প্রণামটা গ্রহণ করতে হ'ল।

বিনয়বাবুর দিকে তাকিয়ে দেখি, বিনয়ের চিহ্ন লুপ্ত হয়েছে। তিনি বললেন: তুমি কবে এলে, আরতি?

: আজই এসেছি। বলে আমার দিকে একটু তাকাল। অর্থ এই, বিশ্বাস না হয় তো সাক্ষী হাজির।

বিনয়বাবু: তোমার বাবার খবর কি?

: বাবাও এসেছেন, মাও এসেছেন। আমরা সবাই এসেছি। বাবা তো বদলী হয়ে চলে এসেছেন।

: তাই নাকি? আমরাও আজই এসেছি।

: আমরা ক্লাসেই শুনেছি যে আপনি আজ এখানে আসবেন।

: এখানে তো এলে। কিন্তু ক্লাস খুললে কি করবে?

: কিছুই ঠিক হয়নি, স্যার। বাবা হঠাৎ বদলী হয়ে চলে

এলেন। হোষ্টেলে যদি জায়গা না পাই তবে বোধহয় পড়াশুনা বন্ধই হ'য়ে যাবে।

এতক্ষণে মণি কথা বলল:—পড়াশুনাটি বন্ধ করবার আগে একবার জানিও। তোমার মত মেয়ের যদি পড়াশুনা বন্ধ হয় তবে দুঃখ রাখবার জায়গা থাকবে না। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে মণি বলল: জানলেন মামা, এই আরতি ইতিহাসের ছাত্রী। অনেকেই ওর মুখ চেয়ে আছে।

আরতি তাড়াতাড়ি বলে উঠল: না, না, দিদিমণি, আপনি বাড়িয়ে বলবেন না।

: আচ্ছা, আচ্ছা—বাড়িয়ে বলব না।

আমি এতক্ষণে কথা বলবার সুযোগ পেলাম—তবে তো ভালই হ'ল। আমি আগেও একবার রাজগীরে এসেছি, আবার এলাম। কিন্তু বিশেষ কিছুই জানি না। শুধু শুনেই এলাম রাজগীরের প্রতি ধূলোকণায় ইতিহাস ছড়িয়ে আছে। কিন্তু সে ইতিহাস বিশেষ কিছু জানি না। অনেকেই যখন মুখখানার দিকে তাকিয়ে আছে, আমরাও থাকব।

আরতির আরক্তিম মুখখানা আনত হ'তেই বুঝলাম আমি কথাটা যতই সরলভাবে বলে থাকি না কেন, একজন তরুণীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকাটা শালীনতা বিরুদ্ধ—এটা আমি খেয়াল করি নি।

আরতি নিজেকে সামলে নিয়ে বলল: আমাকে ঐ "আপনি"-"টাপনি" বললে আমি ভয় পেয়ে যাব।

: অভয় দিয়ে বলতে পারি "আপনি" মায় "টাপনি" পর্য্যন্ত প্রত্যাহার করতে রাজী আছি। কিন্তু এক সর্তে।

: সেই সর্তটা এই যে কিছু জ্ঞান-দান করতে হবে?

আমি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম। ইতিমধ্যে মণি বলল—

: আপনি ইতিহাসের পাঠ নিতে থাকুন মামা, আমরা আপনার কাছ থেকে জেনে নেব। আজ আমরা একটু এগিয়ে যাই।

হঠাৎ আমার মনে হ'ল—আত্মীয়-অনাত্মীয় অনেকেই আমার বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে কমবেশী সন্দিহান—তা বোধহয় নিরর্থক নয়। এই দুই বেচারা আমাকে সমাদরে ডেকে আশ্রয় দিয়েছে এবং ভবিষ্যতের একটা অজ্ঞাত প্রতিশ্রুতিও আছে। আর আমি এতবড় বুদ্ধিহীন যে, প্রতিদানে নিজের অবাঞ্ছিত সঙ্গ দিয়ে এদের একান্ত মধুর সাহচর্য্যকে মাটি করতে যাচ্ছিলাম। এই মেয়েটি ইতিহাসের পাঠ দিয়ে আমার যত না মঙ্গল করবে, তার চেয়ে ওদের সঙ্গ থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন করে লজ্জার হাত থেকে রক্ষা করেছে। আমি বললাম—

: প্রথমে এই দুর্গ নির্মাণকারী অজাতশত্রুর কথা বল।

: আমাদের শিক্ষায়তনের ইতিহাস কিন্তু রাজগীরের এই জীর্ণ প্রাচীরের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে নি।

: যে প্রাচীরের মধ্যে কুকুর বেড়াল পর্য্যন্ত অনায়াসে প্রবেশ করছে, সেখানে অমন জ্ঞানীগুণীদের জিজ্ঞাসা কেন প্রবেশ করেনি —এটা কিন্তু রহস্য।

: মৌর্য্য সাম্রাজ্যের উত্থান থেকেই আমাদের ইতিহাসের প্রাচীন যুগের আরম্ভ। কিন্তু ততদিনে সাধের রাজগৃহ রাজাবিহীন অন্ধকার হয়ে গেছে। রাজধানী রাজগৃহ থেকে পাটলীপুত্রে স্থানান্তরিত হয়েছে।

: রাজগীর বিষয়ে যা কিছু কথা, সবই পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থও সাহায্য করেছে এবং লোক প্রবাদের ওপরও নির্ভর করতে হয়েছে।

: তা পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদিতে বর্ণিত কাহিনী কি নির্ভরযোগ্য নয়? তাছাড়া প্রবাদ জিনিষটাও তো একেবারে বাজে নয়। এই ধরণা, আমরা সবাই মিলে ভগবানের অস্তিত্বটা মোটামুটি বিশ্বাস করে নিয়েছি। কিন্তু ভগবানকে দেখে তো এ বিশ্বাসটা জন্মায় নি! লোকমুখে শুনেই তো আমরা বিশ্বাস

করেছি।

ঃ সে কি কথা? শুধু লোকমুখে শুনব কেন? শাস্ত্রাদি পাঠ করেও জেনেছি।

ঃ কথা তো একই হ'ল। শাস্ত্রাদি তো মানুষেরই কথা। মহর্ষি বাল্মীকিই বল, আর কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাসই বল—এঁরা তো মানুষই, না দেবতা?

আরতি ততক্ষণে আঙ্গুল দিয়ে কানদুটো বন্ধ করে ফেলে বলে উঠল ঃ ওমা! আপনি এই সব কথা বলেন। এ যে পাপ।

ঃ পাপ-পুণ্যের কথা জানি না। নিজের চোখে দেখেছেন বলে দু'চারজন অতিমানব যাঁরা দাবী করেন—তাঁদের কথা বাদ দিলে, তোমার আমার মত সাধারণ লোকেরা শাস্ত্রাদি পড়বারও অবকাশ পায় নি। তারা লোকমুখে শুনেই মোটামুটি বিশ্বাস করে নিয়েছে। অবিশ্বাসের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার জন্যই আমরা বিশ্বাস করেছি। সুতরাং লোকবর্ণিত পুরাণ, ইতিহাস আর কাহিনী অশ্রদ্ধা করি না। তুমি বলে যাও।

ঃ বাল্মীকি রামায়ণের দ্বাত্রিংশৎ সর্গে উল্লেখ আছে কুশ নামক রাজার পুত্র বসু পঞ্চ-পর্বতের মধ্যে গিরিব্রজ নামক নগর স্থাপন করেন।

ঃ পঞ্চ-পর্বত কোন্‌টা?

ঃ গয়া যাবার বাসের রাস্তা দিয়ে এগিয়ে গেলে দক্ষিণে ও বাঁয়ে পাঁচটি পাহাড় আছে। সে কথা পরে বলব।

এরপরে আরতি যে কাহিনী বলল তা হ'ল এই যে পঞ্চ-পর্বতের মধ্যবর্তী নগরে ত্রেতাযুগের ঐ রাজা বসু থেকে আরম্ভ করে দ্বাপর পার হয়ে একেবারে কলিযুগে বিম্বিসার পর্য্যন্ত, অর্থাৎ নবম অবতার ভগবান বুদ্ধ পর্য্যন্ত ঐ গিরিব্রজ সমগ্র মগধ রাজ্যের রাজধানী ছিল। মহারাজ বিম্বিসারকে কারারুদ্ধ করে তার পুত্র অজাতশত্রু রাজা হ'লেন

আমি বললাম : পিতাকে কারারুদ্ধ করে সিংহাসন লাভ করবার গৌরব তাহ'লে ঔরংজেবের আগে আমরাই অর্জন করেছি।

আরতি হেসে বলে উঠল : আপনি বুঝি বেশ গৌরব বোধ করছেন ?

: করব না ? আমাদের হ'ল বেদ, উপনিষদ, পুরাণ আর সংহিতার দেশ। আমাদের এই পুণ্যভূমিতে অত বড় বড় সব রথী মহারথী থাকতে, কোথাকার এক ঔরংজেব উড়ে এসে জুড়ে বসে, পিতাকে বন্দী করে সিংহাসন লাভ করবার মত মৌলিকতা অর্জনের ধৃষ্টতা পাবে কেন।

আরতি এবার জোরে হেসে ফেলেছে। সে বলল : ঔরংজেবের কৃতিত্বকে একেবারে ধুলোয় মিশিয়ে দেবার মত আরও উপকরণ আমাদের এই পুণ্যভূমিতে রয়েছে।

: কী সে উপকরণ ?

: বিম্বিসার-অজাতশত্রুর অনেক আগে, সেই কোন দ্বাপরে, মহামতি কংস তার বৃদ্ধ পিতা উগ্রসেনকে কারারুদ্ধ করে সিংহাসন অধিকার করেছিলেন।

: যাক্, তুমি রাজগৃহের কাহিনী বল।

: এই অজাতশত্রুই প্রাচীন নগরীর বাইরে, এই নতুন নগরী স্থাপন করেন। এই নবীন সহর খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে জন্মলাভ করে।

: আমাদের সামনে এই প্রাচীরের ধ্বংশাবশেষ তা হ'লে নতুন নগরী। নবীনার এই রূপ।

: পঞ্চ পর্বতের মধ্যে অবস্থিত প্রাচীন নগরীর ধ্বংশাবশেষ দেখলে এটাকে নবীনা বলতে আপনি একটুও লজ্জা বোধ করবেন না।

: তা অজাতশত্রুর নবীন দুর্গ মহাকালের চরণাঘাতে ভেঙ্গে খান-খান হয়ে গেছে তা বুঝলাম। কিন্তু মহাকাল কি ভাঙ্গবার সময়

মিস্ত্রী নিয়োগ করেছিলেন ?

: কেন ?

: দেখছ না ? ওপরটা কেমন সমান। যেন যত্ন করে কেউ একে সমানভাবে ভেঙ্গেছে।

: তার উত্তরে বলব, অনেকের ধারণা, প্রাচীরটা এতদূর পর্য্যন্ত গেঁথে তুলেই কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

: কারণ ?

: সে এক কাহিনী।

: কাহিনীটা বল।

: একদিন রাজা অজাতশত্রু সংবাদ পেলেন, বৈশালীর রাজা পাটলীপুত্রের কাছে গঙ্গা পার হয়ে রাজগৃহের দিকে এগিয়ে আসছেন। রাজধানীর বাইরে শত্রুকে প্রতিহত করবার জন্য এই দুর্গ নির্মাণ আরম্ভ করেন। বৈশালীর রাজা প্রতিপক্ষের প্রস্তুতির সংবাদ পেয়ে বিচলিত হয়ে ফিরে যান। শত্রুই যখন ফিরে গেল, দুর্গ নির্মাণও স্থগিত থাকল।

: এতো সেই গোপালভাঁড়ের কাহিনী হ'ল।

: কি রকম ?

: মাটিতে অগ্নি স্থাপন করে অনেক ওপরে ভাতের হাঁড়ি বসিয়ে বললেন, ভাত হ'লেই খেয়ে তিনি বেরিয়ে পড়বেন।

: কিন্তু এর সঙ্গে সে কাহিনীর সম্পর্ক কোথায় ?

: নেই ? পাটলীপুত্রের কাছে শত্রু গঙ্গা পার হয়েছে। সেখান থেকে শত্রুপক্ষ রাজগৃহে আসতে সময় নিলেও কত সময় নিতে পারে ? কিন্তু সেই আগতপ্রায় শত্রুকে প্রতিহত করবার জন্য যে দুর্গ তৈরী আরম্ভ হ'য়েছিল, কতদিনের মধ্যে সে নির্মাণ-কার্য্য শেষ হ'বে বলে তিনি আশা করেছিলেন ? এক গোপাল ভাঁড়ের পূর্ব পুরুষ ছাড়া এমন প্রস্তুতিপর্ব অন্য কারও দ্বারা সম্ভব নয়।

: অত চুলচেরা বিচার করতে গেলে আপনি রাজগৃহের কিছুই

জানতে পারবেন না। আমি তো বলছি, এসব ইতিহাস এখনও মাটির নীচে থেকে কিম্বা পাথরের স্তূপ থেকে বেরিয়ে এসে শিক্ষায়তনের কেতাবের পাতায় ওঠে নি। সুতরাং লোকবর্ণিত কাহিনী শুনে কিছু বাদছাদ দিয়ে আপনাকে একটা মোটামুটি ধারণা করতে হ'বে।

: সে সব পণ্ডিতরা করবেন। আমার কাজ, গল্প শোনা। তুমি বল।

: পণ্ডিতদের বিশ্রাম নেই। তাঁরা অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। পিপে পিপে নস্যি উড়ে যাচ্ছে। নানা দিকে বিচার চলেছে। ঐ বিনয়বাবু কেন এসেছেন জানেন তো?

: না।

: বিশ্ববিদ্যালয় ওঁকে পাঠিয়েছেন রাজগীরের উষ্ণ জলের গুণাগুণ বিচার করতে।

মনে মনে ভাবলাম, এইবার বোধহয় মণিমালা প্রসঙ্গ এসে পড়বে। বিনয়বাবু এবং মণিমালার গ্রন্থিবন্ধনের রহস্য হয়ত এইবার প্রকাশিত হ'বে। কিন্তু আরতি সে দিক দিয়ে গেল না। সে রাজগীরের জলের মহিমায় বলতে লাগল—

: অগ্নি-পুরাণে বলেছে, মলমাসের সময় রাজগীরের কুণ্ডে স্নান এবং শৈব ব্রত পালন করলে হাজার জন্মের পাপ দূর হয়।

: তা হ'লে মলমাসের সময় রাজগীরের কুণ্ডে স্নান করতে হ'লে পূর্ব-পূর্ব হাজার জন্মের সঞ্চিত পাপ-রাশির মোটামুটি একটা হিসেব জানা দরকার।

: তা আবার কারও পক্ষে সম্ভব নাকি?

: সম্ভব না হ'লে তো রি-এ্যাকসন্ হবে: পাপ থাকলে ধুয়ে যাবে—একথা যদি সত্যি হয়, তবে না থাকলে কি হবে?

: না থাকলে কিছুই হবে না।

: অত সহজে অব্যাহতি নেই। একটা উদাহরণ দিচ্ছি।

শরীরে যদি ম্যালেরিয়ার বীজ থাকে তবে কুইনাইন প্রয়োগে আরোগ্য হ'বে। কিন্তু একজন সুস্থ লোককে কুইনাইন প্রয়োগ করতে থাকলে ভাল হ'বে কি? তারপর আরও কথা। রোগের আক্রমণের তীব্রতা বুঝে ওষুধের পরিমাণ স্থির করতে হবে।

: তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন, অগ্নি-পূরাণ অসম্পূর্ণ। তাতে মানুষের কতটাপাপ থাকলে কতখানি স্নান দরকার—একপ চার্ট, টেবল্ ইত্যাদি থাকা উচিত ছিল।

: একেবারে খাঁটি কথা। বলেই দুজনে হেসে উঠলাম।

এর পরেই আরতির জিজ্ঞাসা : দিদিমণি কি আপনার আত্মীয়?

মনে মনে ভাবলাম, বিনয়বাবুর সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা জিজ্ঞাসা না করে মণিমালার সম্পর্ক জিজ্ঞাসা করার অর্থ বোধহয় এই যে, একজনের সম্বন্ধটা জানতে পারলে বীজগণিতের ফরমুলায় ফেলে অঙ্ক কষে অন্যের সম্পর্কটা বের করে ফেলবে। কিন্তু ফরমুলার রহস্য তো তার হাতে। সুতরাং আমি অন্ধকারেই থাকব। মুস্কিল হ'ল এই যে, আরতির দিদিমণির সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা কী—তা আমি কি করে বোঝাই। সে যে অনেক কথা।

আমার সমগ্র চৈতন্য, অনেকদিন আগে কুচবিহারে গার্হস্থ্য-জীবনের পটভূমিকায় মণিমালার জীবনের ওপর কেন্দ্রীভূত হ'ল। আমার সহপাঠী এবং মণিমালার নিজের মামা কাবেরীবান্ধব আমাকে সঙ্গে নিয়ে একদিন মণিমালার কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, "এও আমারই মত তোর আর একজন মামা।"

সেদিন থেকে আমিও মণিমালার মামা হ'লাম। তারপর থেকে পরীক্ষা পর্য্যন্ত যতদিন কুচবিহারে ছিলাম, প্রতিদিন পড়াশুনা এবং অন্যান্য কাজের অবসরে দিনান্তে অন্ততঃ একবার মণিমালার সঙ্গে দেখা করাটা আমার নিত্যকর্ম পদ্ধতির মধ্যে একটা হয়ে দাঁড়িয়ে-ছিল। সে দিনের সেই পুনঃ পুনঃ সংযোগের মাধ্যমে আমি যে বিষয়টা অনুমান করেছিলাম তা এই যে, বাইরে থেকে সর্বপ্রকার

প্রাচুর্য্যের অন্তরালে মণিমালার অন্তরে একটা প্রচ্ছন্ন বঞ্চিতের বেদনা বিদ্যমান ছিল। সে বঞ্চনার মূল কোথায় তা বুঝতে পারি নি। হঠাৎ আরতির কণ্ঠস্বরে আবার সম্বিৎ ফিরে এলো।

: কি হ'ল? আপনিও যে ঐ জীর্ণ প্রাচীরের মধ্যে মিশে গেলেন মনে হচ্ছে।

: সত্যি, অবাক হয়ে নানা কথা ভাবছিলাম। যাক্ তুমি কাহিনী বল। তুমি যাই বল আরতি, বৈশালীর রাজা যেই ফিরে গেল অমনি সঙ্গে-সঙ্গে দুর্গ নির্মাণ এতখানি এগিয়েও পরিত্যক্ত হ'ল—এটা বিশ্বাস হয় না। বৈশালীর রাজার মত পরিবর্তন হতে পারে—এমন আশঙ্কা কি অজাতশত্রুর ছিল না?

: আমিও তাই মনে করি, কারণ ইদানিং দুর্গ-মধ্যে যখন কার্য্য করে লোক বসতির চারটি স্তর পাওয়া গেছে। যে সব মূর্তি পাওয়া গেছে তা পালযুগের বলে অনুমান। এ কথা সত্য হ'লে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে এখানে লোক বসতি ছিল। আবার কিছু কিছু খৃষ্ট পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর বলেও মনে করা হয়।

: তা হ'লে বার-চৌদ্দ শ' বছর ধরে এর মধ্যে লোক বসতির চিহ্ন বর্তমান?

: সত্যি কথা। এইবার কুণ্ডের দিকে এগিয়ে চলুন।

[চার]

আরতির কথায় কুণ্ডের দিকে অগ্রসর হ'লাম। কিন্তু এগিয়ে যাবার আগে ঐ বিরাট প্রাচীর যেন আমাকে মায়ায় বেঁধে ফেলেছে। দীর্ঘ অধ্যুষিত সভ্যতার কত-না নিদর্শন ওর মধ্যে রয়েছে। আমার দেখবার বড় সাধ, একথা বলায় আরতি আমার মুখের দিকে তাকাল। তার চোখে মুখে একটা জিজ্ঞাসা। সে বোধহয় মনে মনে ভাবছে, প্রাচীন নিদর্শনের সঙ্গে অন্য কিছু দেখবার সাধ আমার মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে কিনা। স্থান, কাল এবং পাত্র কোনটাই ঘনায়মান সন্ধ্যার অন্ধকারে লোক-বিরল প্রাচীর বেষ্টিত প্রান্তরের মধ্যে কোনও কিছু অনুসন্ধানের অনুকূল নয়। সমাজের মধ্যে লোকচক্ষুর সমর্থন বলে একটা কথা আছে। পরিস্থিতি বুঝে আমি বললাম : থাক্ —এগিয়েই চল।

এগিয়ে যেতে যেতে আরতি বলতে লাগল : যে গড়টি দেখলেন, ওটা আঠার ফুট চওড়া তিন মাইল দীর্ঘ প্রাচীরে বেষ্টিত। আর ঐ দেখুন বাঁ দিকে একটি শীর্ণ জলধারা। ওটা একটি নদীর স্মৃতি-চিহ্ন মাত্র। নাম সরস্বতী। এককালে নাকি এই নদী বিশেষ বেগবতী ছিল।

তারপর বলল : ঐ নদীই নাকি এই গড় এবং পার্শ্ববর্তী লোকালয়ের পিপাসা নিবারণ করত।

আমি মনে মনে ভাবলাম, একদিন যে পিপাসা নিবারণ করত, আজ সে নিজেই আকণ্ঠ পিপাসা নিয়ে কোন উৎসের দিকে তাকিয়ে আছে। সংসারে এমন চিত্র দুর্লভ নয়।

আরতি বলল : ঐ ডান দিকে তাকিয়ে দেখুন দুর্গপ্রাচীরের গা থেকে সিঁড়ি নেমে এসেছে একেবারে নদী পর্য্যন্ত।

ঃ ওটা সিঁড়ি বলে আনন্দ লাভ করতে চাও তো কর। কিন্তু কতগুলো পুরোন ইঁট ছাড়া, সিঁড়ির চিহ্ন ওতে কিছু নেই।

ঃ ভাল করে লক্ষ্য করলে সিঁড়ির চিহ্ন পাওয়া যাবে।

ঃ তা টড্, মেগাস্থানিস্ অথবা হিউয়েন সাং কি বলেন?

ঃ ওমা! টড্, মেগাস্থানিস্ আবার কোত্থেকে এলো?

ঃ তা জানি না। তবে ভারত সম্বন্ধে জ্ঞানীগুণীদের কথায় সর্বদাই ওদের নাম শোনা যায়।

ঃ ওঁদেরকে গালাগাল দিয়ে লাভ নেই। আমরা তো সাতেও থাকি না পাঁচেও থাকি না। বেদ-উপনিষদের অজ্ঞাত মহিমা সজ্ঞানে কীর্তন করি। ও ভদ্রলোকেরা ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে দু'চার কথা বলতে গিয়ে সত্যি-মিথ্যে যাই বলুন না, তাই নিয়েই তো আমরা যাত্রা শুরু করেছি।

ঃ ছি ছি—গালাগাল দিতে যাব কেন। তাঁরা নিশ্চয়ই আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। তবে হিউয়েন সাং এখানে এসেছিলেন শুনেছি।

ঃ ভগবান বুদ্ধের চরণধূলিতে পবিত্র এই রাজগীরে হিউয়েন সাং এসেছিলেন। তাঁরই বিবরণীতে পাওয়া যায়, এই গড়ের পশ্চিমে ভগবান বুদ্ধদেবের দেহাবশেষের ওপর মহারাজ অশোক একটি স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন। সেই স্তূপের সামান্য নিদর্শন আজও বিদ্যমান। যদি সাধ হয় একদিন দুপুর বেলা বেশ কড়া রোদ দেখে বেরিয়ে পড়বেন আর প্রাণভরে দেখে আসবেন।

ঃ উপযুক্ত গাইড্ সঙ্গে থাকলে তবে তো দেখা সার্থক হ'বে।

আরতি আবার একবার প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। আমি ভাবি এখনও কি ওর প্রশ্নের শেষ হ'ল না। আমি কথাটা ঘুরিয়ে বললাম: কথা অনেকটা সেই রকম হ'ল। ক্রুশ্চেভ যখন রুশ দেশের প্রধানমন্ত্রী, তখন ঐ দেশের জনৈক ভদ্রলোক প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বুলগানিন বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করাতে তিনি একটি

স্থানের নাম করে বলেছিলেন—বুলগানিন অমুক জায়গায় আছেন। ইচ্ছে হ'লে টিকিট কেটে গিয়ে দেখে আসতে পারেন।

এরই মধ্যে দেখি বিনয়বাবু ও মণিমালা ফিরে আসছে। সঙ্গে আরতির বাবা। অর্থাৎ যিনি কলকাতাকে ভালবেসে আজই বক্তিয়ারপুর থেকে আসতে আসতে আমাকে প্রায় বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন। আরতির বাবার নাম আমি জানি না। আরতিকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম ওঁর নাম শ্যামসুন্দর মিশ্র। বিনয়-বাবু ও মণিমালার সঙ্গে তাঁর গভীর আলোচনা দেখে বুঝলাম, দুই পরিবারের মধ্যেও গভীর প্রীতি বিদ্যমান।

আমি একটা বেশ অভ্যর্থনার ভাব নিয়ে হাসিমুখে এগিয়ে যেতেই শ্যামসুন্দরবাবু উচ্চহাস্য করে বলে উঠলেন—

: এ ভদ্রলোক এখনও আমাদের সঙ্গ ছাড়েননি দেখছি।

আরতি : সকালে ওঁকে তুমি যতটা নিরীহ বেচারা ভেবেছিলে, উনি তা মোটেই নন।

: আমি ওঁকে নিরীহ বেচারা ভাবতে যাব কেন। তবে উনি একজন ভালমানুষ ভদ্রলোক—এটা ঠিক।

: উনি খুব হাসির কথা বলতে পারেন।

স্নেহের পাত্রী হলেও, সদ্য-পরিচিত আরতির মুখে জীর্ণ প্রাচীরের ধারে ছায়াঘন প্রদোষের প্রায়ান্ধকারে আমার বিষয়ে হাসিমুখে প্রশস্তি, মনে হয় মণিমালা হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করতে পারে নি। সে বলল : বেশ তো। কাল তোমাদের বাড়ীতে ডেকে নিয়ে বেশ করে হাসির কথা শুনো। কিন্তু মামা, বাড়ী ফিরে গিয়ে এই গড় সম্বন্ধে সব কথা শোনাতে হবে। আজ আপনার পরীক্ষা।

মনে মনে ভাবি, জীবনব্যাপী পরীক্ষার পালা আমার শেষ হবে না। এতক্ষণ আরতি প্রশ্নভরা মুখ তুলে আমাকে পরীক্ষা করেছে। এইবার মণিমালার পরীক্ষার পালা। এই ভাবখানা সামান্য প্রকাশ করতেই মণিমালা বলে উঠল : এখনও আপনার অনেক পরীক্ষা বাকী।

শ্যামসুন্দরবাবু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন : আজ বাড়ী ফেরা যাক্। নতুন জায়গায় আমার পুরাতন মানুষটি এতক্ষণ বাড়ীতে এক-একা কী করছে কে জানে !

এই কথা কয়টির মধ্যে পুরাতন মানুষটির জন্য শ্যামসুন্দরবাবুর মমত্ববোধ অপ্রকাশ থাকল না। আরতি তার বাবার সঙ্গে এগিয়ে গেল। বিনয়বাবুও সেই সঙ্গে। পেছনে একটু দূরে আমি এবং মণিমালা। আজ এতদিন পরে সাক্ষাতের পর থেকে এই প্রথম আমরা দুজনে 'একলা'।

আমি একান্তে মণিমালাকে বললাম : শ্যামসুন্দরবাবু সকন্যা এগিয়ে গেলেন। বিনয়বাবুও তাই। পেছনে থাকলাম নিরিবিলি আমি আর তুমি। তা ওর চোখে-মুখে কোন কাতরতা ফুটে উঠল। কিনা কে জানে।

: কিসের কাতরতা ?

: তুমি তখন বললে না—কিসের আভাষ-মাত্র বিনয়বাবুর চোখেমুখে কাতরতা ফুটে উঠবে।

মণি একটা কৌতুকমিশ্রিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল।

: সেতো আপনি ভয় পেলে, তবে। আপনি ভয় পেয়েছেন কি ? কিন্তু মামা, যতখানি ভালোমানুষ বলে নিজেকে আপনি প্রচার করতে চান, ততখানি ভালোমানুষ আপনি নন। আপনি একটি ভীষণ, কি বলব, বিচ্ছু।

: কোন্ অনিষ্ট আমি করেছি বল ?

: হা ভগবান ! অনিষ্ট করবেন আপনি ! আত্মরক্ষা করতে যাকে সবশক্তি নিয়োগ করতে হয়, অনিষ্ট করবার তার সুযোগ কোথায় !

: আত্মরক্ষা মানুষের ধর্ম।

: আত্মরক্ষা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। এটা না থাকলে আপনাদের ঐ সৃষ্টিকর্তার পক্ষে সৃষ্টিরক্ষা করা সম্ভব হত না। কিন্তু

মামা, দেখুন—ঐ সৃষ্টিকর্তাই, ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ভিন্ন ভিন্ন বিচিত্র আত্মরক্ষার উপায় নির্দ্ধারণ করেছেন। আমি যেটা বেঁচে থাকার উপায় বলে মনে করি, সেইটেই হয়তো আপনার আত্মরক্ষার অন্তরায়।

: সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য সহাবস্থান নীতি তো আর সম্ভব নয়।

: তা হ'লে দুজনের একসঙ্গে প্রগতিমূলক অগ্রগতির পন্থা কি বলুন না!

: তেমন ক্ষেত্রে একজন সরে যায়, এমন দৃষ্টান্ত তো দেখা যায়।

: তা তেমন দৃষ্টান্ত তো আমার চোখের সামনেই রয়েছে। তেমন আত্মরক্ষামূলক কৌশল আপনার ভালই জানা আছে।

: একটু পরিষ্কার হ'লে কথাটা বুঝতে সুবিধে হয়।

: কুচবিহারের গার্হস্থ্য-জীবনে আমার অব্যক্ত যন্ত্রণার কথা আপনি জানতেন বলে আমার ধারণা।

: কিছু কিছু অনুমান করেছিলাম।

: সেই যন্ত্রণার হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য আমার আকুলি-বিকুলির কথা কি আপনি বোঝেন নি?

: একেবারে বুঝি নি বললে মিথ্যে বলা হ'বে।

: বুঝেও, নিজের আত্মরক্ষাটাই আপনার কাছে বড় হয়েছিল।

: নিজেকে পঙ্ককুণ্ডে নিক্ষেপ করেও কি তোমাকে আমি বাঁচাতে পারতাম, মণি?

: কোন্‌টা আপনাদের পঙ্ককুণ্ড আর কোন্‌টা মানস সরোবর তা আপনারাই জানেন।

মণিমালার অভিযোগ বুঝতে আমার অসুবিধে হয় নি। তার যন্ত্রণার কথা আমি একেবারে জানতাম না, তা নয়। পরিষ্কার না হ'লেও কিছু কিছু অনুমান করেছিলাম। কিন্তু নিজেকে আমি তার মধ্যে জড়িয়ে ফেলতে চাই নি। মণিমালার সেই বন্ধন থেকে

নিজেকে নির্মম-ভাবে সরিয়ে নিয়ে আসাটাই তার অভিযোগের কারণ। পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে কুচবিহার থেকে আমার চলে আসার পালা। ওখান থেকে রওনা হ'বার আগের দিন সন্ধ্যাবেলা ওদের বাসায় গেলাম। প্রকাশ্য কারণটা হ'ল বন্ধু কাবেরীর সঙ্গে দেখা করা। অন্তরের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে অন্য কিছু কারণ ছিল— এ কথাটা স্বীকার করতে আজ আর লজ্জিত হবার কিছু কারণ নেই। ওদের বাসায় যেতে যেতে চারদিক অন্ধকার করে দুর্যোগ এগিয়ে এলো। সেখানে পৌঁছে দরজার কড়া নাড়তেই যে দ্বারমুক্ত করে দিল সে কাবেরী বান্ধব নয়, মণিমালা। সে আমাকে দেখেই বিশেষ সমাদরে ভেতরে নিয়ে এলো। আমি কাবেরীর কথা জিজ্ঞাসা করাতে সে বলল, বাড়ী নেই। যোগানন্দবাবুর এখন থাকবার কোন কথাই নয়। সুতরাং প্রশ্ন অবান্তর। সেই বাড়ীটার মধ্যে কেবল আমি এবং মণি ছাড়া কেউ নেই। চারদিক অন্ধকার করে তখন ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। এ অবস্থায় নিজের উপস্থিতিটা লোক চক্ষুতে অমার্জনীয় বলে মনে হতে লাগল।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে মণি এক কাপ চা নিয়ে এসে হাজির হ'ল। কিন্তু তার পোশাক-পরিচ্ছদের মধ্যে একটা পারিপাট্য লক্ষ্য করলাম। আমি চায়ের দিকে মনোযোগ দিতেই মণিমালা একেবারে আমার ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে চোখে-মুখে একটা ব্যাকুলতা ফুটিয়ে তুলে বলল, ঐ দুর্যোগের মধ্যে তার ভীষণ ভয় করছে। বলেই আরও ঘনিষ্ঠ হ'ল। পরিচয়ের পর থেকে যতদিন তার সঙ্গে মেলামেশা করেছি, ও-দিনের সান্নিধ্য যেন ভিন্ন প্রকৃতির বলে মনে হ'ল। অসমাপ্ত চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে দরজার দিকে এগিয়ে যেতেই মণিমালা একেবারে আমাকে নিবিড় ভাবে জড়িয়ে ধরল, যেন একটু আগে বলা তার সেই ভয় থেকে মুক্তির আশ্রয়। আমি কোনও মতে নিজেকে মুক্ত করে ঝড়-বৃষ্টি দুর্যোগের মধ্যে অন্ধকারের অন্তরালে অদৃশ্য হ'লাম। পেছন থেকে মণি চিৎকার করে বলেছিল—বিদায়-

বেলার প্রণাম বাকী থাকল। পরদিন রওনা হবার সময় পর্যন্ত সেই বিদায়-বেলার প্রণাম গ্রহণ করতে আমার আর যাওয়া হয় নি।

এই কথা ভাবতে ভাবতেই বিনয়বাবু পেছন ফিরে তাকালেন। সন্ধ্যার অন্ধকারে বিনয়বাবুর মুখে কাতরতা অথবা প্রফুল্লতা কোনটাই বুঝতে পারলাম না। কাছে যেতেই তাঁর মুখে দেখলাম পরিচিত সেই বিনয়ে গদগদ ভাব। বললেন : বাসায় এসে গেলাম।

অতি সাধারণ কথা। বিনয় প্রকাশের কিছুই প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আমিও বিনয়ে বশ হয়েছি। বিনয় ভিন্ন আমাকে বশীকরণের অন্য কিছু মন্ত্র ছিল কিনা—সে বিচার আমার দ্বারা অসম্ভব। আমি বললাম : তাই ত দেখছি।

আমিও এমন একখানা ভাব করলাম যেন বিনয়বাবু বাসায় পৌঁছে যাবার সংবাদ সময়মত জ্ঞাপন না করলে কিছু একটা বিপর্যয় ঘটে যেত। তাই আমি বিনয়ের সঙ্গে একটা কৃতজ্ঞতার ভাব প্রকাশ করলাম।

বাসায় চা-পানাদি শেষ করে মণিকে একলা পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম : শ্যামসুন্দরবাবুদের সঙ্গে তোমাদের কতদিনের পরিচয়?

: ভবানীপুরে আমরা পাশাপাশি ফ্ল্যাটে থাকি। আরতি ইউনিভারসিটিতে ভর্তি হবার পর থেকে বিনয়বাবু অর্থাৎ মাষ্টার মশায়ের মাধ্যমে ঘনিষ্ঠতা। অবশ্যি বিনয়বাবু বিজ্ঞানের মাষ্টার আর আরতি ইতিহাসের ছাত্রী।

আমার চোখে-মুখে কিছুটা কৌতূহল অনুমান করে মণিমালা মৃদু হেসে বলল : আরও কিছু-কিছু জানবার ইচ্ছে হচ্ছে বুঝি? লজ্জা কি? বলছি শুনুন।

: না, আমি কিছু জানতে চাই না।

: পেটে ক্ষিদে, মুখে লাজ নিয়ে কি লাভ মামা? শুনুন। ঐ আরতির মা আমাদের শকুন্তলাদি বিয়ের আগে শ্যামসুন্দরবাবুর সঙ্গে একসঙ্গে পড়াশুনা করতেন। দ্বারভাঙ্গা জেলার কোন এক

অজ্ঞাত শ্যামসুন্দরবাবু কলকাতায় পড়াশুনা করতে এসে আস্তে আস্তে দুষ্মন্তের ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'লেন।

: ক্রমে গান্ধর্ব মতে অনুষ্ঠান শেষ হ'ল বুঝি?

: কণ্ব মুনির দয়ায় মতটা গান্ধর্ব না হয়ে প্রচলিত উপায়েই শেষ হ'ল। কারণ শ্যামসুন্দরবাবুর পৈতৃক অবদান এবং নিজের প্রতিভা কোনটাই কণ্ব মুনি অবহেলা করতে পারে নি।

[পাঁচ]

পরদিন নিজে বেশ সচেতন ছিলাম যাতে বিনয়বাবু আর মণিমালা বৈকালিক পদযাত্রায় আমাকে অবাঞ্ছিত আমন্ত্রণের সৌজন্য প্রকাশে বাধ্য না হন। আমি যেন আমার সাহচর্যের দ্বারা তাঁদের নিভৃত সান্নিধ্যকে বিড়ম্বিত না করি।

বিনয়বাবুর বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসা কুণ্ডের জলের মধ্যে সীমাবদ্ধ— এটা শুনেছি। সুতরাং ব্রহ্মকুণ্ড এবং সপ্তর্ষিকুণ্ডকে সযত্নে পরিহার করে আপন মনে রাজপথ ধরে পঞ্চ-পর্বতের উপত্যকা দিয়ে এগিয়ে চলেছি। পিছন থেকে আসা একটি টাঙ্গাকে পথ ছেড়ে দেবার জন্য আমি যতই রাস্তার ধারের দিকে চলে যাচ্ছি, পশ্চাদ্ধাবনকারী টাঙ্গা যেন ততই আমার ওপরে এসে পড়েছে। খুবই বিরক্ত হয়ে পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখি টাঙ্গার ওপরে বসে আছেন শ্যামসুন্দর-বাবু, তাঁর স্ত্রী শকুন্তলা দেবী আর আরতি। শ্যামসুন্দরবাবু বললেন: দেখছেন কি? উঠে আসুন। আর একটু হ'লেই গাড়ী-চাপা পড়েছিলেন আর কি। কলকাতায় গরুর গাড়ী চাপা পড়লে, শুনেছি সরকার নিজ-খয়চায় তাকে তুলে নিয়ে কলকাতার বাইরে রেখে আসে। এখানে কিন্তু ঘোড়ার গাড়ী চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেলে তাকে গাড়ীতে তুলে নিয়ে...

বাকী অংশ তাড়াতাড়ি পূর্ণ করলেন শকুন্তলা দেবী।

: গাড়ীতে তুলে নিয়ে জরাসন্ধের আখড়ায় চলে যায়।

সামনের আসনে আরতি এবং তার বাবা। পেছনের আসনে একা শকুন্তলা দেবী। আমাকে আসন গ্রহণ করতে হ'লে শকুন্তলা দেবীর পাশেই করতে হয়। তাই মনে দ্বিধা।

শ্যামসুন্দরবাবুর চেঁচামেচিতে উঠে উপরোক্ত আসনে বসে

পড়লাম। পিতা কন্যার মুখের দিকে তাকিয়ে তার মনোযোগ অন্যত্র নিবদ্ধ দেখে, মুখটা এগিয়ে আমার কানের কাছে নিয়ে এসে কণ্ঠস্বরটা সহধর্মিণীর শ্রবণ-যোগ্য করে বললেন

: আর চাই কী? রথ-দেখা কলা-বেচা দুই-ই হ'ল।

আমি লজ্জিত হয়ে বললাম : নেমে যাব কিন্তু।

দেবী বললেন : শুনেছি, বৃদ্ধ না হ'লে মানুষ সুন্দর হয় না; আর দিন-দিন তোমার সেই সৌন্দর্য্য বিকশিত হচ্ছে। কিন্তু স্থান কাল, পাত্র বিবেচনাও তো মানুষ করে।

: স্থান, কাল, পাত্র বিচার-বোধই যদি আমার থাকবে, তবে ভবানীপুরকে আমি কণ্ব মুনির আশ্রম বানিয়ে তুললাম কি করে। বলেই হো হো করে হেসে উঠলেন।

প্রসঙ্গান্তরে যাবার জন্য তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলাম, গন্তব্যস্থল কোথায়? উত্তরে শ্যামসুন্দরবাবু বললেন: জরাসন্ধের নাম শুনেছেন?

জরাসন্ধের অন্য পরিচয় কিছু না জানলেও এটা জানি, তাঁকে হত্যার বিচিত্র পদ্ধতির জন্যই তিনি পৌরাণিক জগতে চিত্রিত হয়ে আছেন। মহা বলশালী দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেন জরাসন্ধের একটি পাদদেশে নিজ পদতলে পিষ্ট করে অন্য পাদদেশ বাহুবলে আকর্ষণ করে সমস্ত দেহটাকে লম্বাভাবে দু'ভাগে ভাগ করে ফেলেছিলেন। এই পৃথিবীতে যুগে যুগে কত বিচিত্র হত্যালীলার কথা শোনা গেছে। কিন্তু ভীমসেনের কার্য্যাবলীর মধ্যে কিছু-না-কিছু বৈশিষ্ট্য থাকা চাই। এও তারই একটি নিদর্শন। আমি আমার জ্ঞাত কাহিনী জানিয়ে বললাম, তার বেশী কিছু জানি না।

দেবী বললেন : এই কর্মকাণ্ড যে স্থানে ঘটেছে বলে কথিত, আমরা সেইখানেই যাচ্ছি। আমরা সেখানে কোনও দিন যাইনি, কিন্তু কাহিনীটা জানি। মহাভরেতের সভাপর্বে মহারাজ জরাসন্ধের জন্ম, জীবন-কাহিনী এবং জীবনাবসানের কথা সবিস্তারে বলা আছে।

: বেশ তো, কাহিনীটা আপনার কাছ থেকেই জেনে নিই। মহাভারতের কথা অমৃত-সমান, শকুন্তলা দেবী কহে শোনে পুণ্যবান। অবশ্যি পুণ্যবান না হয়েও আমি দলে ভিড়লাম।

শকুন্তলা দেবী কাহিনী বলতে গিয়ে একেবারে সেই ত্রেতাযুগ থেকে আরম্ভ করলেন। বাল্মীকি রামায়ণে দ্বাত্রিংশৎ সর্গে উল্লেখ আছে কুশ নামক রাজার পুত্র বসু পঞ্চ-পর্বতের মধ্যে "গিরিব্রজ" নামক নগর স্থাপন করেন। রাজা বসুর নামানুসারে এই স্থান একসময়ে "বসুমতী" নামেও পরিচিত ছিল বলে কথিত হয়। রাজা বসুর বংশের কোনও নৃপতি ছিল বৃহদ্রথ। এঁর নামেও স্থানের নাম একসময় "বৃহদ্রথপুর" ছিল।

আমি বলে ফেললাম : প্রত্যেকেই যখন নিজ নিজ নামে স্থানের নামকরণ করেছেন, আমরাও আজ থেকে এই স্থানের নাম রাখলাম "শ্যামসুন্দর নগর"।

শ্যামসুন্দরবাবু মেয়ের শ্রবণশক্তিকে এড়িয়ে আস্তে আস্তে বললেন : সত্যি যদি ঐ নামে নামকরণ করতে চান, তবে নামটার একটু রাজকীয় মর্য্যাদা থাকা উচিৎ। ব্র্যাকেটে "রাজা দুষ্মন্ত" লিখে দেবেন। তাতে প্রচ্ছন্নভাবে শকুন্তলার নামটাও আমার সঙ্গে বেশ জড়িয়ে থাকবে।

সকলের হাসি শুনে আরতির দৃষ্টি এদিকে ফিরতেই শকুন্তলা দেবী পুনরায় বলতে আরম্ভ করলেন যে মহাভারতের উক্ত সভাপর্বে উনবিংশতিতম এবং বিংশতিতম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন ও ভীমসেনকে মগধের পরিচয় দিয়ে বলছেন, ঐ নগরীর নাম "মগধপুর"। পঞ্চ-পর্বতের নাম ক্রমান্বয়ে বৈহার, বরাহ, বৃষভ, ঋষিগিরি ও চৈতক। বলা বাহুল্য নামগুলো সবই এখন বদলেছে। এই নগরীর নাম "গিরিব্রজ" ছিল, তাও শ্রীকৃষ্ণ-বর্ণিত বিবরণের মধ্যেই দেখা যায়।

আমি বললাম : মূল জরাসন্ধের কাহিনীটি বলুন, দিদি।

: বলছি ভাই। পরিচয়টা ভাল করে না বলে নিলে, কাহিনী

জমবে কেন।

পুনরায় তিনি যে কাহিনী বললেন তার মর্মার্থ এই, মহাভারতের কাহিনী অনুসারে মগধপতি বৃহদ্রথের সন্তানহীনা দুই মহিষী সন্তান কামনায় ঋষি চণ্ডকৌষিকের কাছ থেকে একটি আশীর্বাদী পাকা আম্রফল প্রাপ্ত হন। দুই মহিষী একটি আমকে দ্বিখণ্ডিত করে খেয়ে ফেলেন। যথাসময়ে দুই মহিষী একটি করে অর্দ্ধেক-দেহ-বিশিষ্ট প্রাণহীন পুত্র সন্তান প্রসব করেন। দুইটি অর্দ্ধ-শিশুই অরণ্যে নিক্ষিপ্ত হয়। তখন জরা নামে এক রাক্ষসী দুইটি অর্দ্ধ-অঙ্গকে একসঙ্গে যুক্ত করে।

আরতি জিজ্ঞাসা করল : কি দিয়ে জুড়ল ?

দেবী : কি দিয়ে আবার। "ফেবিকল" দিয়ে !

আমি : সেই পৌরাণিক যুগেও "ফেবিকল" ছিল ? তা'হলে দেখুন, আমরা এত আগেও জ্ঞান-বিজ্ঞানে কত উন্নত ছিলাম।

শ্যামসুন্দরবাবু : শুধু তাই নয়, তখনকার দিনে ভেজালও ছিল। ঐ ফেবিকলে ভেজাল না থাকলে অতদিন পরে ভীম কি করে জোড়া বরাবর দেহ দ্বিখণ্ডিত করে ফেলল। শ্রীকৃষ্ণ পাতা ছিঁড়ে ভীমকে ইঙ্গিতে জানাতেই কার্য্য সমাধা। কূট-কচালে অন্ধি-সন্ধি সব শ্রীকৃষ্ণের জানা তো।

শকুন্তলাদি বিরক্ত হয়ে বললেন : তুমি কি করে জানলে যে শ্রীকৃষ্ণ দেখিয়ে দিয়েছেন ? এমন কথা মহাভারতের কোথাও নেই।

: নেই নাকি। কিন্তু আমি কোথাও দেখেছি। যদি মহাভারতে না থাকে কঠোপনিষদে আছে।

: তোমাদের সব জিনিস নিয়ে ঠাট্টা।

মায়ের বিপন্ন অবস্থায় আরতি কাতর হয়ে বলে উঠল : বাবা, তোমরা মাকে কেন এমন বিরক্ত করছ। তোমাদের নিজেদের বিশ্বাস না হয় শুনো না। কিন্তু অন্যের ধর্ম-বিশ্বাসে আঘাত কর কেন ? মা, তুমি বল, আমি শুনব।

: না বাবা, তোমরা সব বিদ্বান-জ্ঞানী-গুণী। আমি মূর্খ মানুষ। তোমাদেরকে কিছু বলার যোগ্যতা নেই।

আমি নিজেও অনুতপ্ত হয়ে বললাম: দিদি, এই মূর্খ মানুষটার পায়ের কাছে বসে দীর্ঘদিন ধরে শেখবার অনেক কিছু আছে—একথা আমি বিশ্বাস না করলেও, আমি তো করি। আপনি বলুন। বলেই আমারই সামনে প্রসারিত পদযুগল ছুঁয়ে কপাল স্পর্শ করলাম। তিনিও আশীর্বাদের ভঙ্গীতে হাত তুললেন এবং প্রসন্ন হাসিতে আবার শুরু করলেন। সে কাহিনী নিম্নরূপ—

: একত্রীভূত দুইটি অর্দ্ধদেহে প্রাণসঞ্চার করে জরা, শিশুটিকে রাজা বৃহদ্রথের কাছে ফিরিয়ে দিল। কালক্রমে সেই শিশু মহা বলশালী এবং প্রতাপশালী রাজা জরাসন্ধ নামে বিখ্যাত হয়ে উঠল। তাঁর পরাক্রমে কৃষ্ণ-বলরাম পর্য্যন্ত মথুরা ছেড়ে দ্বারকায় চলে গেলেন। জরাসন্ধ দেবতার কাছে বলি দেবার জন্য ছিয়াশি জন রাজাকে বন্দী করে রাখেন। বাকী চৌদ্দ জন হ'য়ে একশত পূর্ণ হ'লে বলিকার্য্য সমাধা হবে। বন্দী রাজারা দিবারাত্র মধুসূদনকে ডেকে পরিত্রাণ প্রার্থনা করতে লাগলেন।

শ্যামসুন্দরবাবু বলে উঠলেন: জরাসন্ধ স্বয়ং মধুসূদনকেই পিটিয়ে দেশছাড়া করেছে। তাঁকে ডাকলে কি হবে?

আরতি: বাবা, আবার!

আরতির ধমকে শ্যামসুন্দরবাবু থামলেন বটে. কিন্তু পুনঃ পুনঃ এইভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে দিদি সহসা কথা বলতে রাজী হন না। আমার অনুরোধে তিনি আবার আরম্ভ করলেন: শ্রীকৃষ্ণ তখন যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয় যজ্ঞের পরামর্শ দিলেন।

আরতি ছেলেমানুষের মত হাততালি দিয়ে বলে উঠল: আমি বুঝেছি।

সে কি বুঝে ফেলেছে জানবার জন্য আমরা ব্যস্ত হতেই সে বলল: শ্রীকৃষ্ণের দুষ্টু বুদ্ধি।

কুঞ্চিত ললাটে দিদি জিজ্ঞাসা করলেন : কি দুষ্টুবুদ্ধি ?

: রাজসূয় যজ্ঞ করলে সব রাজার বশ্যতা আদায় করতে হবে। জরাসন্ধ বশ্যতা স্বীকার করবে না। সুতরাং তার দিন শেষ।

শ্যাম : বাট্ হু উইল বেল দি ক্যাট্ ?

দিদি : তোমাদের মত যোগ্যতা নিয়ে ভগবান ধরাধামে আসেন নি।

শ্যাম : না—মানে, আমরা শুনেছি জরাসন্ধের এক তাড়ায় ভগবান ধরাধামের এপ্রান্ত ছেড়ে একেবারে ওপ্রান্তে চলে গিয়েছেন।

আমি হেসে বললাম : দাদা, এবার চুপ করুন। দিদিকে বলতে দিন।

আবার কাহিনী এগিয়ে চলল। জরাসন্ধের নিধন অপরিহার্য্য ভেবে, ভীম এবং অর্জুন এই কাজের উপযুক্ত বলে ঐ দুজনকে সঙ্গে নিয়ে, শ্রীকৃষ্ণ মগধের দিকে অগ্রসর হ'লেন। জরাসন্ধ এত পরাক্রমশালী ছিলেন যে, সাধারণভাবে যুদ্ধে সে অবধ্য। তাছাড়া তার দুর্গ এত সুদৃঢ় ছিল যে সত্য পরিচয়ে প্রবেশও অসম্ভব। তাই শ্রীকৃষ্ণ, ভীম ও অর্জুনকে নিয়ে স্নাতক ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে রাজগৃহে প্রবেশ করেন।

আরতি : মা, রাগ কোরো না। ভগবানের পক্ষে এটা কি অন্যায় নয় ? মিথ্যা পরিচয়ে প্রতারিত করে—

দিদি : ভগবানের কাজের ন্যায়-অন্যায় বিচারের ধৃষ্টতা তোমাদের থাকতে পারে, আমার নেই। যিনি গোবর্দ্ধন ধারণ করেন, তাঁর কাজের বিচার আমাদের পাপ-পুণ্যের মাপকাঠিতে হবে না, আরতি। সে চেষ্টা কোরো না।

আমি মনে মনে বললাম, শকুন্তলাদিদি সাধারণ গৃহস্থ-ঘরের লক্ষ্মীর পাঁচালী কোনও-মতে-পড়া অর্দ্ধশিক্ষিতা মহিলা নন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা লাভ করেও মনের মধ্যে কতখানি ভক্তি-বিশ্বাসের ক্ষমতা অর্জন করলে তবে পুরাণ, ইতিহাসে বর্ণিত সব

কাহিনী সত্য-মিথ্যে বিচার না করে ভগবানের লীলা বলে গ্রহণ করতে পারেন। "বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর" একথা এঁরাই সর্বতোভাবে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। হারজিতের প্রশ্ন পরে। এই বিশ্বাসের প্রভাবেই কোনও কোনও বিজ্ঞানী একই সঙ্গে গ্রহতারকাদের বিষয়ে দূরবীক্ষণ সহযোগে গবেষণাও করেন, আবার গ্রহণের সময় মৃদঙ্গ করতাল বাজিয়ে গ্রহ-মুক্তির আবেদনও জানান। দিদি ততক্ষণে আবার আরম্ভ করেছেন—

: যথাসময়ে জরাসন্ধের কাছে তিনজনের সত্য পরিচয় প্রকাশ হ'ল এবং শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে জরাসন্ধ তিনজনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বলশালী ভীমসেনকে মল্লযুদ্ধে প্রতিপক্ষ হিসেবে নির্বাচিত করেন।

এই কথা বলতে বলতে রথ থেমে গেল এবং আমরা জানতে পারলাম যে আমরা জরাসন্ধের আখড়ায় উপস্থিত হয়েছি। আখড়া বলতে মল্লযুদ্ধের স্থান। কিন্তু নির্দিষ্ট স্থানটি জঙ্গল প্রদেশের অন্যান্য স্থান থেকে বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম নয়। ঐ স্থানটি না হয়ে যে কোনও একটি স্থানকে ঐ সমমর্য্যাদা দান করতে আমাদের বিন্দুমাত্র আপত্তি ছিল না। নামের গৌরব বহন করবার জন্যই নিকটে একটি লুপ্ত গৃহের ধ্বংশাবশেষ বিদ্যমান। বিংশ শতাব্দীতে কলকাতার ময়দানে যেমন খেলোয়াড়দের জন্য তাঁবুর ব্যবস্থা আছে, এরও উদ্দেশ্য বোধহয় একই বলে দাবী করা হয়। কিন্তু যে কোনও ব্যক্তি ঐ লুপ্ত গৃহকে জরাসন্ধ নির্মিত বলে বিন্দুমাত্র অনুমান করবে না, একথা সত্য।

অত চিন্তায় আমাদের দিদি জর্জরিত নন। তিনি বললেন—

: এই সেই মল্লভূমি। চৌদ্দদিন ধরে মল্লযুদ্ধের পরে ভীমসেনের নিষ্ঠুর পীড়নে এইখানেই জরাসন্ধের নিধন। এই চৌদ্দদিন বিরাম-বিহীন যুদ্ধ চলেছিল।

শ্যামসুন্দরবাবু গম্ভীরভাবে বললেন : খাদ্যাদির জন্য রিসেস্ নিশ্চয়ই ছিল।

দিদি : না।

: অন্যান্য জৈবক্রিয়া ?

: তা জানি না। জরাসন্ধ নিধনের পরে পররাজ্য অধিগ্রহণের কোনও অভিলাষ না থাকায় শ্রীকৃষ্ণ সহদেবকে অভয় দান করে পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত করলেন।

শ্যামসুন্দরবাবু গম্ভীরভাবে বললেন: হাজার হোক ভগবান। হাজার হাজার বছর আগেই "বান্দুং সম্মেলনে"র পূর্বাভাষ রূপায়িত করেছিলেন।

আরতির রক্তচক্ষু দর্শনে পিতা নীরব হলেন।

আরতি জিজ্ঞাসা করল: সেই ছিয়াশি জন বন্দী রাজার কি হ'ল ?

আমি বললাম: মুক্তি, মুক্তি।

শ্যামসুন্দর: তাহ'লে নিশ্চয়ই সহদেবের রাজ্যাভিষেকের আগে অর্জুনাদি পাণ্ডবগণ স্বল্প-মেয়াদী বামপন্থী সরকার স্থাপনা করেছিলেন।

সকলেই হেসে উঠলাম। এমন কি দিদি পর্য্যন্ত। হাসির নির্মলতায় উৎফুল্ল হয়ে দিদি পুনরায় আরম্ভ করলেন—

: কথিত আছে, জরাসন্ধের সময়ে এই মল্লস্থানের মাটি রোজ হাজার হাজার মণ দুধ মিশিয়ে নরম করা হতো। এখনও নাকি এখানকার মাটি নরম।

শ্যামসুন্দরবাবু সঙ্গে সঙ্গে একটা পাথরের নুড়ি কুড়িয়ে নিয়ে বললেন: সত্যিই তাই। জরাসন্ধ বা ভীমের কাছে এটা মাতৃ-অঙ্গের মত কোমল।

আমি দিদির কানের কাছে মুখ নিয়ে বললাম: তবু ভাল, দাদা আমার, কোমলতার তুলনা দিতে গিয়ে অন্য কারও অঙ্গ না বলে মাতৃ-অঙ্গ বলেছেন।

দিদি কপট কোপ প্রকাশ করে বললেন: তোমাকে মারব।

আমি বললাম: এমন ভাগ্য কি আমার হবে।

আবার বললাম: অনেকের বিশ্বাস, জরাসন্ধের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডবদের সংঘর্ষ নাকি আর্য্য-অনার্য্যদের বিরোধের কাহিনী।

আরতি: তা কি করে হয়? জরাসন্ধ যদি কুশ রাজার বংশধর হন তবে তিনি তো আর্য্য। অপরদিকে শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডবরাও আর্য্য।

আমি: শুনেছি, জরাসন্ধের মৃত্যুর পরও নাকি মগধরাজরা অনেকদিন পর্য্যন্ত আর্য্য প্রভাব বিস্তারে বাধাদান করেছে।

দিদি: যে সহদেবকে শ্রীকৃষ্ণাদি বঞ্চিত না করে পিতৃরাজ্য প্রত্যর্পণ করেছিলেন, সেই সহদেবই রাজ্যাভিষিক্ত হয়ে—পাণ্ডবদের রাজস্ব দিতে অস্বীকার করেছিল।

আমি: অশ্বমেধ যজ্ঞ নিয়েও বোধহয় বিরোধ হয়েছিল।

দিদি: মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বে দেখা যায়, কুরুক্ষেত্র রণে জয়লাভ করে পাণ্ডবরা অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। সহদেবের পুত্র মেঘসন্ধি অশ্ব বন্ধন করে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন।

আমি: এইসব ঘটনা অনুসারে পাণ্ডবদের সঙ্গে মগধের তৎ-কালীন ক্রমাগত বিরোধকে আর্য্য অনার্য্য সংঘর্ষ বলে অনেকে সন্দেহ করেন।

দিদি: পৌরাণিক মতে জরাসন্ধ-বংশের শেষ রাজার নাম রিপুঞ্জয়। এর পরে অনেকদিন পর্যান্ত প্রদ্যোৎ বংশের রাজারা মগধের ওপর রাজত্ব করেন। তারপর শিশুনাগ বংশ। বিম্বিসার—অজাতশত্রু নাকি এই শিশুনাগ বংশধর।

আমি: তাহ'লে এই সর্পকুল পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে পূজিত তো হোতেনই, প্রজা-পালন ইত্যাদি কার্য্যক্রমের দ্বারা মানব-সমাজে প্রভূত প্রভাব বিস্তারের অবকাশ পেয়েছিলেন। সেই পন্নগরাজি এখন লোকচক্ষুর অন্তরালে মাটির নীচে আশ্রয় নিয়েছে এবং তাদের কার্য্যপ্রণালীর মধ্যে এখন শুধু সময় এবং সুযোগ মত দংশন দ্বারা হলাহল বিস্তার ছাড়া আর কিছু নেই।

শ্যামসুন্দরবাবু কন্যার রক্তচক্ষুর ভয়ে কিছুক্ষণ নীরব ছিলেন। এইবার নীরবতা ভঙ্গ করে বললেন : অহিকুলের রাজত্বকালে দেশ-রক্ষা খাতে কোন ব্যয় ছিল না।

সকলের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির উত্তরে বললেন : শত্রুকুল আক্রমণ করলে, রাতের অন্ধকারে কিছু সন্তানাদি শত্রু-শিবিরে ছেড়ে দিলে কেবলমাত্র হলাহল প্রয়োগের দ্বারা সমস্ত শত্রু-সৈন্য নিপাত করা যেতো।

প্রত্যাবর্তনের পথে বাঁ দিকে অঙ্গুলি সংকেতে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : ওটা কি?

দিদি : তুমি চুপ কর। তোমার কোন কথার উত্তর দেব না।

শ্যামসুন্দর : রাগ করছ কেন? আমি সুকুমার রায়ের ভব-দুলালবাবুর অনুকরণে "চলচ্চিত্তচঞ্চরী"র আদর্শে একখানা গ্রন্থ-প্রণয়নে উদ্যোগী হয়েছি। তাই সব কিছু জেনে নিতে হবে তো।

: ভবদুলাল বাবুই তোমার আদর্শ পুরুষ। তার কাছেই তুমি দীক্ষা গ্রহণ কর।

আমি প্রসঙ্গান্তরের জন্য বললাম এটা তো মনে হচ্ছে সেই বৈভার পাহাড়। এরই একপ্রান্তে ব্রহ্মকুণ্ড।

দিদি : হ্যাঁ ভাই, তুমি ঠিকই বলেছ। এটা বৈভার পাহাড়। এরই মধ্যে সপ্তপর্ণী গুহা! সে এক বিরাট ইতিহাস। এখানে যেটা দেখছ—এর নাম সোন ভাণ্ডার। এর মধ্যে দুটি গুহা আছে। লোক-প্রবাদ যে এর মধ্যে জরাসন্ধের কোষাগার ছিল।

শ্যাম : এই জিনিষ তুমি ছেড়ে চলে যাচ্ছ? কোষাগার দেখবে না?

আরতি : অনেকে বলেন এই গুহার মধ্যেই জরাসন্ধ ছিয়াশি জন রাজাকে বলি দেবার জন্য বন্দী করে রেখেছিল।

দিদি : তেমন অনেকেই বলে এইটিই সপ্তপর্ণী গুহা। এখানেই প্রথম বৌদ্ধ মহাসম্মেলনে ত্রিপিটক রচিত হয়।

আমি : অথরিটি, কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস কি বলেন ?

দিদি : মহাভারতের বিংশতিতম অধ্যায়ে সভাপর্বে শ্রীকৃষ্ণ দূর থেকে গিরিব্রজে অর্জুন ও ভীমকে পশু-সমাকীর্ণ বাপী-তড়াগাদি-যুক্ত সুরম্য হর্ম্যে অলংকৃত, পঞ্চ-পর্বতাদি দেখিয়েছিলেন। কিন্তু সোনভাণ্ডারের উল্লেখ নেই।

শ্যাম : অন্য যা কিছু থাক, আমি কিছু বলব না। কিন্তু বন্দী রাজারা নিশ্চয়ই ছিল না।

: কেন ?

: তাহলে ভগবান নিশ্চয়ই ঐটেই আগে দেখাতেন। আর কোষাগার হ'লে ভগবান নিশ্চয়ই ওভারলুক করেছেন। কারণ গীতাতে ঐসব ভাষণ যিনি দান করেছেন - তাতেই ক্যারেক্টারটা বোঝা যায় তো ?

দিদি : কিন্তু দু'একজন বুদ্ধিমান লোক ঐ গুহার মধ্যে একটা চৌখুপি দাগ দেখে দরজা মনে করে ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা করেছিল। একেবারে খট্‌খট্‌ লবডংকা।

ততক্ষণে আমরা গয়া যাবার বড় রাস্তায় এসে পড়েছি। দিদি ডানদিকে দেখিয়ে বললেন : এই হ'ল "মনিয়ার মঠ"। এখন অন্ধকার হয়ে গেছে। নেমে কাজ নেই।

শ্যাম : তবে দর্শনের পরিবর্তে শ্রবণই হোক।

তোমার সামনে আমি আর কোন কথা বলব না। কাল সোমবার। তুমি তোমার ব্যাঙ্কের কারাগারে আবদ্ধ থাকবে। তখন ভাইটিকে নিয়ে কাল আমি মনের সুখে বেরিয়ে পড়ব।

শামসুন্দরবাবু আমার কানের কাছে মুখ এনে বললেন—

: স্যার, এটা পিনাল কোডের কত ধারা ?

: আমার দিদিকে নিয়ে আপনার এমন কথা বলা অন্যায়।

: তা হ'লে পিনাল কোড আমার ওপর প্রযোজ্য হোক।

ততক্ষণে গাড়ী ব্রহ্মকুণ্ডের কাছাকাছি এসে পড়েছে। বিনয়বাবু

আর মণিমালা রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। যেন আমাদেরই প্রতীক্ষায়।

গাড়ী থামিয়ে আমি নেমে পড়লাম। শ্যামসুন্দরবাবু আর বিনয়বাবুর মধ্যে সৌজন্য বিনিময় হ'ল। মণিমালা বিনয়বাবুকে বলল: তুমি ক্লান্ত। এই গাড়ীতে ওদের সঙ্গে এগিয়ে যাও। আমরা দুজন হেঁটে যাচ্ছি।

: এতটা পথ ঘুরে এসে আমি বুঝি ক্লান্ত নই? এ তোমার পক্ষপাতিত্ব।

ততক্ষণে বিনয়বাবু গাড়ীতে উঠে বসেছেন। অভিমান-জনিত কৃষ্ণছায়া বিনয়বাবুর মুখে প্রকাশিত হয়েছে কিনা, সন্ধ্যার অন্ধকারে বোঝা গেল না।

গাড়ীটা একটু এগিয়ে গেলে মণি বলল: বেশ একা একা ঘুরে বেড়ান হচ্ছে!

: একা কোথায়? চার জন ছিলাম।

: তবে আর ভাবনা কি?

: তাই কি তুমি অভিমান করেছ? অপরাধী হাজির। আমি শতেক সাহচর্য্য দিয়ে এর ক্ষতিপূরণ করব।

মণি ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল:

“একদিন যে সম্পদে করেছ বঞ্চিত
সে আর ফিরায়ে দেওয়া তব সাধ্যাতীত।”

[ছয়]

মাথার উপরে মধ্যাহ্নের অন্তহীন ধূসর আকাশ, আর পায়ের নীচে প্রস্তরখণ্ড আচ্ছাদিত উষর ভূমি। লোক-বিরল প্রান্তরের মাঝখানে আমি আর মণিমামা। সম্মুখে লুপ্তপ্রায় পাথর প্রাচীরে বেষ্টিত বিম্বিসার কারা বলে কথিত ভূমিখণ্ড।

মণি বলল: উপরে, নীচে, দক্ষিণে, বামে, চতুর্দিকে আমারই জীবনের প্রতিচ্ছবির মধ্যে এ আমাকে কোথায় নিয়ে এলে মামা!

: এর নাম "বিম্বিসার-কারা"।

: কথাটা পরিষ্কার হ'ল না। কারাগারটা বিম্বিসার তৈরী করিয়েছিল, অথবা বিম্বিসারকে আপ্যায়নের জন্য অন্য কেউ তৈরী করিয়েছিল?

: বিম্বিসারকে অভ্যর্থনার জন্য তাঁর প্রিয় পুত্র অজাতশত্রু তৈরী করিয়েছিলেন।

: এ যেন কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে উকীলের জেরার [illegible] কষ্ট উত্তর দান। তুমি কি সাক্ষী দিতে এসেছ, না আসামীর কাঠগড়ায়?

: তোমার আলোচনায় আমার স্থান কোথায় নির্দিষ্ট হ'য়ে আছে তা তো জানি না।

: আমি তো হাকিম নই। স্থান নির্দেশ করা আমার অধিকারে নেই।

: সত্যি কথা এই যে দান করবার মত যথেষ্ট জ্ঞান আমার নেই। সরকারী সস্তায় গাইড বুক দেখে আর একে, ওকে, তাকে, জিজ্ঞেস করে কি দান করবার মত জ্ঞানার্জন করা যায়?

: আমার কপালটা বড় মন্দ মামা!

মণিমালার বৈধব্যজনিত দুঃখের কথা ভেবে আমিও ব্যথা অনুভব করলাম। কিন্তু আমার দোষ এই যে কারও দুঃখে ইনিয়ে-বিনিয়ে সান্ত্বনার কথা আমি বলতে পারি না। আমি জানি, বাক্যের দ্বারা কারও দুঃখ লাঘব করা যায় না। তাই চুপ করেই থাকলাম।

মণি আবার বলতে আরম্ভ করল—

: জীবনব্যাপী কারাগারের পাষাণ-প্রাচীর আমাকে অবরোধ করে আছে। এখানেও দেখছি সেই কারাগার। তবে ব্যতিক্রমের মধ্যে এই, মহাকালের পদাঘাতে এই প্রাচীর চূর্ণ হয়েছে।

: আপন মিথ্যা দম্ভ আর অলীক প্রতিষ্ঠা কামনায় প্রতিপক্ষের কণ্ঠরোধ করবার জন্য যে ভিত্তিহীন কারাগারের জন্ম—তা একদিন ধ্বংসে পড়বেই। যুগে যুগে এই ধ্বংসলীলার কাহিনীর শেষ নেই।

: কিন্তু লয়প্রাপ্ত প্রাচীরের অবকাশে হিমশীতল উন্মত্ত হাওয়া আমার বসন নিয়ে টানাটানি করছে। তুমি বারণ কর না মামা! এ যেন সেই কৌরবের রাজসভায় দুঃশাসনের দুরভিসন্ধি। তোমার মনে পড়ছে না? তোমার ভূমিকা কোনটা?

: তুমি কোন্ ভূমিকা নিতে বল?

: যে কোন ভূমিকা নিতে পার। সবকটিতেই তোমার জয়-জয়কার, মামা। [illegible] দাঁড়িয়ে পঞ্চ-সখা? অথবা [illegible] দুর্বল, [illegible] আত্মশ্লাঘা লাভ করলেন যে, ন্যায়-নিষ্ঠার [illegible] কত আনন্দের।

: পঞ্চপাণ্ডবের যে কোন একজন হ'লে আনন্দ লাভ করবে—এটা বুঝলাম। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র হ'লে?

: দৃষ্টি-হীনতার সুযোগে সব কিছু না-জানার, কোনও কিছু না-দেখার ছলনায়, অব্যাহতি পেয়ে যাবে।

: শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকা গ্রহণ করলে?

: সব দিকে সুবিধে। প্রথমেই ভগবান বলে সব কিছু সুকর্ম-অপকর্ম লীলা হিসেবে সমর্থন পাবে। তারপর দেখ, এক

হাতে গোপীদের বস্ত্র-হরণ করে তাদেরকে লজ্জার হাত থেকে অব্যাহতি দিয়ে, অন্য হাতে অপহৃত সেই অপরিমিত বস্ত্র-সম্ভারে পাঞ্চালীর লজ্জা নিবারণ করলেন। যোগ-বিয়োগে মিলে গেল, থাকল শূন্য। পরীক্ষায় ফুল মার্কস্। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর এই লুপ্তপ্রায় কারা-প্রাঙ্গণে বস্ত্র-হরণের নব-বিধানে তুমি কত নম্বর পাও —সেইটে শুধু দেখাবার বড় সাধ।

: তোমার অঙ্ক ভুল। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের বস্ত্র-হরণ করেছিলেন কিনা—এই প্রশ্নের মীমাংসা এখনও হয় নি। যদি না করে থাকেন তবে দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণের জন্য বস্ত্র-সম্ভার সরবরাহে যাবতীয় ব্যয় শ্রীকৃষ্ণের নিজস্ব খাজাঞ্চি খানার।

মণি : মামা, তুমি ভাব, সংসারের যাবতীয় জ্ঞান তুমি আহরণ করে বসে আছ। তোমার বড় অহঙ্কার।

: মুখের ওপর এত বড় কাম্প্লিমেণ্ট তুমি দিলে ?

: দেব না ? তোমাদের "ভাগবত" আমি পড়েছি। তাতে গোপীদের বস্ত্র-হরণের কথা সবিস্তারে লেখা আছে।

: ওটা প্রক্ষিপ্ত।

: কেন ? ভগবান বস্ত্র-হরণ করেছিলেন, এটা স্বীকার করতে এত লজ্জাবোধ কেন ? বিগত মহাযুদ্ধের সময়ে শুনেছি বস্ত্র-সঙ্কট হয়েছিল। সেও তো এক প্রকারের বস্ত্র-হরণ। তাছাড়া তিনি ভগবান। লজ্জা নিবারণের বস্ত্র, হরণ করে সকল লজ্জার হাত থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন।

: যাক এবার কাজের কথা শোন।

: তবে কাজের কথাই বল।

: শিশুনাগ বংশের রাজা বিম্বিসারের সময় রাজগৃহে ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাব হয়। রাজা বিম্বিসার বুদ্ধের আশীর্বাদ-ধন্য হন। কিন্তু তাঁর পুত্র অজাতশত্রু বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন না।

"নৃপতি বিম্বিসার
নমিয়া বুদ্ধে মাগিয়া লইলা

পাদ নখকণা তার।

স্থাপিয়া নিভৃত প্রাসাদ-কাননে
তাহারি উপরে রচিলা যতনে
অতি অপরূপ শিলাময় স্তূপ
শিল্প শোভার সার।"

কিন্তু —

"অজাতশত্রু রাজা হ'ল যবে,
পিতার আসনে আসি
পিতার ধর্ম শোণিতের স্রোতে
মুছিয়া ফেলিল রাজপুরী হ'তে,
সঁপিল যজ্ঞ অনল-আলোতে
বৌদ্ধ শাস্ত্র রাশি।"

পিতা-পুত্রের ধর্ম-বিশ্বাসের বিভিন্নতার পরিণতি এই পাষাণ-কারা।

মণি বলল : কারাগারটা ধ্বংস হয়ে গেলেও যা অবশিষ্ট আছে, তার গঠন-প্রণালী দেখলে মনে হয়, বেশ মজবুত করেই তৈরী হয়েছিল। কেন, মামা?

: হাজার হোক একটা কারাগার বলে কথা। মজবুত তো করতেই হবে। তাছাড়া হয়ত বিম্বিসারের অনুরাগীও বেশ ছিল। বন্দীকে মুক্ত করে নিয়ে যাবার আশঙ্কাও থাকতে পারে।

: তোমার কথা সত্যি হ'তে পারে। রবীন্দ্রনাথের "অভিসার" কবিতায় শ্রীমতী নামে বুদ্ধের দাসীর আত্ম-নিবেদন তারই সাক্ষ্য!

: "অভিসার" কাহিনীটা শুনি।

: তোমাকে আমি জ্ঞান দান করব?

: কবিতাটি একটু বলনা।

মণিমালা সলজ্জভাবে আবৃত্তি করল :

"সেদিন শুভ্র পাষাণ ফলকে পড়িল রক্তলিখা।

সেদিন শারদ স্বচ্ছ নিশীথে
প্রাসাদ কাননে নীরব নিভৃতে
স্তূপ পদমূলে নিবিল চকিতে শেষ আরতির শিখা।"

: কাব্যাদি আলোচনা অনেক হ'ল। ইতিহাস পঠন-পাঠনও হ'ল। ঝড়-বৃষ্টি আসবার আগেই যা কিছু বক্তব্য শেষ করে রওনা হতে হ'বে।

মণিমালা একটু দুষ্টুমি-ভরা হাসিতে মুখখানা রহস্যময় করে বলল : বক্তব্যের পালা তো তোমার।

: কেন?

: এত যত্ন করে এতদূরে নিরালায় নিয়ে এলে। তারপরে বস্ত্র হরণের পালাও হয়ে গেল। এবার তোমার কেত্তন তুমি কর।

: বিনয়বাবুর চোখে-মুখে যদি কাতরভাব চিহ্ন ফুটে ওঠে?

: সে কথা ঠিক। তুমি তো আবার কাতরতা সহ্য করতে পার না। দয়ার শরীর।

: একটা ঘটনার সুযোগ নিয়ে একটা মানুষকে পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করে কি আনন্দ পাও মণিমালা?

: ভালমন্দ কোন কিছু থেকে আনন্দ সংগ্রহ করার উৎসাহ আমার একেবারে নেই। তবে তোমাদের স্বামী যোগানন্দ ব্রহ্মচারীর আস্ফালন দেখে আমার খুব হাসি পেত।

: কিসের আস্ফালন?

: দৈহিক, মানসিক সবপ্রকার অকর্মণ্যতা তিনি উদ্যত বেত্রের দ্বারা আড়াল করতে চাইতেন। সবকিছু নিপীড়ন সত্ত্বেও আমার কিন্তু হাসি পেতো। তাতে ব্রহ্মচারীর ক্রোধ আরও বেড়ে যেত। আক্রমণের পরিমাণও যেতো বেড়ে।

: যোগানন্দবাবুর এই নির্যাতনের কাহিনী আমি যখন কাবেরীর কাছে শুনলাম, প্রথমে বিশ্বাস করতে পারি নি।

: দস্যু কখনও সর্বহারার বেদনা বিশ্বাস করতে পারে না।

: আমি কি দস্যু নাকি ?

: সর্বস্ব অপহরণ করলে লোকে তাকে দস্যুই বলে।

: মনোরাজ্যে দস্যুবৃত্তি অভিনন্দন যোগ্য শুনেছি। কিন্তু সে প্রসঙ্গ থাক। ঐ দেখছ দূরে গৃধ্রকূট পাহাড়। ঐ পাহাড়ে থাকতেন ভগবান বুদ্ধ। কারারুদ্ধ বিম্বিসার রোজ তাঁকে দর্শন করতেন।

: একথা জেনেও অজাতশত্রু এই দর্শন বন্ধ করবার কোন ব্যবস্থা করে নি ?

: সর্ব-শক্তিমানের আশীর্বাদেই বোধহয় বিম্বিসার এই দর্শন থেকে বঞ্চিত হন নি।

মণিমালা একটু হেসে বলল : প্রাণে ভক্তি থাকলে অনেক কিছু অসম্ভব সম্ভব হয়। প্রাণে ভক্তি ছিল বলেই তো ঔরংজেব সিংহাসনে বসে রাজমুকুট ধারণ করতে পেরেছিলেন।

আমি : ভক্তির জোরে ঔরংজেব রাজমুকুট ধারণ করেছিল— এটা একেবারে অভিনব চিন্তাধারা।

মণি : কেন, শোন নি ? পিতাকে কারারুদ্ধ করে ঔরংজেব ভাইদের নির্বাসিত এবং হত্যা করে সমগ্র হিন্দুস্থান অধিকার করেও শুধু ন্যায়-নিষ্ঠার বিচারে সিংহাসনেও বসেন নি, রাজমুকুটও ধারণ করেন নি।

: তারপর ?

: তারপর একদিন অর্দ্ধমৃত পিতার নিকট উপস্থিত হয়ে সিংহাসনে বসবার এবং রাজমুকুট ধারণ করবার অনুমতি প্রার্থনা করল।

: কি কথা থেকে কি কথা এসে যাচ্ছে। তুমি এই কারাগৃহের কথা শোন।

মণি বলল : আমি তো ধান-দূর্ব্বা নিয়ে বসে আছি। তুমিই তো কোথাকার ঔরংজেবের কাহিনী টেনে আনলে।

: মিথ্যে বোল না। এ কাহিনী তুমি আরম্ভ করেছ। যাক্, শোন। শেষকালে একদিন সত্যিই বৃদ্ধ পিতাকে কারারুদ্ধ করে অজাতশত্রুর অনুশোচনা হ'ল।

: তবে কি পিতাকে মুক্ত করে দিল?

: তার প্রয়োজন হ'ল না। তিনি নিজেই মুক্ত হলেন। এই মুক্তি শুধু এই পাষাণ-কারা থেকে নয়। অনন্ত-পথের মহাযাত্রায় একেবারে বিশ্বকারা থেকে মহামুক্তি।

: তার অর্থ—কারাগারের মধ্যেই বৃদ্ধ রাজার লোকান্তর হ'ল?

: তার পূর্বে ছোট্ট একটু ইতিহাস। রাজপুরীতে একদিন মহোৎসব। অজাতশত্রুর পুত্রসন্তান জন্মেছে। বাৎসল্যরস রাজার অন্তরে সঞ্চারিত হ'ল।

: বুঝতে পেরেছি। সঙ্গে-সঙ্গে তিনি তাঁর পিতার অন্তরে একই রস-সঞ্চার অনুভব করলেন।

: অনুতপ্ত অজাতশত্রু যখন পিতাকে নিয়ে আসবার জন্য কারাগারের দ্বারদেশে উপস্থিত হলেন, তখন রাজবন্দী সর্ব লোকচক্ষুর অন্তরালে কারাগারের সকল বন্ধন অপসারিত করে কোন মহালোক-তীর্থের যাত্রী।

: তারপর?

মণির চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হয়েছে।

আমি বললাম : ইতিহাসের পাতায় একটি কলঙ্ক অধ্যায় সংযোজন করে রাজা ফিরে এলেন। প্রচুর চোখের জলে অন্তরের কলুষতা ধুয়ে গেল। বুদ্ধের চরণে তাঁর আত্ম-নিবেদনের কাহিনী ইতিহাসের পাতায় অক্ষয় হয়ে থাকল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মণি বলল : একটি মাত্র সন্তান রাজা অজাতশত্রুর জীবনের ইতিহাসকে রূপান্তরিত করল।

ভাবাবেগের তাড়নায় মণিমালার এই ক'টি ক্লান্ত কথার তাৎপর্য্য বুঝতে পারি নি। মণিমালা আবার ক্লান্তভাবে বলল : কারাগারের

সংজ্ঞা কী মামা?

: সে আবার কি কথা?

: খুব জবরদস্ত একটা প্রাচীর এবং বিশাল বিশাল লৌহ-কপাট না থাকলে কি কারাগার হয় না?

: একদিকে ভাবতে গেলে এই সংসারটাই কারাগার। দ্বিজেন্দ্রলাল বলেছেন—

"কারাগৃহে আছিস বদ্ধ
ওরে মূঢ় ওরে অন্ধ।"

মণি তাড়াতাড়ি বলে উঠল? তোমার কাব্য রেখে দাও। আকাশের মুক্ত বায়ুর মধ্যেও কারাগারের বিভীষিকা থাকে। তুমি যেদিন বিষের ধোঁয়া ছেড়ে কুচবিহার থেকে চলে এলে, সেদিন আমার জন্য দিব্যি একখানা কারাগার তৈরী করে রেখে এসেছিলে। তা দস্যু যখন সর্বস্ব অপহরণ করে পালায়, তখন গৃহস্থের দুরবস্থার কথা তার জানবার কথা নয়।

আমি তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পরিবর্তনের জন্য বললাম: আকাশের অবস্থা ভাল নয়। এই কারাগৃহের কাছেই লুকিয়ে আছে অন্য ইতিহাস।

: এই রাজগীরের মাটিতে এত ইতিহাসের কথা তুমি জানলে কি করে?

: খুব সামান্য পরিশ্রমেই এতসব জানা যায়। কিন্তু তা প্রকাশ করে ফেললে, আমি যে একটা বিরাট জ্ঞানী ব্যক্তি তা তুমি বুঝবে কি করে? সুতরাং সে কথা বাদ দিয়ে নটী সলাবতীর কাহিনী শোন।

: এই পুণ্যক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে শেষকালে নটীর কাহিনী শুনতে হবে?

: মথুরা পুরীতে যৌবন-মদমত্তা অভিসারিণী বাসবদত্তার কাহিনী কি অশ্লীল?

: ঠিক আছে। আজ এইখানে দাঁড়িয়ে পুণ্যবতী নটীর ইতিকথা শোনা যাক্।

: নটী সলাবতীর পুত্র জীবক শল্য চিকিৎসায় পারদর্শিতা লাভ করে মহারাজ বিম্বিসারের সভা-চিকিৎসক হয়েছিলেন। ঐ রাজারই পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচারের মত দুরধিগম্য বিদ্যা আয়ত্ত করেছিলেন। সেই জীবক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

: কোন স্থানেই জীবকের পিতৃ-পরিচয়ের প্রয়োজন হয়নি?

: স্বীয় প্রতিভার দ্বারা তিনি ভর্তৃহীনা মাতৃ-জঠরের কলঙ্ক অপনোদন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। নিজের বিশুদ্ধ জীবন ধারণের দ্বারা তিনি বুদ্ধদেবের অসামান্য গৃহী সন্ন্যাসী-রূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। এই কারাগারের কাছেই এক আম্র-কাননে বৌদ্ধ-বিহার স্থাপন করে বুদ্ধদেবকে উৎসর্গ করেন।

: নটী-কাহিনী আরম্ভ হতে ভাবলাম, এইবার একটু রসের কথা বলে মুখ বদলাব। ওমা! এও সেই রত্নগর্ভের পুণ্য-কাহিনী। ভাবলাম একটু গানের আসর, নৃত্যছন্দ, প্রিয়বান্ধবদের অভ্যর্থনার জন্য কিছু-কিছু কালোপযোগী উপকরণ ইত্যাদি থাকবে। তা নয়, এখানেও সেই অপত্য-বৈভব: সংসারের যাবতীয় কল্যাণ-ধর্ম যেন ঐ সন্তানের মধ্যে নিহিত আছে;

মনে-মনে মণিমালার সন্তান-হীনতার কথা স্মরণ করে ভাবলাম, বুঝি অজ্ঞাতে তাকে আঘাত করেছি। তাড়াতাড়ি বললাম—

: প্রাতঃস্মরণীয়া অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা এবং মন্দোদরী—এরা সকলেই সন্তান-গর্বে গর্বিতা ছিলেন না।

: কিসে তারা গর্বিতা ছিলেন—সে প্রশ্নে আমি যেতে চাই না। আমি বলতে চাই, তোমাদের মত সৎ-সঙ্গের পাল্লায় পড়ে নটী বেচারা পর্যন্ত একটু নিজধর্ম পালন করতে পারবে না। মাতৃত্বের যাবতীয় মালিন্য রত্নগর্ভের অজ্ঞাত পুণ্য-প্রভাবে শোধন করে তোমরা সুন্দর জীবনের জয়মাল্য পরিয়ে দিতে পার।

: রত্নগর্ভের পুণ্য-প্রভাব কি অসম্ভব ?

: পাপ-পুণ্যের রহস্যময় প্রভাবের কথা আমি জানি না। তবে নটী সলাবতীর অসামান্য রূপের প্রভায় পতঙ্গের মত উড়ে এসে কোনও মহাপুরুষ যদি নটীর গর্ভজাত কোনও সন্তানের মধ্যে অজ্ঞাতে আপন প্রতিভা প্রতিষ্ঠা করেন তবে সেই দৃশ্যমান সন্তান-ভাগ্যের জন্যে অভিনন্দন কার প্রাপ্য ? পেশাগত নটীর, অন্ধকারের মহা-পুরুষের, না অবাঞ্ছিত লব্ধ-জন্ম সন্তানের ?

: পিতা-মাতার দোষ-গুণ সন্তানের মধ্যে কতখানি প্রভাবিত হয়—এসব জটিল প্রশ্নের মীমাংসা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। তার দরকারও নেই। আকাশে রীতিমত দুর্যোগের পূর্বাভাষ। এতক্ষণ বিনয়বাবু হয়ত চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।

: বিনয়বাবুর চিন্তার জন্য তোমার কিছু ব্যাকুলতা না থাকলেও চলবে। তোমার চিন্তার কারণ আমি জানি। কিন্তু ভয় নেই। জীবনে নানারূপ কার্যাদি করেছি, তবে ছেলে-ধরার ব্যবসা কোনও দিন করি নি। কোনও ছেলেধরা যদি তোমাকে ধরে নিয়ে যায়, এমন শান্ত, সুবোধ ছেলেকে ধরে গঞ্জের হাটে নীলামে দাম উঠবে না। লোকসান যাবে !

: মন্দভাগ্য আমার। সারাজীবন শুধু লোকসানই করলাম।

: আর লাভ-লোকসানে কাজ নেই। গাড়ী ডাক।

অপেক্ষমান গাড়ী এগিয়ে আসতেই মণি পেছনের আসনে উঠে বসল। আমি সামনের আসনে স্থান সংগ্রহের চেষ্টা করতেই মণি বলে উঠল: ওখানে বোসো না, ছোঁয়াছুঁয়ি হতে পারে। এই অবেলায় আবার স্নান করতে হবে। দ্বিতীয় একখানা গাড়ী যখন পাওয়া যাবে না, তুমি ঐ ঘোড়াটার পিঠে চেপে বোস। তোমার ন্যায়নিষ্ঠা সুন্দর বজায় থাকবে। কিন্তু দোহাই তোমার, এই দুর্যোগের মধ্যে দৌড় দিও না।

: এভাবে বাক্য-যন্ত্রণা দিলে দৌড়েই যেতে হবে

বলে পিছনের আসনে মণির পাশে বসলাম। টাঙ্গা এগিয়ে চলল। ধূসর আকাশ এখন কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছে। বাতাসের তীব্রতা বেড়েছে। অপরাহ্নে সায়াহ্নের অন্ধকার নেমে এসেছে। বৃষ্টির ফোঁটা এখনও আরম্ভ হয় নি। তবে যে কোনও মুহূর্তে আরম্ভ হতে পারে। সব মিলিয়ে একটা আসন্ন দুর্যোগের পূর্বাভাষ।

প্রকৃতির বিরূপতা মণিমালার অন্তরেও প্রতিফলিত হয়েছে। নিস্তব্ধ প্রান্তরের মধ্য দিয়ে একমাত্র অশ্বের খুর শব্দের ধ্বনিকে পিছনে রেখে আমরা এগিয়ে চলেছি কুণ্ডের দিকে। দুর্যোগের পূর্বে মণিমালাকে তার স্বস্থানে পৌঁছে দিতে হবে। আজ ঘরে বাইরে দুর্যোগ।

দুরন্ত বেগে চলমান গাড়ীর মধ্যে বসে মনে মনে ভাবতে লাগলাম, কিছু একটা প্রসঙ্গ দিয়ে মণিমালার অন্তরের দুর্যোগটা কাটিয়ে দিই। আমাকে ভাবতে হ'ল না। মণিমালা নীরবতা ভঙ্গ করল: আনন্দমুখর রাজপ্রাসাদে নবাগত সন্তান, পিতা অজাতশত্রুর অন্তরে মানবতা-বোধ জাগিয়ে তুলল: ওদিকে আবার বাঞ্ছিত অবাঞ্ছিত সন্তানের মাধ্যমে নটী সলাবতী ভর্তৃহীনতার কলঙ্ক দূর করেছিল। একথা ঠিক তো?

: মোটামুটি ঠিক বলেই তো মনে হচ্ছে।

: তবে তোমাদের যোগানন্দবাবু আমাকে একেবারে রিক্ত, সর্বহারা করে কেন পথে বসালেন বলতে পার? বলেই একটা অসহায় অবলম্বনের মত আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার কাঁধে মাথাটা রেখে হু হু করে কেঁদে ফেলল। আমার দক্ষিণ অঙ্গের জামা অশ্রুজলে ভিজে গেল।

মনে মনে বুঝলাম নারী, সন্তানের মধ্য দিয়ে তার রিক্ততা আর ব্যর্থতার অনেকাংশে অবসান করতে পারে—একথা আজ মণিমালার অন্তরে প্রবেশ করেছে। আর্থিক প্রাচুর্যের মধ্যেও একজন নারী কিভাবে ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে, যোগানন্দবাবু সে কথা মণিমালাকে

মর্মে-মর্মে বুঝিয়ে দিয়েছে। কিন্তু বুঝেই বা লাভ কি? কোথায় যোগানন্দবাবু আর কোথায় মণিমালা! সকল দেনা পাওনা, সমাপ্ত হোক আর অসমাপ্ত হোক—ফেলে রেখে, সকল অভিযোগকে তুচ্ছ করে তিনি আজ যেখানে উত্তীর্ণ, সেখানে বিচারের এজলাস আছে কি নেই—তা আমাদের অজ্ঞাত। সে বিচারের আসামী ফরিয়াদী আমরা স্থির করি না।

মণিমালার বাহুবন্ধনে আবদ্ধ আমার দেহকে নিয়ে গাড়ী প্রায় লোকালয়ের মধ্যে চলে এসেছে। দুর্যোগের সম্ভাবনায় রাস্তাঘাট প্রায় নির্জন হয়ে এসেছে—তাই রক্ষা। নচেৎ পরিচিত অপরিচিত কোন পরিস্থিতির মধ্যেই এভাবে প্রবেশ করা শোভনও নয়, সঙ্গতও নয়। একমাত্র অপরিচিত সাক্ষী ঐ গাড়ীর চালকের সামনেও যেন নিজেকে বড় বিড়ম্বিত বলে মনে হতে লাগল। কিন্তু মণির বাহু বন্ধন কিছুতেই শিথিল হয় না।

আমি আস্তে আস্তে কাঁধের ওপরে ন্যস্ত তার মাথাটায় হাত বুলিয়ে অশ্রুমোচনের চেষ্টা করতেই হঠাৎ দেখি রাস্তার ধারে একটি গাছের নীচে দাঁড়িয়ে বিনয়বাবু। আমি সে কথা জানাতেই মণিমালার সম্বিৎ ফিরে এলো এবং যতটা সম্ভব সংযত হয়ে সেও তাকিয়ে বিনয়বাবুকে দেখে নিল।

মনে হয় আসন্ন দুর্যোগের আশঙ্কায় আমাদের (গৌরবার্থে বহুবচন ব্যবহার) এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য এসেছেন। ততক্ষণ দুর্যোগারম্ভের অগ্রদূত রূপে দু'চার ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। যে কোন মুহূর্তে প্রবল ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হতে পারে। সেই প্রতিকূল সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করে যে আকর্ষণ বিনয়বাবুকে আজ এই নির্জন জঙ্গলের মধ্যে টেনে এনেছে, সেটা তুচ্ছ নয়। সে আকর্ষণ, আমি—এমন ভাগ্যবান নিজেকে মনে করি না। মণিমালা এবং বিনয়বাবুর মধ্যে বন্ধনের যোগসূত্র যাই হোক না কেন, সেটা সামান্য নয়, এটা বুঝতে আজ কোন অসুবিধে নেই।

কিন্তু এই পরিস্থিতির মধ্যে আমি প্রথম যখন বিনয়বাবুকে দেখেছি, তিনিও যদি আমার ঘনিষ্ঠতম সান্নিধ্যে মণিমালার অশ্রু বিসর্জন এবং আমার সেই অশ্রুমোচনের প্রয়াস দেখে থাকেন, তবে তার অর্থ কী হবে সে কথা ভেবে বড়ই অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম।

আমার বিব্রত বোধ করার প্রকৃত কোন কারণ নেই। আজ এই ব্যবহারের মধ্যে যদি কিছু চক্ষুলজ্জার কারণ থাকে, তবে তার সম্পূর্ণ দায়ভাগ মণিমালার। আজ এই দুজনের একান্ত সাহচর্য্যও মণিমালার উদ্যোগেই হয়েছে। এর মধ্যে বিনয়বাবুর সমর্থন আছে কিনা তাও জানি না। আমি মনে মনে স্থির করলাম—এর মধ্যে আমার নিমিত্তভাগ কিছুমাত্র নেই। কৃতকর্মের জন্য যদি কিছু কৈফিয়ৎ দিতে হয় তবে মণিমালা দেবে—এই মনে করে আমি সাদরে বিনয়বাবুকে আহ্বান করলাম।

আমার আহ্বানে বিনয়বাবু চোখে মুখে, অঙ্গচালনায় এবং বিকশিত দন্তে যতটা বিনয় প্রকাশ করা সম্ভব তার সবগুলো সুযোগ গ্রহণ করে এমন একটা ভাব ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করলেন যে আমি থাকাতেই মণিমালার একটা ভীষণ ফাঁড়া আজ কেটে গেল।

তিনি উঠে সামনের আসনে বসতেই আমি কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। ভাবখানা যেন, "নিজের ধন পরকে দিয়ে দৈবজ্ঞ মরে কাঁথা বয়ে।" কিন্তু এখন আসন পরিবর্তন নিতান্তই দৃষ্টি-কটু। সীমাবদ্ধ স্থানের মধ্যে যতটা সম্ভব দূরত্ব রক্ষা করে মণিমালার সঙ্গে একই আসনে বসে থাকলাম।

ততক্ষণে গাড়ী এগিয়ে এসে "নিধুবন" হোটেলের সামনে আসতেই আমি হঠাৎ বলা নেই, কওয়া নেই, লাফিয়ে গাড়ী থেকে নেমে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে মণি এবং বিনয়বাবু চিৎকার করে উঠলেন।

: এই বৃষ্টির মধ্যে কোথায় চললেন? আপনি কি পাগল?

আমার একটু বিশেষ কাজ আছে। দেরী হবে। আপনারা এগিয়ে যান। আমার জন্য ভাববেন না; লাটিম যখন হাতে থাকল ঘুড়ি ঠিক পৌঁছে যাবে।

উপমাটা হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল; কিন্তু বিনয়বাবু লাটিমের কি অর্থ করবেন কে জানে। বিশেষতঃ আজ এই পরিস্থিতির পরে কথাটা মোটেই ভাল হল না। মনে মনে বিশেষ লজ্জা বোধ হতে লাগল। কিন্তু উপায় নেই। মুখের কথা আর হাতের তীর ছেড়ে দিলে নাকি ফিরিয়ে আনা যায় না।

এই সব ভাবতে ভাবতে হোটেলের বারান্দায় গিয়ে হাজির হয়ে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি গাড়ী এগিয়ে চলেছে। এতক্ষণে দু'জনের পেছনের আসনে বসে পড়েছে। কিন্তু দুজনের দৃষ্টি বিপরীত দিকে। মনে মনে ভাবলাম ভালই হয়েছে। আমি বাসায় যাবার আগে দু'জনের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়ে যাক্। তারপরেই বোধহয় আমার গ্রন্থি ছেদনের পালা। গ্রন্থিই বা কিসের? মণিমালা আমার কে? ছাত্র জীবনের এক বন্ধুর আত্মীয়া। যাকে সূত্র করে মণিমালার সঙ্গে আমার পরিচয়, সেই কাবেরীবান্ধব জনারণ্যের মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেল। এ যেন বাঞ্ছিতের কাছে পৌঁছে দিয়ে খেয়া নৌকো ডুবে যাবার মত। ফিরতে যদি হয় তবে সাঁতার ভরসা। সাঁতার আমি জানি। কিন্তু পথ যদি হয় উত্তাল তরঙ্গ সঙ্কুল?

[সাত]

বৃষ্টির হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য হোটেলের বারান্দায় আশ্রয় নিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম বৃষ্টিটা একটু ধরলে ঘরের দিকে পা বাড়াব। ততক্ষণে বিনয়বাবু এবং মণিমালার মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়ে যাবে। সেই বোঝাপড়ার মধ্যে আমার সত্য পরিচয় যদি প্রকাশিত হয়, ভালই। নচেৎ নিজের ভবিষ্যৎ রচনা করতে আমার কিছু অসুবিধে হবে না। অকারণে এই ভাবে একটা পরিস্থিতির মধ্যে জড়িয়ে পড়ে নিজে বড় বিব্রত বোধ করলাম।

বারান্দার আশ্রয় আমার নিরাশ্রয় হয়ে উঠল। বৃষ্টি তো ছিলই। তার সঙ্গে আরম্ভ হ'ল বাতাসের দাপাদাপি। গায়ের জামা-কাপড় কিছু-কিছু ভিজে গেছে। বেশ ঠাণ্ডাও লাগছে। এটা আবাসিক হোটেল; রেষ্টুরেণ্ট নয় যে একটা ডবল হাফ্ চেয়ে নিয়ে এক ঘণ্টার অবস্থিতি আদায় করব। নিতান্ত অসহায় ভাবে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঝড়-জলের আক্রমণ সহ্য করা ছাড়া উপায় নেই।

এক ভদ্রলোক হোটেলের সদর দরজা বন্ধ করতে এসে হঠাৎ বিদ্যুতের আলোকে আমাকে দেখে কিছুটা এগিয়ে এলেন। আমি ভাবলাম এবার হয়ত বারান্দায় বিনা অনুমতিতে অনধিকার প্রবেশের দায়ে অভিযুক্ত হবার পালা। ভদ্রলোক এগিয়ে এসে আমাকে বেশ ভাল করে নিরীক্ষণ করলেন। পর্য্যবেক্ষণের লক্ষ-বস্তু হয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। নিরীক্ষণে আমার বিষয়ে তিনি কি ধারণা করলেন জানি না। কিন্তু আমার হাতখানা ধরে বললেন: কাম ইন্, মাই ডিয়ার বয়।

মনে মনে ভাবলাম কেবলমাত্র শৈশব ছাড়া, জীবনের অন্যান্য স্তরগুলো, যেমন—কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্য—এদের বুঝি

কোন বয়সের ধরা-বাঁধা ছক্ নেই। এগুলো নিতান্তই আপেক্ষিক। তা না হ'লে "বাল্যে"র বয়ঃসীমা আমি অনেক আগে অতিক্রম করেছি। কিন্তু এই পক্ককেশ ভদ্রলোকের মুখে, "মাই ডিয়ার বয়" সম্বোধনটা বড়ই মধুর লাগল। তাছাড়া ইংরেজি 'বয়' শব্দটি নানা অর্থে ব্যবহার হয়। হোটেল-রেষ্টুরেন্টে খাদ্যাদি সরবরাহকারী যে কোন বয়সের মানুষই "বয়"। আফিসে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা "বয়" নামে পরিচিত। অনেক ক্ষেত্রে অকালপক্ক নব্য অফিসার তাঁর কেরানীকুলকে "মাই বয়েস" বলেন, যদিও তাদের মধ্যে হয়ত অনেকেই অথবা কিছু কিছু লোক, তাঁর পিতার বয়সীও হতে পারেন।

ভদ্রলোক হাত ধরে ভিতরে নিয়ে গিয়ে নিজে বসলেন এবং তার পূর্বে আমাকে বসালেন। তারপরেই অভিযোগ : এটা তো কোনও গৃহস্থের অন্তঃপুর নয়। তবে অত সঙ্কোচ করে এই দুর্যোগের মধ্যে বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন কেন ?

আমিও সুযোগ পেলাম। বললাম : অভিযোগ আমারও আছে। "মাই ডিয়ার বয়" বলে আমাকে যতখানি কাছে টেনে নিয়েছিলেন, "আপনি, আজ্ঞে" বললে তো আবার ততটাই দূরে চলে যাব।

: এই কথা! আমার ছেলে বেঁচে থাকলে, তোমার বয়সীই হোত। বলেই ভদ্রলোক একটু চুপ করলেন এবং হাসিহাসি মুখখানা যেন একটু ম্লান হল। মনে মনে ভাবলাম, অজ্ঞাতে ভদ্রলোকের একটি কোমল স্থানে আঘাত করে ফেলেছি। মুহূর্তের মধ্যেই ভদ্রলোক সচকিত হয়ে উঠলেন এবং আমি কোথায় উঠেছি জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বললাম, ভুবনেশ্বর পাণ্ডার আশ্রয়ে উঠেছি। তিনি বললেন :

: আজ কোথায় বেড়াতে গিয়েছিলে ?

: বিম্বিসার-কারা দেখতে।

: কারাগার তো নেই। চিহ্নটি শুধু আছে।

: সবই তো তাই। জরাসন্ধের মল্লস্থান বলে যে জায়গাটি দেখান হয়, সেও শুধু মানুষের বিশ্বাস ছাড়া আর কিছু নয়।

: বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর। সে কথা থাক। মনে হয় কলকাতা থেকে আসছ।

আমি স্বীকার করে বললাম, আমার কলকাতার ঠিকানা। ভদ্রলোকের দেশ কোথায় জিজ্ঞাসা করাতে তিনি একটু হেসে "কলকাতা" বলে চুপ করে থাকলেন। তারপর বললেন—

: কলকাতার ঠিকানাটা জানতে চাও বুঝি?

: ঠিকানাটা জানা থাকলে, একদিন যেতেও তো পারি।

: না ভাই অমন জায়গায় যাবার জন্য আর নিমন্ত্রণ করে দরকার নেই।

ভদ্রলোকের বাসস্থানের দুর্গমতার কথা অনুমান করে আমি বললাম: আমি নিশ্চয়ই যাব।

: সে তুমি নিজের থেকে যেদিন যাবে, যাবে। কিন্তু আমি নিমন্ত্রণ করে নেবো না।

আমি বিস্ময়ে ভদ্রলোকের দিকে তাকাতেই তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন: আমার তখন নবীন বয়স, পাঠ্যাবস্থা। কালিঘাটে থাকি। তখনকার দিনে ট্রাম এবং বাসের প্রতিযোগীতায় উভয় প্রতিষ্ঠানই রাস্তার মোড়ে মোড়ে লোক নিয়োগ করতো। তারা ডেকে ডেকে যাত্রীদের গাড়ীতে তুলতো। একদিন দেখি কালিঘাটে ট্রাম ডিপোর কাছে কিছু লোকের ভীড়। এগিয়ে গিয়ে জানতে পারলাম, এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক ট্রাম কোম্পানীর জনৈক কর্মচারিকে হঠাৎ মেরে বসেছেন। বৃদ্ধ ভদ্রলোক সেখানেই দাঁড়িয়ে। নিতান্তই গোবেচারি মত চেহারা। মোটেই মারমুখী নন। এমন একজন নিরীহ ভদ্রলোক একটা লোককে হঠাৎ প্রহার করেছে শুনলে অদ্ভুত লাগে।

নানা লোকের নানা কথার থেকে যে কাহিনী উদ্ধার হল তা এই

যে তখনকার দিনে কালিঘাট থেকে নিমতলা পর্য্যন্ত একটি ট্রামের সার্ভিস ছিল। ট্রামের কর্মচারিটি চাকুরির আনুগত্যে সম্ভব অসম্ভব অনেককেই নিমতলাগামী ট্রামে যাত্রার জন্য প্রস্তাব করছিল। বৃদ্ধ বয়সের ঐ ভদ্রলোক হঠাৎ বলা নেই, কওয়া নেই, নিমতলা যাত্রার আমন্ত্রণে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তারই পরিণতি সে'দিনের সেই জটলা।

আমি বললাম: নিমতলা, কেওড়াতলায় রোজ লক্ষকোটি মানুষ যাচ্ছে। ভদ্রলোক হঠাৎ ক্ষিপ্তই বা হ'লেন কেন?

: কোন পরিস্থিতিতে মানুষ কি করে বসে, তার অবস্থায় না পড়লে, সে বিচার চলে না, ব্রাদার। সে ভদ্রলোকের শারীরিক অবস্থা হয়ত নিমতলা যাত্রার অনুকূলে ছিল, তাই তিনি ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন।

: নিমতলায় মানুষ শুধু একটা কারণেই যায় না। সংসারের লক্ষকোটি স্থানের বিবাহাদি, হাজার রকমের অনুষ্ঠান নিমতলাতেও অনুষ্ঠিত হয়। সুতরাং তাঁর বিব্রতবোধ নিতান্তই অমূলক।

ভদ্রলোক বললেন : ওসব কথা ছেড়ে দাও ভাই। বিম্বিসার-কারা কেমন দেখলে বল।

: নামটাই কারাগার। কিন্তু সত্যিকার ওটা তো একটা কাল্পনিক চক্ষু ছাড়া কিছু নয়।

: কিন্তু রাজা অজাতশত্রু বৃদ্ধ পিতাকে কারারুদ্ধ করেছিল এটা তো মনে হয় সত্যি কথা। বৃদ্ধ বয়সে রাজার ঐ পরিণতির কারণ তিনি বৌদ্ধ ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন আর ছেলে ঐ ধর্ম-বিশ্বাসের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু ধর্মবিশ্বাসটা মানুষ যদি নিজ-নিজ অন্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে পারতো তবে কত বড় বড় দুর্ঘটনা যে এড়ানো যেতো, ঠিক নেই।

: আজ বোধহয় তা আর সম্ভব নয়। আজকের পৃথিবীতে মানুষ—তার অন্তরে ধর্মবিষয়ে ভক্তিবিশ্বাস যতটা থাক আর না থাক—সব কিছুর মধ্যেই ধর্মটাকে জড়িয়ে ফেলেছে। রাজনীতি, সমাজ-

নীতি এমন কি গার্হস্থ্যনীতি পর্য্যন্ত "ধর্ম" বলে অধুনা পরিচিত একটা ভাববোধের সঙ্গে একেবারে একাকার করে জালে জড়িয়ে পড়েছে।

ভদ্রলোক বললেন : সে কথা একেবারে সত্যি। এই যে বিরাট দেশ ভারতবর্ষটা ভাগ হয়ে গেল, এও তো ধর্মেরই নামে। অথচ এই বলিদানের উদ্যোগী পুরুষরা নিজ নিজ বুকে হাত দিয়ে ভাবলে অবাক হয়ে যাবেন, কোথায় সেই ধর্ম, যার জন্য তারা এত বড় বিপর্য্যয় নিয়ে এলেন।

আমি বললাম : ওটা ধর্ম নয়, সম্প্রদায়ের কথা।

: কিন্তু সেও তো ধর্মেরই নামে। যাক সে সব কথা। বিম্বিসার-কারা দেখে এলে, তা গৃধ্রকূট পাহাড়ে উঠেছিলে নাকি?

: যা দুর্য্যোগ ঘনিয়ে এলো, তাই যাওয়া হ'ল না। তাছাড়া আমি বিশেষ জানিও না।

: বিম্বিসার-কারা ছাড়িয়ে গৃধ্রকূট পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেলেই একটা ধ্বংসস্তূপ দেখতে পাবে। ঐটেই জীবকের চিকিৎসালয় বলে কথিত। আচ্ছা, গর্ভজাত সন্তানের ওপর মাতৃজঠরের প্রভাব তুমি বিশ্বাস কর?

আমি ভাবলাম আবার সেই নটী সলাবতীর কাহিনী এসে যাচ্ছে। আমি সে কথা বললাম : আপনি বোধহয় সলাবতীর কথা বলছেন?

তিনি বললেন : হ্যাঁ।

: বিশ্বাস অবিশ্বাস দিয়ে ও দুর্জ্ঞেয় রহস্য সমাধান করা যাবে না। ও কাহিনী আমি মোটামুটি জানি। আপনি গৃধ্রকূট পাহাড়ের কথা বলুন।

: "রত্নগিরি"র দক্ষিণ অংশটাকে গৃধ্রকূট বলে।

: 'গৃধ্র' অর্থে "শকুন" বোঝায়। এই নামকরণের কোন ইতিহাস আছে নাকি?

: নামের কি ইতিহাস থাকে ভাই? সংসারের যাবতীয়

লোকগুলো আর স্থানগুলোর নাম বিচার করে দেখ—অনেক বিশ্বাস-ঘাতকতার চিহ্ন খুঁজে পাবে।

আমি বললাম : বিশ্বাস ঘাতকতা বলছেন কেন ?

: বলব না ? চরম বিশ্বাসঘাতকতা। আমি মা বাবার একমাত্র সন্তান। আমার জন্মদাতা হয়ত নিজের চরিত্র, উত্তরপুরুষের মধ্যে কামনা করে আমার নাম রেখেছিলেন "রিপুঞ্জয়"। কিন্তু তাঁর সকল প্রত্যাশার সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে ষড়রিপুর সমষ্টিগত তাড়নায় আমি আজ কোথায় এসেছি।

মনে মনে ভাবলাম বৃদ্ধের অতীত ইতিহাস পরিতাপের দহনে অন্তরকে নির্মল করেছে। কিন্তু কী সে ইতিহাস আমি জানি না। রিপুঞ্জয়বাবু বললেন : আজ এই বৃদ্ধ বয়সেও রিপুর তাড়নার হাত থেকে অব্যাহতি পেলাম না। এই দেখ না ভায়া······

আমি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললাম : দাদা, কি হবে সে সব ইতিহাস শুনে ? আপনি ঐ গৃধ্রকূট পাহাড় আর বিশ্বশান্তি স্তূপের কথা বলুন। তিনি মৃদু একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন : একদিন যা ঘটেছিল, আজ তা ইতিহাস। আজ যা ঘটছে, একদিন তা ইতিহাস হ'লে হতেও পারে। বারবণিতার গর্ভজাত সন্তান একদিন ইতিহাসের পাতায় উঠে আসবে কে জানতো ?

আবার কথা সেই সলাবতীর দিকে চলে যায়। আমি বললাম : শুনেছি ঐ গৃধ্রকূট পাহাড়ে ভগবান তথাগত বুদ্ধ কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন।

তিনি বললেন : বিম্বিসার-কারা থেকে একটু দক্ষিণে এগিয়ে গেলে বাঁ দিকে গৃধ্রকূট ও বিশ্বশান্তি স্তূপে যাবার পথ। ঐ গৃধ্রকূট পাহাড়ের ওপরে বুদ্ধদেব বেশ কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন এবং ঐখানেই তিনি ভক্তদের ধর্মশিক্ষা দিতেন।

: ভগবান বুদ্ধের সেখানে অবস্থানের কোনও চিহ্ন আছে কি ?

: আছে, আছে। তিনি যে গুহাটিতে বাস করতেন সেটি

কালের আঘাতকে তুচ্ছ করে কোনও মতে টিঁকে থাকলেও আচ্ছাদনটি ভেঙ্গে পড়েছে।

: শুনেছি সেই পাহাড়ে উঠে যাবার সিঁড়ি আছে।

: মহারাজ বিম্বিসারের কীর্তি অমর হয়ে আছে সেই গুহাতে উঠে যাবার সিঁড়ির মধ্যে। গৃধ্রকূট পাহাড়ের শিখরে ঐ গুহা সমন্বিত স্থানটি বড়ই মনোরম।

বিপুঞ্জয়বাবু হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলেন : মিসেস কোথায় ভায়া?

প্রশ্নটি বড়ই গোলমেলে: আমার মিসেসের অস্তিত্ব বিষয়ে তিনি যেন স্থির-নিশ্চয়। তবে কি টাঙ্গার ওপরে আমি এবং মণিমালার অবস্থান তিনি হোটেল থেকে লক্ষ্য করেছেন? যদি করে থাকেন, তবে উভয়ের সম্বন্ধটি মিষ্টার-মিসেস হিসেবে অনুমান করা কতটা যুক্তিসাধ্য তা কে জানে? আমি বললাম : মিসেস নেই। বলেই পরবর্তী অজ্ঞাত প্রশ্নের আশঙ্কায় তাকিয়ে থাকলাম। তিনি যেন একটু সংশয়ের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে কি ভাবলেন কে জানে। বললেন : তা হলে একাই যাবে। উপায় কি? "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলরে"। কিন্তু একলা চলায় পা যেন ভারী হয়ে আসে।

: সে না হয় সঙ্গী যোগাড় করে নেবো।

: গুড্, গুড্, সঙ্গী চাই।

এরই মধ্যে দুই একবার একটি মহিলা এসে ভদ্রলোককে কোন কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া অথবা ওষুধের ব্যবস্থা করে দিতে আমি দেখেছি। এখন বুঝলাম বোধহয় ক্লান্ত জীবনের সঙ্গী। তিনি বলতে লাগলেন : ঐ গৃধ্রকূটের পাদদেশে "ধনিয়" নামে জনৈক ব্যক্তি ভগবান তথাগত বুদ্ধের স্মরণে একটি সুন্দর উপবন তৈরী করিয়ে ছিলেন। রাজগৃহের লোকেরা ওখানে বেড়াতে যেতো।

: "ধনিয়" নামক ব্যক্তির উপযুক্ত ধন থাকা অসম্ভব নয়, এবং সন্নাবতীর অবস্থানের কাছেই উপবন প্রস্তুত করে তিনি রসিকজনের

ধন্যবাদের পাত্র হয়েছিলেন মনে হয় ; কারণ ভ্রমণকারীরা সলাবতীর সাহচর্য্যে ধন্য হবার সুযোগ পেত।

: বারাঙ্গনার সঙ্গ কি ভাগ্য দ্বারা লাভ করতে হয় ব্রাদার? ভাগ্যহীনদের ললাটে অযাচিত সাহায্যে জীবনকে বিড়ম্বিত করে। বলতে বলতে ভদ্রলোকের কথার ভাব অন্যরকম হল। বুঝলাম বিগত জীবনের ইতিহাসের পাতা তাঁকে পীড়িত করেছে। এই হোটেল চালনার পেছনে হয়ত কিছু ইতিহাস আছে। থাকে, থাকুক, আমার কি? দুর্যোগের ক্ষণিক আশ্রয়দাতার ইতিহাস সন্ধানে আমার কোনও প্রয়োজন নেই। আমি বললাম : যা বলছিলেন, বলুন।

: ভগবান তথাগত বুদ্ধের আশীর্বাদধন্য ঐ গৃধ্রকূট পাহাড়ের প্রতিটি ধূলিকণা পবিত্র হয়ে আছে। উত্তর দিকের একটা বড় গুহায় তাঁর প্রিয় শিষ্য আনন্দ বাস করতেন। এখানেই আরও কতগুলো গুহায় সারিপুত্র, মোদগল্লায়ন প্রভৃতি বাস করতেন।

ইতিমধ্যে ভদ্রলোক ভেতর থেকে একটা ইঙ্গিত পেয়ে প্রস্থান করে দুই এক মিনিটের মধ্যে ফিরে এলেন। আমি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি রাত দশটা বাজে। বিচলিত হলাম। হোটেল হলেও হোটেলের মালিকের খাওয়া-দাওয়া বলে একটা কথা থাকা অসম্ভব নয়। আমি নিজে সময়মত গৃহে না ফিরলে অন্য কেউ আকুলি-বিকুলি করবে—এমন ব্যবস্থা না থাকলেও, মণিমালা নিশ্চিন্তে বসে থাকবে এমন মনে হয় না। তাছাড়া মধ্যপথে যে বিতর্কিত পরিস্থিতির মধ্যে বিনয়বাবু আর মণিমালাকে ছেড়ে দিয়েছি, তাতে আমার স্থান কোথায় নির্দিষ্ট হয়ে আছে কে জানে? সেদিক দিয়ে রিপুঞ্জয়বাবুর সঙ্গে আমার এই পরিচয় মন্দ নয়। বিশেষ করে বাইরে যে ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাত চলেছে তাতে এর মধ্যে ঘরে ফেরা সম্ভব হবে কিনা কে জানে। হোটেলের অধিবাসীরা আজ দুর্য্যোগের সুযোগে নিজ নিজ শয্যায় আশ্রয় নিয়েছে। আমি বললাম—

: আমি এবার যাই।

: কোথায়?

: বাড়ীতে।

: কোন পাগল ছাড়া এর মধ্যে কেউ বাইরে যায় না।

: তবে আপনারা খাওয়া-দাওয়া মিটিয়ে নিন। অনেক রাত্রি হয়েছে।

: লোকে বলতে বলে, হোটেলওয়ালা। আমাদের আবার খাবার ভাবনা। সে একটা হলেই হ'ল। এই কথা বলতে বলতেই এক মহিলা উপস্থিত হয়ে ভদ্রলোককে আদেশের ভঙ্গীতে খেতে আহ্বান করলেন এবং আমাকে করজোড়ে আমন্ত্রণ জানালেন।

মহিলার পোশাক-পরিচ্ছদে পরিপাট্য আছে কিন্তু চেহারার মধ্যে আভিজাত্য কিছু নেই। আদেশের ভঙ্গীতে ঠিক পরিচারিকা মনে হয় না। ভদ্রলোকের আদেশ পালনের তৎপরতায় সম্বন্ধের ঘনিষ্ঠতা লক্ষ্যণীয়। রিপুঞ্জয়বাবুর কোন রিপুর তাড়না কে জানে। এটা একটা হোটেল। সুতরাং আহার-গ্রহণে আমন্ত্রণেরও প্রয়োজন হয় না। কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে আমার সঙ্কোচের সীমা নেই। বিশেষতঃ এতক্ষণে আমার জন্য মণিমালা কতটা কি ব্যবস্থা করে রেখেছে তাও অনিশ্চিত। আমি দুর্যোগকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বেরিয়ে পড়বার আয়োজন করতেই মহিলা পথ অবরোধ করে দাঁড়িয়ে আমাকে বসতে বললেন। বুঝলাম, রিপুঞ্জয়বাবুর সঙ্গে লৌকিক সম্পর্ক যাই হোক না কেন, মহিলার বক্তব্যে বলিষ্ঠতা আছে। আমি বসে পড়ে বললাম : বাড়ী আমাকে যেতে হবেই—তা দুর্যোগ যতই হোক। কিন্তু আপনারা খাওয়া-দাওয়া করে নিন। ততক্ষণ আপনি বিশ্বশান্তি স্তূপ সম্বন্ধে বলুন। ভদ্রলোক মহিলার দিকে তাকালেন, বোধহয় অনুমতির প্রত্যাশায়। অনুমতি মনে হয় সঙ্কেতে মিলেছিল, কারণ ভদ্রলোক বলতে আরম্ভ করলেন। যা বললেন তার মর্ম এই যে ঐ গৃধ্রকূট পাহাড়টির পশ্চিমে রত্নগিরির

শিখরে বিশ্বশান্তি স্তূপ নির্মিত হয়েছে। জাপানী বৌদ্ধদের বিশ্বাস যে ভগবান বুদ্ধদেব এখনও প্রতিদিন গৃধ্রকূট পাহাড়ে এসে তার শিষ্যদের ধর্মোপদেশ দেন।

আমি বললাম : ওরা কি সত্যি বিশ্বাস করে, অথবা ওটা ধর্ম বিশ্বাসের বিলাসিতা ?

: তা কি করে জানব? নিজেদের কথা ভেবে দেখ না। মন্দিরে গিয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করবার সময় যদি সত্যি ঠাকুর সেখানে আছেন বলে বিশ্বাস কর, তবে কি মন্দির থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব ? তাহলে সমস্ত সংসারটাই বানপ্রস্থ হয়ে যাবে।

: তা হোক না বানপ্রস্থ।

মহিলা এতক্ষণে তাম্বূলরাগরঞ্জিত দন্তপংক্তি বিকশিত করে একেবারে সটান আমার দিকে তাকিয়ে বললেন : তবে সৃষ্টি রক্ষা করবে কে ?

: আমি বললাম : সৃষ্টি রক্ষার চিন্তা করবার ভিন্ন ব্যবস্থা আছে। আমরা চেষ্টা করলেই সৃষ্টি রক্ষা করতে পারব কি ?

ভদ্রলোকের মুখে একটা বিষণ্ণ ছায়া ফুটে উঠল। মনে হ'ল সৃষ্টি রক্ষার প্রচেষ্টায় তার অনুদান বুঝি ব্যর্থ হয়েছে—তারই বেদনা।

মহিলা : সৃষ্টিকর্তা তাই মন্দিরে মন্দিরে আত্মগোপন করে থাকেন।

কথা টেনে আমি বললাম : লোকগুলো মানে মানে ঘরে ফিরে গিয়ে প্রাণপণে সৃষ্টিরক্ষা করুক, এই বুঝি তার মনোগত অভিপ্রায় ?

ভদ্রলোক আমার বিরক্তি অনুমান করে আরম্ভ করলেন : এগার'শ ফুট উঁচু এই রত্নগিরির ওপরে আঠার লাখ টাকা খরচা করে বিশ্বশান্তির নামে জাপানের বৌদ্ধসঙ্ঘ শান্তিস্তূপ নির্মাণ করলেন। এই মন্দির ১২৫ ফুট উঁচু।

: ঐ শান্তিস্তূপে যাবার বৈদ্যুতিক রোপওয়ে তৈয়ারী হয়েছে—আমরা দূর থেকে দেখে এলাম।

রোপওয়ে সম্বন্ধে ভদ্রলোক যা বললেন তার মর্মার্থ এই যে শান্তিস্তূপ তৈরীর জিনিসপত্র দিয়েছে জাপান সরকার আর তৈরী করেছে বিহার সরকার। রোপওয়েটা ২২০০ ফুট লম্বা, মোট ১১৪টা চেয়ার আছে। তিনি বললেন : কিন্তু ভাই ওতে উঠতে হ'লে বয়স কম থাকতে থাকতে উঠতে হবে।

: কেন?

: চলমান চেয়ারগুলোতে লাফিয়ে উঠতে হ'লে শারীরিক ক্ষিপ্রতা থাকা চাই।

এইবার মহিলা হিঃ হিঃ করে হেসে উঠলেন এবং প্রবল হাসির মধ্যে যে বর্ণনা দিলেন তাতে বুঝলাম, ঐ ভদ্রলোক এবং ঐ মহিলার রোপওয়ে যাত্রার কাহিনী বেশ হাস্যকর হয়ে উঠেছিল। মহিলা হাস্যময় বিবৃতি দিতে দিতে মাঝে মাঝেই ভদ্রলোকের অর্থাৎ রিপুঞ্জয়বাবুর শরীরটা হাত দিয়ে ঠেলে দিচ্ছিলেন। মনে হয় ওটা মনোযোগ আকর্ষণের একটা ছলনাময় ব্যতিক মাত্র। মাঝে মাঝে আমার দিকেও তির্য্যক দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলেন। অর্থাৎ আমারও মনোযোগ আকর্ষণের প্রয়োজন আছে কিনা, তার হিসেব করছিলেন। আমি তক্তপোষের কিনারায় বসে ছিলাম। সুতরাং তাঁর মনোযোগ আকর্ষণের সম্ভাবিত পরিধির বাইরে নিরাপদ দূরত্বে যাবার উপায় নেই। নানারূপ কথাবার্তায় মহিলার বস্ত্রাদি শিথীল হওয়াতে লক্ষ্য করলাম, তাঁর বেশ ভূষায় শালীনতার সীমা রক্ষিত হয় নি। হোটেল জীবনের নানা পরিবেশ আমি দেখেছি। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। ব্যতিক্রম শুধু, রিপুঞ্জয়বাবুর আপাতদৃষ্ট বিদ্যা-বুদ্ধি এবং রুচিবোধ।

নানাবিধ অঙ্গসঞ্চালন, দোলালাগানো হাসি এবং রসমধুর বাক্যাদির দ্বারা মহিলা যখন পরিবেশটি একেবারে রসঘন করে ফেলেছেন, এবং এতক্ষণের মাধুর্য্যে, বোধ হয় অজ্ঞাতেই, মহিলার এবং আমার দূরত্ব অনেকটা কমে এসেছে, এমন সময়ে দরজায়

করাঘাত।

হোটেলের দরজায় করাঘাত কিছু অভিনব ব্যাপার নয়। রিপুঞ্জয়বাবু উঠে দরজা খুলে দিতেই একজন সম্পূর্ণ সিক্তবসনা রমণী প্রবেশ করল। ঘরের তীব্র আলোতে তার মুখখানা স্পষ্ট হতেই আমি একেবারে স্তম্ভিত।

[আট]

মুক্ত দ্বারপথে প্রথমে একটা চোখ ঝলসানো বিদ্যুতালোক, এবং তার পরেই একটা প্রচণ্ড বজ্রপাতের শব্দে আমরা যখন চমকে উঠেছি, তখনও মণিমালা আপাদমস্তক সিক্ত বসনে আবৃতা হয়ে, অবিচলিত-ভাবে একবার আমাকে, একবার শিথীল-বসনা মহিলাকে পর্য্যবেক্ষণ করে চলেছে। বোধহয় উভয়ের মধ্যে যোগসূত্রটা কি—তাই অন্বেষণের চেষ্টা। প্রয়াস কতখানি সফল হয়েছে জানি না। সে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে পা বাড়াল। আমি ডাকলাম: মণিমালা।

সে ফিরে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকাল। মনে হল, সত্যযুগের মুনি ঋষিদের মত যদি তার দৃষ্টিতে দহনক্ষমতা থাকত তবে আমার গতি কি হোত জানি না। আমি বললাম: দাঁড়াও।

: কেন?

: এই দুর্য্যোগের মধ্যে তোমাকে একলা ছেড়ে দিতে পারি না।

: দয়ার শরীর। না পারবারই কথা। তবে অত অনুগ্রহে দরকার নেই। বলেই সে আবার বাইরের দিকে পা বাড়াতেই আমি উঠে দাঁড়ালাম। কিন্তু এ আবার নতুন বিপত্তি। মহিলা এতক্ষণে আমার ডান হাতখানা ধরে বলে উঠল: এই দুর্য্যোগের মধ্যে আমি আপনাকে কিছুতেই যেতে দেবো না। পুনরায় মণিমালার দিকে তাকিয়ে বলল: আপনাকেও বলছি, জামাকাপড় ছেড়ে বিশ্রাম করুন। এ অবস্থায় শেয়াল কুকুর পর্য্যন্ত বাড়ীর বাইরে যায় না।

মণি বলল: শেয়াল কুকুরেরও অধর্ম যারা, তাদের যেতে অসুবিধে হবে না। বলেই ঝড়-জল বজ্রাপাতের মধ্যে মণিমালা বেরিয়ে পড়ল। আমার হাতখানা তখনও মহিলার হাতের মধ্যে ধরা আছে।

রিপুঞ্জয়বাবু ব্যাপারটা কতখানি অনুমান করতে পেরেছেন জানি না। তিনি আস্তে বললেন : ওঁকে যেতে দাও। মুক্তি পেয়ে বাইরে আসতেই বিদ্যুতের আলোকে দেখি এরই মধ্যে মণিমালা অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। বৃষ্টিরও বিরাম নেই, বাতাসেরও দাপাদাপির শেষ নেই। ইতিমধ্যে বারান্দার অন্ধকার থেকে একটি লোক বেরিয়ে এসে আমার সঙ্গী হল। তার গায়ে ওয়াটারপ্রুফ্ আর মাথায় ছাতা। ভাল করে দৃষ্টি দিতেই দেখি লোকটি শ্যামসুন্দরবাবুর ভৃত্য। কাছে আসতেই জিজ্ঞাসা করলাম, তার হাতে বৃষ্টির হাত থেকে আত্মরক্ষার এত আয়োজন থাকতে মণিমালার এই সিক্ত বসন কেন! ছাতাটি অবশ্য বাতাসের তাণ্ডবে কোন কাজেই আসছে না।

আমার কাছাকাছি আসতেই আমি তাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলল, রাত দশটার সময়ে হঠাৎ এই দুর্যোগের মধ্যে মণিমালা শ্যামসুন্দরবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে ভীষণ উত্তেজিতভাবে আরতি দিদিমণিকে ডাকাডাকি আরম্ভ করল। সকলের উপস্থিতিকে অগ্রাহ্য করে আরতিকে উত্তেজিতভাবে ডাকাডাকির অর্থ বুঝতে আমার কিছু অসুবিধা হল না। পাঠকও হয়ত বুঝে থাকবেন যে আমার নিরুদ্দেশের সঙ্গে আরতির অবস্থিতির যোগাযোগ আছে কিনা তাই জেনে নেওয়া হয়ত মণিমালার উত্তেজনার কারণ।

সমগ্র প্রতিকূল অবস্থাকে অগ্রাহ্য করে মণিমালা এগিয়ে চলেছে, কিছুটা পেছনে আমি আর শ্যামসুন্দরবাবুর ভৃত্য তাকে অনুসরণ করে চলেছি। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের আলোতে মণিমালার সিক্ত বসনাবৃত দেহলতা দৃশ্যপটকে রহস্যঘন করে তুলছে। এখন কিন্তু ক্ষ্যাপা বাতাসের মণিমালার বস্ত্রহরণের কোন দুরভিসন্ধি নেই। কিন্তু সর্ববিধ বস্ত্রসম্ভারের প্রাচুর্য সত্ত্বেও মণিমালার অঙ্গশোভা সিক্ত বসনের আবরণকে উপেক্ষা করে দৃশ্যমান হতে লাগল। শুধু নিকষ কালো অন্ধকারের বুকে একমাত্র বিদ্যুতের আলোর প্রতীক্ষা।

তারপর ভৃত্যের কাছে জানলাম গৃহে আরতিকে উপস্থিত দেখে এবং সেখানে আমাকে অনুপস্থিত দেখে মণিমালা কিছু শান্ত হলেও একেবারে নিশ্চেষ্ট হতে পারে নি। সে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়েছে এবং আরতির সঙ্গ দেবার প্রস্তাবে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে, একাই বেরিয়ে পড়েছে। দুর্যোগের প্রাক্‌কালে আমাকে "নিধুবন" হোটেলের কাছে দেখেছে—এই সূত্র ধরে পূর্বোক্ত নাটকীয় দৃশ্যের যবনিকা উত্তোলন করেছে। নিজের উপস্থিতি এখনও সে মণিমালাকে জানতে দেয়নি। শ্যামসুন্দরবাবুর নির্দেশে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে অনুসরণ করেছে মাত্র। এই কথা জেনে আমি ভৃত্যকে বিদায় দিয়ে অন্ধকার রজনীর দুর্গম যাত্রায় মণিমালাকে অনুসরণ করে এগিয়ে যেতে যেতে ভাবতে লাগলাম, এই যাত্রার অবসান কোথায়।

এত যন্ত্রণা এবং বৈচিত্র্যের মধ্যেও একটা কথা স্বীকার না করে পারলাম না যে আজ আমার অবস্থাটা একমাত্র নাসিকায় রজ্জু সংবদ্ধ করে আকর্ষণ ছাড়াও অন্য কিছু আছে। কিন্তু মণিমালা আমার কে। সে আমাকে কোথায় নিয়ে চলেছে? ঘৃত এবং অগ্নির সম্পর্কের উপমা দিয়ে কাব্যে, সাহিত্যে অনেক কথা দেখা যায়। আমিও কি আজ গব্যঘৃত হয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে অগ্নির দাহ্য ধর্মের কোপে পড়ে এগিয়ে চলেছি? অস্বীকার করতে পারলে সুধীজনের কাছে মুখ রক্ষা হোত সন্দেহ নেই, কিন্তু সত্য-মিথ্যা ভাষণের দ্বন্দ্ব থেকেই যায়। এই অনুসরণের মধ্যে সেদিন একমাত্র কর্তব্যবোধ ভিন্ন অন্য কিছু উপলব্ধি ছিল না—এমন কথা বলা শক্ত। এ এক রহস্য।

কক্ষপথে আবর্তিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের লক্ষকোটি বিবর্তনের মধ্যেও এই রহস্য শাশ্বত হয়ে আছে। কোন অনাদি অতীতে এর সূচনা কে জানে। আজ আমাকে আর মণিমালাকে নিয়ে এর প্রথম প্রশ্ন নয়, বিনোদিনীর "চোখের বালি"তে নয়, কিরণময়ীর জীবনযন্ত্রণায় নয় কিংবা বনমালী সরকার লেনের ছোট বৌ-ঠানের অশ্রুরুদ্ধ জিজ্ঞাসার

মধ্যেও নয়। তার আগে, অনেক আগে, বিম্বিসার-কারার প্রান্ত দেশে সলাবতী নটীকে ঘিরেও এ রহস্যের জন্ম হয় নি। ত্রেতাযুগে কুশরাজার পুত্র বসু যেদিন পঞ্চ পর্বতের মধ্যে গিরিব্রজ নগর স্থাপন করেন, তারও আগে। রামচন্দ্র যেদিন সাগর বন্ধন করেন, তারও অনেক আগে, "আদিম বসন্তপ্রাতে মন্থিত সাগরে, ডানহাতে সুধাপাত্র বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে," সেই উর্বসীর আবির্ভাব যেদিন হয়, তারও আগে। প্রলয় পয়োধি জলে নিমগ্না ধরিত্রীর বুকে স্বীয় সহধর্মিণী লক্ষ্মীদেবীকে তরণীরূপ দান করে সেই তরণীর মধ্যে স্বয়ং শ্রীবিষ্ণু সৃষ্টির মূলাধার রক্ষিত করেছিলেন। যুগে যুগান্তরে সেই সৃষ্টি মহিমার সহস্র সহস্র লক্ষ কোটি ধারায় ক্ষরিত হয়ে বিশ্বভুবনকে রূপে-রসে-গন্ধে আর অপূর্ব বৈভবে পূর্ণ করেছে। আজও কাশ্মীর যাত্রীরা বানিহাল সুড়ঙ্গ অতিক্রমের আগে পূর্বভাগে সেই নৌবন্ধন তীর্থের দিকে তাকিয়ে সৃষ্টি রক্ষার কৃতজ্ঞতায় সৃষ্টিকর্তার চরণে সহস্র কোটি প্রণতি জানায়।

এতক্ষণে আমরা ভুবনেশ্বরের ভুবনের একেবারে কাছে এসে পড়েছি। মণিমালা দাঁড়িয়ে পড়ল এবং আমিও দাঁড়িয়ে দেখি ভুবনের দ্বারদেশ মুক্ত। বারান্দায় বিনয়বাবু পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে। বাইরে বিরামবিহীন বারিধারা আর উন্মত্ত বাতাসের তাণ্ডব সত্ত্বেও তিনি অবিচলিত। আমাদের দুজনকে দেখা মাত্র তিনি যন্ত্রচালিতের মত ভেতরে প্রবেশ করলেন। বারান্দায় উঠে মণিমালা যখন ফিরে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকাল, এত দুঃখের মধ্যেও শীতে কাঁপতে কাঁপতে আমি বললাম : আসামী লকআপে থাকল। দারোগাবাবু শান্ত হোন। বলেই আমি আমার ঘরে প্রবেশ করতেই ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে বাইরে থেকে অর্গলবদ্ধ হ'ল। রুদ্ধদ্বার কক্ষের মধ্যে সিক্ত বসনে একাকী দাঁড়িয়ে ঘটনার নাটকীয়তায় যখন মনে মনে বেশ একটা রোমাঞ্চ বোধ করছি, তখন পার্শ্ববর্তী কক্ষের দরজা বন্ধ হ'বার শব্দ পেলাম। মনে মনে ভাবলাম, ঘরের খেয়ে বনের মোষ

তাড়ান বোধহয় একেই বলে। অবশ্যি আমি ঘরের খাইনা, মণিমালার খাই। তাই কি ঋণশোধের এই ব্যবস্থা ?

এইভাবে নানা কথা ভাবতে ভাবতে আমার ঘরের দরজা খুলে গেল এবং নির্বাক ছায়াচিত্রের নায়িকার মত মণিমালা আমার বস্ত্র পরিবর্তনের ব্যবস্থা করে দিল। আমি না হয় মণিমালার খাই, কিন্তু পরি না। তবে মণি আমাকে বিনয়বাবুর বসন দিয়ে গেল কেন ? বিনয়বাবুর সজ্জায় আমাকে সাজিয়ে মনিমালা নতুন কিছু অনুসন্ধান করতে চায় কিনা কে জানে।

জামা-কাপড় পরিবর্তন করে বিছানায় আশ্রয় নিয়ে আলো নিবিয়ে দিয়েছি। মনে মনে নানা কথা ভাবতে লাগলাম। যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়। কাল সকালে সকলের নিদ্রাভঙ্গের পূর্বে আমি এই সুখের নীড় পরিত্যাগ করে দুই চক্ষু যে দিকে চালনা করে, সেই দিকে চলে যাব। গয়া, বুদ্ধগয়া, পাওয়াপুরীর জলমন্দির এবং নালন্দা প্রভৃতির যে কোন স্থানে আমি অনায়াসে আত্মগোপন করতে পারব। সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল। দুচার দিন ঘোরাঘুরি করে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাব। চাকুরী করব, ঘুমোব। আবার একদিন আমার প্রেয়সী পাশ সুন্দরীকে সঙ্গে নিয়ে মণিমালা-রত্নমালা নেই—এমন একটা স্থান বেছে নিয়ে নিরিবিলি কাটিয়ে দেব। ঐতো রিপুঞ্জয়বাবুর আশ্রয়েই বা থাকলে আমার ক্ষতি কি ? যাবার আগে মহিলার সঙ্গে একবার দেখা করে যেতে হবে। যে রিপুর তাড়নাতেই তিনি সংগৃহীত হয়ে থাকুন, তাতে আমার কিছু এসে যায় না। মোট কথা, কাল দুর্গা বলে ঝুলে পড়ব।

এই সব নানা কথা চিন্তা করতে করতে রাত যখন গভীর, তখন ঘরের দরজা খুলে গেল। চোখ বুঁজে থাকলেও বুঝলাম মণিমালা এসেছে। আবার রহস্য নাটকের কোন দৃশ্যের যবনিকা উঠবে, এই ভয়ে কণ্টকিত হয়ে থাকলাম। চোখ বুঁজে অনুভব করলাম মণিমালা ঘরের মধ্যে আহারের ব্যবস্থা করছে।

একটু পরে একহাতে জলের গ্লাস, অন্যহাতে লুচিপূর্ণ থালা নিয়ে পরিচ্ছন্ন স্থানটিতে রেখে, আসন পেতে দিয়ে ডাকল : ও জেগে-থাকা চোখবুঁজো মামা, খাবে এসো।

আমি চোখ বুঁজে তবু শুয়েই আছি। সে আবার বলল : সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল। এসোনা গো। তবুও আমি তেমনিভাবেই চুপ করে শুয়ে আছি। সে তখন বিছানার কাছে এসে পায়ের দিকে দাঁড়াল। সিক্ত, মুক্ত, দীর্ঘ, কুঞ্চিত কেশরাশি আমার বিছানার ওপর ছড়িয়ে পড়ল। আমি পায়ের ওপর উষ্ণভাব বোধ করলাম। বুঝলাম অশ্রু জলধারা। এর পরে একমাত্র পাষাণ ছাড়া অন্য কিছু চুপ করে থাকতে পারে না। নিজে উঠে বসে হাত দুখানা ধরে তাকে বসালাম। মুখখানা দেখে ইচ্ছে হল আদর করে মুছিয়ে দিই। আরও কিছু ইচ্ছে যে হয়নি সে কথা অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু ভরসা পেলাম না। কারণ প্রশ্রয় পেলে, সর্ব লোকচক্ষুর অন্তরালে দ্বিপ্রহর রজনীর এই নির্জন কক্ষে সে কী করে বসবে কিছুই বলা যায় না।

পাপপুণ্য বিচারের যিনি নিয়ামক, তাঁর বিচারের মানদণ্ড আমার জানা নেই। প্রাতঃস্মরণীয়া অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা, মন্দোদরীর জীবনগাথা বিংশ শতাব্দীর ন্যায়চক্ষুর বিচারে স্থান কোথায় পাবে জানি না। কিন্তু সে বিচারের ভার আমার নয়। "দেবরাজকুতুহলাৎ" অহল্যা, স্বামী গৌতমের অনুপস্থিতিতে দেবরাজ ইন্দ্রের অনুগামিনী হবার পরও সেদিনের সমাজ সেই নারীকে প্রাতঃস্মরণীয়ার মর্য্যাদা দিয়েছিল। কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্র তাতে কিছু প্রভাবিত হয়েছিলেন কিনা তা অজ্ঞাত। আমি তো ইন্দ্রও নই, বরুণও নই। সুতরাং স্রোতের টানে আমাকে যাতে এলোমেলো না করে দেয়—তার জন্য আত্মরক্ষার ব্যবস্থা চাই বই কি।

সযত্নে আত্মসংবরণ করে উঠে আসনের দিকে এগিয়ে যেতেই মণিমালার মুখখানা বৃষ্টিধৌত শ্বেতপদ্মের মত ঝলমল করে উঠল।

আহার্য্যের পরিমাণ এত ছিল যে এত রাত্রে তা শেষ করতে না পারায় মণির অনুযোগ অগ্রাহ্য করে যখন উঠতে যাচ্ছি তখন সে বলল : আজ বড় অন্যায় করেছি। অমন সুখের বন্ধন থেকে তোমাকে ছিন্ন করে এনেছি।

আমি বললাম : তার জন্য দুঃখ কি? কাল আবার যুক্ত করে দিও।

: কিন্তু ও লোকটা কে?

ঐ বৃদ্ধ লোকটার কথা বলছ?

:বৃদ্ধ লোকটাব দিকে তাকিয়েও দেখিনি।

: তৃতীয় ব্যক্তিটি সম্বন্ধে কিছু জ্ঞাতব্য থাকলে গিয়ে জেনে এসো।

: তুমিই বল না।

: আমি জানলে তবে তো বলব।

: না জেনেই এত?

আমি মৃদু হেসে হাতমুখ ধোবার জন্য বাইরে যেতেই বিনয়বাবুর সঙ্গে দেখা। তিনিও একই কারণে বাইরে এসেছেন। বুঝলাম আমার জন্য এই ভদ্রলোকেরও দুর্গতির শেষ নেই। তাই অপরাধীর মত চুপ করে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তার কি উপায় আছে? আজকের এই দুর্য্যোগ, আমার নিরুদ্দেশ, মণিমালার উন্মত্ততা, সব কিছুর জন্য যেন তিনিই দায়ী—এই রূপ একটা অপরাধ বোধ মুখে প্রকাশ করে বললেন : আজ আপনার বড় কষ্ট হ'ল। আমি বললাম : দোষটা তো আমারই। তিনি বললেন, আকাশের দুর্য্যোগটা তো আপনি ডেকে আনেন নি? কিন্তু আমার হোল আর এক বিপদ। ঐ ঘনঘোর দুর্য্যোগের মধ্যে মণি যখন বেরিয়ে যায়, তখন না দিল আমাকে সঙ্গে যেতে, না দিল বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচবার জন্য কোন ছাতা বা বর্ষাতি। যে কথা বলতে যাই, একেবারে রেগে আগুন।

ভদ্রলোক কথা বলতে বলতে বারংবার মণিমালা যেখানে আছে, সেই দিকে দৃষ্টি দিচ্ছিলেন। অর্থ নেই, এসব আলোচনা কানে গেলে আবার কি পরিস্থিতি হয় কে জানে। ইঙ্গিতে আমাকে সেই কথা জানিয়ে তিনি নিজের ঘরে প্রবেশ করলেন। আমিও আমার ঘরে গিয়ে হতবাক।

আমার ভুক্তাবশিষ্ট মণিমালা পরম তৃপ্তিভরে খাচ্ছে। আমি বললাম : একি! তুমি আমার এঁটো খাচ্ছ?

: সাহিত্যে পড়েছি। এবার নিজে পরীক্ষা করে দেখলাম।

: কি দেখলে?

: সে কথা শুনে কাজ নেই। অহংকার বেড়ে যাবে। এমনিতেই মাটিতে পা পড়ে না।

: আমার অহঙ্কার?

: তা তুমি নিজে বুঝতে পারলে আর ভাবনা ছিল কি।

ততক্ষণে মণির খাওয়া শেষ হয়েছে। থালার মধ্যে পিঁপড়ের সংগ্রহ করবার মতও কিছু নেই। মনে মনে ভাবলাম বেচারার বোধহয় ক্ষিদে থেকেই গেল। আমি আগে জানলে আরও কম খেতাম।

সব কিছু তুলে নিয়ে সে যখন বাইরে যাচ্ছে তখন বললাম : আলো নিভিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে যাও। কিন্তু শেকল বন্ধ কোরো না।

: আলো থাক। আমি আসছি, ঘুমিও না।

: কিন্তু রাত তো প্রায় শেষ হয়ে এলো।

: আসুক। বলে বেরিয়ে গেল।

একটু পরে যখন ফিরে এলো, তখন অভিনব ব্যাপার। মণির অধরোষ্ঠ তাম্বুল রসে টুকটুকে। একটি পান হাতে নিয়ে আমার বিছানার পাশে বসে আমাকে তাম্বুল গ্রহণের আমন্ত্রণ জানাল। আমি হাতটা এগিয়ে দিতেই সে তাড়াতাড়ি আমাকে নিরস্ত করে

বাঁ হাতে আমার অবরোধ উন্মুক্ত করে ডান হাত দিয়ে পানটি মুখ বিবরে দিয়ে দিল।

এতক্ষণে তাম্বুলরস উদরস্থ করে মণিমালা বলল : জানলে মামা, কাল না, আমরা বানগঙ্গায় পিকনিক করতে যাব। যারা রাজগীরে আসে, সকলেই ওখানে পিকনিক করতে যায়।

আমি : বানগঙ্গা কোথায়?

: আহা! তুমি জান না বুঝি?

: জানলেও, তোমার মুখ থেকে শুনলে মিষ্টি লাগবে।

: অমন করে বোল না, মামা। শেষকালে বিপদে পড়বে। তখন আমায় দোষ দিও না।

: আচ্ছা বল।

: সেই যেখানে অর্জ্জুন বাণ মেরে পাতাল থেকে জল তুলেছিল—তার নাম বানগঙ্গা।

: সে তো কুরুক্ষেত্রে শরশয্যায় ভীষ্মকে জল পান করবার জন্য।

: এখানে ভীষ্মকে নয়, জরাসন্ধকে জল দেবার জন্য।

: সে কি কথা? যে লোকটাকে চৌদ্দদিন ধরে পিটিয়ে পিটিয়ে শেষকালে লম্বালম্বিভাবে দু' ভাগে দেহটাকে চিরে ফেলল, তাকে আবার এত ঘটা করে জল খাওয়ানো কেন? তাছাড়া ওদের সঙ্গে কি কুঁজো কলসী ছিল না। নিজেরা জল খেতো না? জলের জন্য পাতালে যেতে হল কেন?

: একি তোমার-আমার পিপাসা মামা, যে একগ্লাস জল কুঁজো থেকে কি কলসী থেকে ঢেলে দিলেই হবে। এরা হয়ত এক গণ্ডুষে এক সরোবর ধরে টান দেবে।

: সরোবর ধরে টান দেবে যদি, তবে তার মধ্যে কত জলজ লতাপাতা, শিং, মাগুর ইত্যাদি মাছও তো থাকতে পারে।

: তোমার যত সব অদ্ভুত কথা। সেখানে গেলে তোমার খুব

ভাল লাগবে। বানগঙ্গার ধারা আজও বয়ে চলেছে। তারই ওপরে নাকি গয়া যাবার সড়ক পথের পুল।

: কিন্তু আমার তো যাওয়া হবে না।

:ঠিক আছে। তুমি যেও না। কিন্তু তুমি মনেও ভেবো না যে "নিধুবনে" গিয়ে তুমি ঐ "আলুথালু"কে নিয়ে রঙ্গরস করবে। ওর মুখে আমি গোবর লেপে দিয়ে যাব। আর ঐ আরতিকেও আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব। তুমি শূন্য ময়দানে বসে বসে হৃষ্টমনে "হানিমুন" কোরো।

: একে রামে রক্ষে নেই, সুগ্রীব সহায়। এক আরতির যন্ত্রণায় তুমি অস্থির। তার মধ্যে কোথা থেকে এক "আলুথালু" এসে হাজির হল। কিন্তু এদিকে রাত তো প্রভাত হয়ে এলো। শুতে যাবে না?

: ভাবছি বাকী রাতটুকু আজ এই বিছানাতেই ঘুমোব। জায়গা হবে না?

: হবে।

: মূর্চ্ছা যাবে না তো?

: গেলে মাথায় জল ঢেলো আর পাখার বাতাস কোরো।

: ভয় নেই গো, ভয় নেই। এতটা পাগল হতে এখনও কিছু বাকী আছে। কিন্তু সত্যিই যদি তাই কোনদিন হই, তবে আমার গতি কি হবে, তা জানেন তোমাদের ভগবান।

এই বলে আমার চিবুকটি ধরে একটু নেড়ে দিয়ে একটি ভুবন-মোহিনী হাসিতে আমাকে অভিষিক্ত করে যখন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, তখন আলো নিবিয়ে দিয়ে প্রত্যুষের অপেক্ষায় বিছানায় চুপ করে শুয়ে থাকলাম।

প্রত্যুষের প্রথম কাক ডাকতেই আমি উঠে পড়লাম। সকালের জৈবক্রিয়াদি স্থগিত থাক। বাকী সকলে শয্যাত্যাগের পূর্বেই সকলের অজ্ঞাতে আমি গৃহত্যাগ করব। কাল রাত্রে মণিমালা বিনয়বাবুর ভূষণে আমাকে সাজিয়ে আমার পরিত্যক্ত খাদ্যাদি তৃপ্তিভরে গ্রহণ করে কোন অতৃপ্তি দূর করেছে কিনা জানি না। কিন্তু আমি আজ যে কোন দিকের একটা বাস ধরে দুর্গা বলে রওনা হবই।

টুকটাক জিনিস দুটো একটা যা একেবারে হাতের কাছে পাওয়া গেল, তাই স্যুটকেসে তুলে নিয়ে বিনয়বাবুর অসঙ্গত অঙ্গসজ্জা পরিত্যাগ করে, হোল্ডলটা কোনও প্রকারে গুটিয়ে নিয়ে, ডান হাতে মাল আর বাঁ হাতে পত্র তুলে নিয়ে দরজা খুলে যেমনই বেরিয়েছি, অমনি যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই রাত হয়। একেবারে সামনেই মণিমালা।

সে আলস্য পদসঞ্চারে স্নানাগারের দিকে যাচ্ছিল, এমন সময় বামাল গ্রেপ্তার। সে বলল : তুমি কোথায় চলেছ?

: আমি যাচ্ছি মণিমালা।

: তাতো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু কোথায়?

: সত্যি কথা বলতে কি, কোথায় তা ঠিক জানি না।

তার মানে হারা উদ্দেশ্যে? কিন্তু এত বৈরাগ্য কেন?

একবার ভাবলাম কোনও প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়ে নিজে কর্তব্যের পথে এগিয়ে যাব। দুপা এগুলামও। কিন্তু বিগত রজনীর সেই বৃষ্টিধৌত শ্বেতপদ্মের মত মুখখানার কথা মনে হতেই শেষবারের মত একবার দেখবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। [illegible]

দাঁড়ালাম। দেখি মণিমালা একেবারে আমার কাছে এসে পড়েছে। তার চোখেমুখে কোনও মিনতির চিহ্নমাত্র নেই। তার পরিবর্তে আছে একটা প্রখরতা।

বিগত রজনীর আলস্যজনিত শিথীল এবং স্বল্প বসনের দৈন্যতাকে কোনও ভাবে অঞ্চল প্রান্ত দিয়ে আবরিত করবার চেষ্টা করতে করতে সে বলল : মিনিটে মিনিটে যার মতি পরিবর্তন হয় তাকে পুরুষ মানুষ বলে নির্ভর করা শক্ত।

: আমি বললাম : পৌরুষ প্রকাশের বাহাদুরী কোনও দিন করি নি, আর নির্ভরতার প্রতিশ্রুতিও কোনও দিন দিই নি। আজ হঠাৎ এতখানি অভিযোগ করলে নিতান্তই অবিচার করা হবে। কিন্তু যেতে আমাকে হবেই, এবং তা এখনই। বললে তুমি রাজী হবে না। তাই এ প্রতারণার পথ বেছে নিয়েছি।

: প্রতারণার পথ বেছে নিয়েছ তুমি অনেক আগে। সে সব দিনক্ষণ হিসেবের আমার ধৈর্য্য নেই। কিন্তু তোমাকে আমি যেতে দেব না। বলে দু'পা এগিয়ে এসে আমার বাইরে যাবার পথ অবরোধ করে দাঁড়াল।

: জোর করে ধরে রাখবে নাকি ?

: হাঁ। আমার সর্বস্ব অপহরণকারী দস্যুকে জোর করে ধরে রাখবার সর্বৈব অধিকার আমার আছে।

: মিথ্যে অভিযোগ কোরো না। দস্যুবৃত্তি আমার পেশা নয়।

: তবে কি তস্করবৃত্তি। তুমি আমার যথাসর্বস্ব অপহরণ করেছ কেন ? সে দস্যুবৃত্তিই হোক, আর তস্করবৃত্তিই হোক। আমি যে সর্বহারার বেদনায় জর্জরিত।

: আমার অজ্ঞাতে কেউ যদি তার যথাসর্বস্ব আমার কাছে গচ্ছিত রেখে বলে, আমি অপহরণ করেছি, তবে সেটা সত্যি বলা হবে কি ?

: ইনিয়ে বিনিয়ে মিথ্যে বলে দোষ ঢাকবার চেষ্টা কোরো না।

ঠাকুর রামকৃষ্ণও এই পদ্ধতিকে বলেছেন, "ভাবের ঘরে চুরি"। দস্যু বললেও তোমাকে গৌরব দান করা হয়। তুমি চোর।

: আজ তুমি উত্তেজিত। আমি কোন কথা বলব না।

কথা বলবার তোমার কিছু নেই। তোমার মনে নেই—সেই কুচবিহারে "চোখের বালি" সিনেমা দেখে এসে বিনোদিনীর জীবন যন্ত্রণার কথা, ইনিয়ে বিনিয়ে কত করে বোঝালে?

: বিশ্বাস কর মণিমালা! সেদিন বিধবা বিনোদিনীর জীবন-যন্ত্রণা তোমার অন্তরে অবরুদ্ধ ছিল, একথা আমি কি করে বিশ্বাস করব?

: সেই জন্যই তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়েছে। তোমাদের বিধাতা-পুরুষ আমাকে বিধবার গৌরব দান করে তোমার বিশ্বাসের মর্যাদা রেখেছে।

: তুমি যা বলে আনন্দ পাও তাই বলো। কিন্তু আমার পথ ছেড়ে দাও মণিমালা।

: পথ আমি ছেড়ে দিলাম। কিন্তু আমি দেখতে চাই কোন মন্ত্রে তুমি আজ এখান থেকে বেরিয়ে যাও। বলে মণিমালা চলে গেল এবং আমি একটা কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে থাকলাম।

একটু পরেই মণি ফিরে এলো। তার হাতে একখানা চিঠি। লক্ষ্য করে দেখলাম, বহুদিন পূর্বে চিঠিখান আমি দার্জিলিং থেকে যোগানন্দবাবুকে লিখেছিলাম। আজ এতদিন পরে মণিমালা সেই চিঠি আদালতে হাজির করল—"এক্সিবিট্" হিসেবে। চিঠিতে কি আছে আমার মনে নেই। অনেকদিন আগের লেখা।

চিঠিখানা হাতে আসতেই একটু পড়লাম এবং তাতেই সমস্ত বিষয় আমার মনে পড়ল। কোচবিহার সবে ছেড়েছি। সেখানকার মদনমোহনের বাড়ী, নহবৎ এর সুর, সাগরদীঘি, বৈরাগী দীঘি ইত্যাদি সব কথাই বারবার মনে পড়ত। আর সব থেকে বেশী মনে হত মণিমালার কথা। কিন্তু মণি একজন পরস্ত্রী। যার মাধ্যমে

আমার মণির সঙ্গে পরিচয়, সেই কাবেরীবান্ধবের সঙ্গে পত্রালাপে মণির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার সূত্র পাওয়া যেত। কিন্তু কাবেরী কোথায় জীবন সংগ্রামে হারিয়ে গেল। শেষ পর্য্যন্ত একদিন যোগানন্দবাবুকে এক দীর্ঘ পত্র লিখলাম। তাতে মণিমালা সম্বন্ধে অনেক জিজ্ঞাসা। চিঠিখানা মণিমালার হাতে দিয়ে যোগানন্দবাবু নাকি বলেছিল—

: এই নাও তোমার নাগরের শব্দভেদী বান। আমি তো নিমিত্ত মাত্র।

: যোগানন্দবাবুকে চিঠি লিখে কি আমি অপরাধ করেছিলাম?

: নিজের বুকে হাত দিয়ে বলতো, যোগানন্দবাবুর জন্য কতখানি ব্যাকুলতা নিয়ে তুমি ঐ চিঠিখানি লিখেছিলে? পরস্ত্রীর কাছে চিঠি লিখবার অভিলাষ থাকাটা অন্যায় নয়। তবে অত ঢং করে ঝড় বৃষ্টির মধ্যে দৌড়ে বেরিয়ে পড়েছিলে কেন? আমি কি তোমাকে খেয়ে ফেলতাম?

: এখন আর হাজার বার চিঠিখানা ছিঁড়ে, পুড়িয়ে ফেললেও যখন যা লিখেছিলাম, তার স্মৃতি মুছে যাবে না, তখন সে কথায় আর বিড়ম্বনা ভোগ করে লাভ কি? তবে মিথ্যে বলব না, তোমার উদ্দেশ্যেই চিঠিখানা লিখেছিলাম।

: সে তো আমার জন্ম জন্মান্তরের পুণ্যফল। না হলে এতদিন যক্ষের ধনের মত আমি ওটাকে বুকে করে রাখব কেন?

: কিন্তু মণিমালা, সমাজ আছে, সংসার আছে। বিবেকের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম।

: ছাড়বে কেন? নিজের সুখসুবিধের জন্যে সময় বুঝে তোমরা সমাজ, সংসার, বিবেক সবই কাজে লাগাতে পার। তার জন্য যদি অন্য লোকের সর্বনাশ হয়, তোমরা পুরুষরা অসহায়।

: পুরুষ মানুষের নীতিশাস্ত্রের সংজ্ঞা তুমি ভালই স্থির করেছ।

: কেন করব না? যার মস্তকটি চিবিয়ে খেয়েছ, মস্তকশূন্য

সেই কবন্ধ যদি সুখসুবিধের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় তবে তোমাদের নীতিশাস্ত্রের পিনালকোডে ঐ কবন্ধের ফাঁসীর নির্দেশ থাকলেও মস্তকহীন স্কন্ধে ফাঁসীর দড়ি লাগাবার ব্যবস্থা নেই।

আমি বললাম : তুমি শান্ত হও মণি। আমার পিনাল কোড জানা নেই।

মণিমালা তখন উত্তেজনার চরমে উঠেছে। আমি অন্যদিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে তাকে শান্ত করবার চেষ্টা করছি। তাছাড়া পাশের ঘরে বিনয়বাবুর যদি ঘুম ভেঙ্গে থাকে তবে তিনি কি ভাবছেন কে জানে। আমি চুপ করেই আছি। কিন্তু মণিমালা কিছুতেই শান্ত হতে পারছে না। গৃহত্যাগের পরিকল্পনা আমার মাথায় উঠেছে। এখন মণিমালা শান্ত হলে বাঁচি। কিন্তু সে বলেই চলেছে : পিনালকোড জানা নেই, কিন্তু নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছ ভালই। তোমার নীতিশাস্ত্র বলেছে, পরস্ত্রীর দেহটা হরণ করতে নেই। কিন্তু একথাটা শেখ নি, মনটা হরণ করলে দেহের চৌদ্দপুরুষ হরণ হয়ে যায়।

এই কঠিন আঘাতে আমি মণিমালার দিকে তাকাতে গিয়ে দেখি, বসনের স্বল্পতা হেতু এবং উত্তেজনার জন্য অমনোযোগের সুযোগে, তার হেমকান্তির অনেকাংশ প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। দেখলাম, বিধাতাপুরুষ অকৃপণভাবে মণিমালার অঙ্গে অঙ্গে সুষমা ঢেলে দিয়েছেন। আমার অবাধ্য বিমুগ্ধ দৃষ্টির আঘাতে তার চৈতন্য ফিরে না আসা পর্যন্ত স্পন্দিত হৃদয়ের অন্তর্লোক থেকে ধ্বনিত হতে লাগল :

"তব স্তনহার হতে নভস্তলে খসি পড়ে তারা—
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষমাঝে চিত্ত আত্মহারা,
নাচে রক্তধারা।
দিগন্তে মেখলা তব টুটে আচম্বিতে
অয়ি অসম্বৃতে।"

আত্মহারা চিত্তে বক্ষমাঝে নৃত্যরত রক্তধারা নিয়ে, চেয়ে দেখলাম আচম্বিতে অসহৃতা মণিমালা, অপহৃতা হয়েছে।

বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি পূর্বগগনে মেঘজাল ছিন্ন করে, উদয়ভানুর বর্ণাঢ্য সমারোহ।

আমি প্রণাম করে বললাম : ওগো আদিত্যদেব, তোমার স্বর্ণকিরণে মণিমালার অন্তর-তমসা অপসারণ কর। তারপর আমার পরিণামের বোঝা বয়ে বেড়াবার জন্য, থাকলাম আমি আর আমার অদৃষ্টদেবতা।

ভগবান আদিত্য-দেবের কাছে মণিমালার জন্য মঙ্গল কামনা করে দেহভরা ক্লান্তি এবং মনভরা অবসাদ নিয়ে শয্যায় আশ্রয় নিয়েছিলাম। নিদ্রাদেবীর আশীর্বাদও ভাগ্যে জুটেছিল, কিন্তু ক্ষণিকের। ঘুম যখন ভাঙ্গল তখন দেখি মেঘমুক্ত আকাশের নীচে স্বর্ণোজ্জ্বল কিরণছটায় ঘরে বাইরে সব কিছু হাস্যময় হয়ে উঠেছে। দেহের ক্লান্তি এবং মনের অবসাদ অনেকাংশে অপসারিত হয়েছে।

আমার ঘরের দরজা বন্ধ। গৃহকোণে দেখি, মণিমালা দেয়ালের দিকে মুখ করে, আমার দিকে পেছন দিয়ে, আমার স্যুটকেসটি খুলে দেবার্চনার ভঙ্গীতে বসে কি যেন নিবিষ্টমনে দেখছে। ভাবলাম, কাল বিনয়বাবুর পোষাকে আমাকে সাজিয়ে নয়নভরে কি দেখেছে কে জানে। আজ হয়ত আমার পরিচ্ছদে বিনয়বাবুকে সাজাবে, তাই পোষাক নির্বাচনের পালা চলেছে। আবার ভাবলাম, আরতির কোনও সম্ভাব্য চিহ্ন হয়ত আমার সংগ্রহশালায় অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছে। মিসেস "আলুথালু"র কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছে কিনা কে জানে। হয়তো কোনও ফটো, নয়তো কোন চিঠি। রহস্যলোকের অদৃশ্য অপদেবতার তাড়নায় বেচারা বিব্রত হয়েছে।

কৌতূহল বশে শয্যায় উঠে বসলাম। যে দৃশ্য দেখলাম, তাতে আমার অন্তর আনন্দে পরিপূর্ণ হ'ল। মণিমালার দ্রষ্টব্য বস্তু একটি ছবিই বটে। সে যুক্ত করে সেই ছবিকে প্রণতি জানাল। কুরুক্ষেত্র সমরাঙ্গনে যুদ্ধারম্ভের পূর্বক্ষণে বিষাদক্লিষ্ট অর্জ্জুন গাণ্ডীব ত্যাগ করে নতমস্তকে অবস্থিত, আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সারথির আসনে বসে বাঁ হাতে অশ্বের বল্গা ধরে, অন্যহাত অর্জ্জুনের দিকে প্রসারিত করে ভুবনমোহন হাসিতে মুখখানা উদ্ভাসিত করে বসে আছেন—এই হল

ছবি। নীচে লেখা আছে :

"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ। নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে
ক্ষুদ্রং হৃদয় দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥"

এই ছবির সামনে মণিমালাকে যুক্তকর দেখে ভাবলাম আদিত্য-দেবের কাছে আমার প্রার্থনা নিষ্ফল হয় নি। আমি তাড়াতাড়ি পুনরায় শুয়ে পড়লাম—কারণ তদবস্থায় আমাকে দেখলে মণি হয়ত নিজেকে বিব্রত বোধ করতে পারে। মণি আস্তে সুটকেসের ঢাকনা বন্ধ করে জানালার সামনে এসে দাঁড়াল। আজ তার অভিনব বেশ। বৈধব্যের সামাজিক অনুশাসনকে উপেক্ষা করে সে মাঝে মাঝে পরিচ্ছদের বৈচিত্র্য উপভোগ করে। আজও সেই ব্যতিক্রম। একটি লাল পাড় গরদের শাড়ী পড়েছে। পিঠের ওপরে সদ্যস্নাত সিক্ত কেশরাশি। আঁচলটি ঠাকুর প্রণামের ভঙ্গীতে গলায় দেওয়া। গবাক্ষপথে স্বর্ণরশ্মি এসে মুখের ওপর পড়েছে। অনেক রূপে আমি মণিমালাকে রূপবতী দেখেছি। কিন্তু এ যেন শুচিস্নিগ্ধে অপরূপা। আজই প্রত্যুষে অপ্রসন্না মণিমালার অঙ্গে অঙ্গে আমি রূপের তরঙ্গ দেখেছি। মনে হল :

রাতে প্রেয়সীর রূপ ধরি
তুমি এসেছ প্রাণেশ্বরী,
প্রাতে কখন দেবীর বেশে
তুমি সমুখে উদিলে হেসে—
আমি সম্ভ্রমভরে রয়েছি দাঁড়ায়ে দূরে অবনত শিরে
আজি নির্মল বায় শান্ত উষায় নির্জন নদীতীরে ॥"

নির্জন নদীতীরের পরিবর্তে গৃহকোণে শয্যায় উঠে বসে অপ্রত্যাশিত আনন্দে আমি হঠাৎ বলে ফেললাম, "সুপ্রভাত, মালা"।

মণিমালা অসংবৃত বস্ত্রাদি সংযত করে তাড়াতাড়ি কাছে এসে বলল : তোমার ঘুম ভেঙ্গে যায়—এই ভয়ে আমি একটি শব্দ

পর্যন্ত করি নি, তবুও তোমার ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম।

: সংসারে এরূপ গর্হিত পাপকার্য্য মাঝে মাঝে হয়ে থাকে। "নিমাই সন্ন্যাস" গ্রন্থে এর প্রায়শ্চিত্ত বিধিও আছে শুনেছি। তবে তার প্রয়োজন হবে না। আজ যা পেয়েছি, সেই প্রাপ্তির আনন্দে তোমার সকল অপরাধ ক্ষমা করলাম।

: কী সে আনন্দ মামা?

: তা বলব না।

দৃষ্টি আনত করে মণিমালা নিজের দেহটা একবার দেখে নিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার মুখখানা রক্তাভ হল। বুকের ওপর আঁচলটি একটু টেনে দিয়ে বলল : ঘুম যখন ভেঙেছে, তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও। ওরা এক্ষুণি সব এসে পড়বে।

: কারা এসে পড়বে?

: কাল বললাম না, আজ বানগঙ্গায় পিকনিক?

: কে কে যাবে?

: সেই প্রশ্নট আগে। ভয় নেই গো, ভয় নেই। আরতিও যাচ্ছে।

: আর "আলুথালু"? এবারে মণি হেসে বিছানায় গড়িয়ে পড়ল। তখনই বাইরে কলকণ্ঠে বোঝা গেল শ্যামসুন্দরবাবু সপরিবারে এসে পড়েছেন। মণি তাড়াতাড়ি আমার হাত দুখানি ধরে টেনে বলল : দশ মিনিট সময় দিলাম।

আমি সঙ্গে সঙ্গে স্নানাগারে প্রবেশ করলাম।

আমরা যখন টাঙ্গায় বানগঙ্গার দিকে রওনা হচ্ছি, তখন জানতে পারলাম মণিমালা পরে খাদ্যাদির ব্যবস্থা নিয়ে যাবে। অনিচ্ছায় হোক, ইচ্ছায় হোক বসবার বন্দোবস্তে দেখতে পেলাম, আরতি আমার বাঁ দিকে এসে বসেছে। মণিমালাকে একটু একান্তে পেয়ে বললাম : পরে তো যাবে, কিন্তু এদিকে বসবার বন্দোবস্ত দেখেছ তো?

মণিমালা হেসে বলল : চেষ্টায় কি না হয়। তোমার অধ্যবসায় ফলবতী হয়েছে।

আমি বললাম : তুমি তো পরে যাবে জানলাম। সব ব্যবস্থা করে নিয়ে যেও।

: আচ্ছা, মাষ্টারী করতে হবে না।

মাষ্টারী না হয় না করলাম। কিন্তু কিছু বলদের গোবর নিতে ভুলো না।

: গোবর দিয়ে কি হবে?

: যাবার সময় মিসেস "আলুথালু"র মুখে মাখিয়ে দিয়ে যাবে না?

দু' জনের একান্ত হাসির মধ্যে টাঙ্গা ছেড়ে দিল। শ্যামসুন্দরবাবু শকুন্তলা দিদি এবং আরতি সহ আমি বানগঙ্গার দিকে এগিয়ে চললাম। বিনয়বাবুর কি একটু কাজ আছে, সেটা শেষ করে কিছু পরে যাবেন। আর মণিমালা যাবে সবার পরে সব ব্যবস্থা শেষ করে।

টাঙ্গাওয়ালা পরিচিত দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, ষ্টেশন থেকে আসবার সময় ঘোড়া যেমন অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিল, আজ তেমন না করে সুন্দর চলেছে কিসের প্রলোভনে। উত্তরে জানলাম যাত্রীর চরিত্রের সঙ্গে নাকি ঘোড়ার চলার যোগসূত্র আছে। যাত্রীর চরিত্র বিশ্লেষণে ঘোড়ার কর্মে আসক্তির কথা শুনে মনে মনে হেসে বললাম : সেদিনও তো আমি ছিলাম। তার উত্তরে চালক যে কাহিনী বলল তা বেশ সুন্দর। যে পরোপকারী ভদ্রলোকের বদান্যতায় আমরা সেদিন ষ্টেশনের বৈতরণী পার হয়েছিলাম, সে ভদ্রলোকের যাত্রাটা সেদিন নিখরচায় হয়েছিল তো বটেই, কিন্তু কমিশনও প্রাপ্তি হয়েছিল।

টাঙ্গাওয়ালা প্রদত্ত সেই শুভানুধ্যায়ী ভদ্রলোকের পরবর্তী ইতিহাস আরও চমকপ্রদ। ঘটনাটি ঘটেছে আজ সকালে। সেই

ভদ্রলোক, একটি মেয়ে এবং সামান্য মালপত্র নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল। এই টাঙ্গাওয়ালা তাদেরকে বাসস্ট্যাণ্ডে নিয়ে গেল। ভদ্রলোক একটু ঘুরে এসে বাসের দেরী আছে বলে টাঙ্গাওয়ালাকে কুড়িটি টাকা দিয়ে নিকটস্থ দোকান থেকে এক কিলো ঘি নিয়ে আসতে বলল এবং মেয়েটি ঐ টাঙ্গাতেই বসে থাকল। অত সকালে ঘিয়ের দোকান বন্ধ থাকায় তারা ফিরে এসে দেখে, বাস চলে গেছে এবং ভদ্রই হোক আর অভদ্রই হোক, লোকটি উধাও। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাকে পাওয়া গেল না। মেয়েটির কাছ থেকে টাঙ্গাওয়ালা জানতে পারল, ঐ লোকটি যে হোটেলে থাকত, তারই পাশের বাড়ীর ঐ মেয়েটিকে বিবাহিত জীবনের প্রলোভন দেখিয়ে তারই মাধ্যমে বেশ কিছু গয়না এবং টাকাপয়সা হস্তগত করে মাত্র কুড়িটি টাকার বিনিময়ে সরে পড়েছে।

শকুন্তলাদি ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন মেয়েটির কি গতি হল। টাঙ্গাওয়ালার উত্তরে জানা গেল নগদ পাওয়া কুড়িটি টাকার সঙ্গে আরও ত্রিশটি টাকা যোগ করে সে ঐ মেয়েটিকে নিয়ে তার বাড়ীর সামনে নামিয়ে দিয়ে এসেছে। পরের ইতিহাস অজ্ঞাত।

আমার ভয় শকুন্তলাদি এখনই মেয়েটির পরিণতির কথা জানতে যদি সেই দিকে অগ্রসর হতে চান, তবেই বিপদ। কিন্তু তার দরকার হ'ল না। দিদি উর্দ্ধ নয়নে কি ভাবতে লাগলেন। শ্যামসুন্দরবাবু বললেন: আমার গ্রন্থ "গলগণ্ডগড্ডালিকা"য় এই কাহিনীটি গ্রহণ করতে হবে।

আমি বললাম : আপনি কি কোন গ্রন্থ রচনা করছেন?

: গ্রন্থ রচনা শেষ।

: ছাপা হয়েছে?

: না।

: লেখা শেষ হয়েছে?

: এখনও আরম্ভ করে উঠতে পারিনি। তবে মনে মনে রচনা শেষ করে ফেলেছি।

: সে গ্রন্থের বিষয়বস্তু কি ?

: সে বৃহৎ গ্রন্থের বিষয়বস্তু বহুমুখি। আলাভোলা বাবাজির ভক্ত ভবদুলালবাবুর "চলচিত্তচঞ্চরী"র আদর্শে আমার মনে মনে সমাপ্ত এই গ্রন্থের জন্য আমি চতুর্দিক থেকে এত আদেশ (অর্ডার) পাচ্ছি যে ছাপাখানা রাজী হচ্ছে না।

কিন্তু এদিকে আমরা বানগঙ্গায় এসে গেছি। আমরা নেমে পড়লাম এবং যথাসময়ে আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে টাঙ্গাওয়ালা বিদায় নিল।

মণিমালার শোনা কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য ' এর আগে রাজগীর এসে আমি বানগঙ্গা দেখেছি, কিন্তু মনে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করেনি। সেদিন নিঃসঙ্গ আমার সামনে লজ্জাবতী বানগঙ্গা, তার রূপলহরী, অবগুণ্ঠনে আবৃতা রেখেছিল। আজ সময় এবং পরিবেশ ভেদে সে অবগুণ্ঠন খুলে ফেলে নিজেকে যেন একেবারে অনাবৃত করে ফেলেছে। সোনাগিরি থেকে একটি ছোট নদী নেমে এসেছে। এই নদীর ওপর দিয়ে সেতু পথ। সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে আমরা ক'জন। নেই শুধু মণিমালা। আরতি এগিয়ে এসে বলল : জায়গাটা কী সুন্দর মামা !

দেশব্যাপী যদি আমার অজ্ঞাত ভগিনী-কুল থাকে, আনন্দের কথা। কিন্তু তাদের সন্ততিকুল আমাকে "মাতুল" সম্বোধন করলে, আমি পরিণামের চিন্তা করি। কোথায় আমার দিদি, কোথায় আমার কে ? কাবেরীবান্ধব একদিন আমাকে ডেকে নিয়ে যেয়ে মণিমালাকে "মামা" বলে ডাকবার অধিকার দিয়ে এলো। কোথায় গেল কাবেরী। আমি পাকাপাকি মামা হয়ে গেলাম। কিন্তু "মামা" বলে ডাকবার অমূলক অর্জিত অধিকার, আজ যদি অনধিকারের দিকে আমাকে হাত ধরে নিয়ে যায়, তবে হাত ছাড়িয়ে নেবার শক্তিও তো দিন দিন কমে যাচ্ছে। মণিমালা আরতির দিদিমণি এবং আমি মণির মামা। আরতির মাও আমার শকুন্তলা

দিদি। সুতরাং আরতির অধিকার প্রত্যাখ্যান করবার কোন উপায় নেই। তারপর "মামা" ডাকটির মধ্যেও একটা মাধুর্য্য অনুভব করেছি। আরতি বলতে লাগল : এই ছোট নদীটিরই নাম "বানগঙ্গা"। এই রাস্তার একদিকে গয়া, অন্যদিকে পাটনা। মধ্যপথে রাজগীর।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম নদীটির নাম বানগঙ্গা কেন হল? উত্তরে সে জানাল, চৌদ্দদিন ক্রমাগত যুদ্ধের পরিণামে জরাসন্ধ ধরাশায়ী হয়েই জল চাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আদেশ করলেন জল সংগ্রহ করতে। অর্জুন বেচারা কোথায় জল খুঁজতে যাবেন? মেরে দিলেন এক তীর পাতালের দিকে।

আমি : পৌরাণিক যুগের টিউবওয়েল আর কি।

শ্যামসুন্দরবাবু : চৌদ্দদিন ধরে গদা দিয়ে, লাথি দিয়ে, ঘুষি মেরে, কাতুকুতু দিয়েছিল কিনা জানি না, যে শত্রুকে ধরাশায়ী করা হল, তাকে খাওয়াবার জন্য পাতাল থেকে জল আনবার ঘটা কেন— তা বুঝি না বাপু।

শকুন্তলা দেবী বললেন : আমি আগেই বলেছি, এমন ক্ষ্যাপা লোককে নিয়ে কোথাও বেরোতে নেই।

: আমি ক্ষ্যাপা লোক! সরকার কোটি কোটি টাকা কারবার করতে দিয়েছে একটা ক্ষ্যাপা লোককে?

এই সব কথা শুনতে শুনতে আমার দৃষ্টি দূরে প্রসারিত হল এবং স্থানটির অপরূপ প্রাকৃতিক শোভা দেখে মুগ্ধ হলাম। দুদিক থেকে সোনাগিরি এবং উদয়গিরি ক্রমে নেমে এসে উপত্যকার কোলে মিশেছে। যেদিকে তাকানো যায় এখানে আর উষর মৃত্তিকার চিহ্নমাত্র নেই। পাহাড়ের ক্রমাগত নীচু হয়ে আসা গায়ে গায়ে তরঙ্গের পর তরঙ্গ সবুজের অভিযান। দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে সর্পিল গতিতে গিরিপথ চলেছে। পায়ের নীচে বানগঙ্গার স্বচ্ছ শীর্ণ জলধারা।

আমি আরতিকে প্রশ্ন করলাম : জরাসন্ধের মল্লস্থান বলে কথিত স্থানটি সেই কোথায় বৈভার পাহাড়ে তবে তাকে মুখে জল দেবার জন্য এতদূর নিয়ে আসা হল কেন ?

আরতি : একটা মতবাদ এই, জরাসন্ধ ও ভীমের মল্লস্থান এই বানগঙ্গার কাছেই ছিল। সেখানে রথচক্রের চিহ্নও আছে। সে স্থানটি কাছেই। বলে অদূরে একটি জায়গা দেখিয়ে দিল।

শ্যামসুন্দরবাবু বললেন : শাস্ত্রের কথা অমান্য করতে নেই। সব ঘটনা বিচার করে আমরা এই বলতে পারি, জরাসন্ধের দেহটা দুভাগ করে অর্ধেকটা ওখানে "মাগো-মাগো" বলছিল আর অর্ধেকটা এখানে "জল জল" বলে চিৎকার করছিল।

আমি : কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিরচিত মহাভারতে কিন্তু মৃত্যু সময়ে জরাসন্ধের জলভিক্ষার কোন সুযোগের কথা নেই।

শ্যাম : মৃত্যু সময়ে পিপাসার্ত হবে—এটা কি সুযোগ নাকি ?

আমি : সুযোগ অর্থে আমি বলছি, জরাসন্ধকে ভূপাতিত করেই অরিন্দম কৃষ্ণ, অর্জুন ও ভীমসেনসহ স্থান ত্যাগ করেন।

শ্যাম : আমি ভবানীপুরের কণ্বমুনির আশ্রমে থাকাকালে মহাভারতের মিক্সচার পান করেছি। তার সভাপর্বে জরাসন্ধ হত্যার যা বিবরণ তা লোমহর্ষক। মহাবল ভীমসেন জরাসন্ধকে উৎক্ষিপ্ত করে একশ বার ঘুরিয়ে জানুদ্বারা পৃষ্ঠদেশ ভেঙ্গে ফেলেন। তারপর দুটি পা ধরে দ্বিধাবিভক্ত করলেন। একদিকে ভীমসেনের বল-প্রয়োগের চিৎকার, অন্যদিকে জরাসন্ধের যন্ত্রণার চিৎকার। এই সব হট্টগোলে নানাপ্রকার দুর্ঘটনার মধ্যে একটি হল, অসংখ্য নারীর অসময়ে যা ঘটল, তা ইদানীং কালে ঘটলে স্পেশাল মেটারনিটি হোম খুলতে হোত। সুতরাং এই সব ব্যাপারের মাঝখানে জলপানের মত বিলাসিতার সুযোগ ছিল বলে মনে হয় না।

দিদি : আবার তুমি আবোল-তাবোল বকছ ?

শ্যাম : আশ্রম-দুহিতা হয়ে মহাভারতের কাহিনীকে তুমি যদি

আবোল-তাবোল বলে, তবে চুপ করলাম।

প্রসঙ্গ পরিবর্তনের জন্য আরতি সকলের দৃষ্টি একটা বিশালকায় প্রাচীরের প্রতি আকর্ষণ করল। রাজপথের দুপাশে পাহাড়ের গা বেয়ে বিরাট আকারের দুটি প্রাচীর পাহাড়ের ওপর দিকে উঠে গেছে। আমরা সকলে সেই প্রাচীরের দিকে এগিয়ে চললাম। যেতে যেতে হঠাৎ বিনয়বাবুর কথা মনে হল। একটু পরেই তার রওনা হবার কথা ছিল। তিনি এলেন কিনা কে জানে। এদিক-ওদিকে তাকাতেই দেখি বিনয়বাবু ছোট একটি পাহাড়ের ওপরে একটি মঞ্চে বসে আছেন।

আমি দল ছেড়ে আস্তে আস্তে বিনয়বাবুর কাছে উঠে যেয়ে বললাম : আপনি বসবার স্থানটি নির্বাচন করেছেন ভাল।

তিনি বললেন : বিহার সরকারের বনবিভাগ ভ্রমণবিলাসীদের জন্য এটা তৈরী করেছে।

: চারিদিকের এই মনোরম পরিবেশের মধ্যে আপনার সঙ্গসুখ লাভ করতে এলাম।

: আমার সৌভাগ্য! কিন্তু আমি শিশি বোতলের কারবার করি। প্রকৃতির শোভা আমার কাছে আবৃতই থেকে গেল!

: শিশি বোতলের কারবারীর কাছে আনন্দলোকের দুয়ার রুদ্ধ একথা বলতে পারি না।

বিনয়বাবু বললেন : সে কথা হয়ত ঠিক। "আনন্দধারা বহিছে ভুবনে!" আনন্দলোক থেকে উৎসারিত সেই চির প্রবাহমান ধারা, নিজ নিজ সাধ্যমত লোকে অঞ্জলি ভরে তুলে নেয়। আবার ভাগ্যহীন কতজন আকণ্ঠ-পিপাসা নিয়ে, সেই শাশ্বতী প্রবাহমানার তীরে দাঁড়িয়ে ছটফট করে।

ভাবলাম অজ্ঞাতে বিনয়বাবুকে হয়ত আঘাত করেছি। প্রসঙ্গ পরিবর্তনের কথা ভাবছি। এরই মধ্যে বিনয়বাবুকে পুনরায় বললেন—

: ক্ষুধিতের অনভ্যস্ত হাতে কাঁটা-ছুরি তুলে দিলে, যতই তাকে লোভনীয় ভোজ্যবস্তু পরিবেশন করুন না কেন, যন্ত্র-চালনার অনভ্যাসের জড়তা তার ক্ষুন্নিবৃত্তির অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। অন্যদিকে ডাষ্টবিনের কদর্য্য আবর্জনার দ্বারা খিদে মেটাবার ঘটনা তো রোজই দেখছেন।

বিনয়বাবু বৈজ্ঞানিক। শিশি বোতলের কারবারী. কুণ্ডের জল নাড়াচাড়া করেন—এটা বেশ ভালই বুঝলাম। কিন্তু কোথায় বিনয়বাবুর মনোরাজ্যের প্রবাহিত আনন্দধারা, কে সেই ভাগ্যবান, যিনি অঞ্জলীপুরে ধারাপ্রবাহ তুলে নিয়ে পান করে তৃপ্ত হচ্ছেন, আর কেই বা তাপিত, তৃষিত হৃদয়ে তীরে দাঁড়িয়ে আকণ্ঠ পিপাসার তাড়নায় অস্থির হয়েছে, আর কেই বা লোভনীয় ভোজ্য বস্তুর প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও অনভ্যাসের জড়তায় পেটের খিদেতে কাতর হচ্ছে—এসব রহস্য উদ্ঘাটন করা আমার অসাধ্য। আমার প্রয়োজনই বা কি? প্রবাসের সঙ্গী বিনয়বাবু দুদিন পরে কোথায় চলে যাবেন। মণিমালা তার জীবনে অঞ্জলিভরে অমৃত তুলে দিয়েছে অথবা কাঁটা-চামচ তুলে দিয়েছে—তা নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই।

আমি বললাম : এই যে ক্ষীণ জলধারা, এরই নাম বানগঙ্গা।

তিনি বললেন : আমি পুরাণ ইতিহাস জানি না তবে শুনেছি সেই কোন অতীতে যোগীশ্বরের রাগিণী সংযোজনায় মোহিত বিষ্ণুর নিম্নাঙ্গ বিগলিত হয়ে পুণ্য ভাগিরথীর জন্ম হয়েছিল। কার অঙ্গ ক্ষরিত হয়ে এই গঙ্গার জন্ম হয়েছিল কে জানে।

শোনা যায় মধ্যম পাণ্ডব জরাসন্ধকে ধরাশায়ী করলে, মুমূর্ষুকে জলদানের জন্য এই গঙ্গার উৎপত্তি।

: শোনা যায়? কেউ দেখেনি?

: এই ঘটনা কেউ দেখেছে—এমন কথা কি করে বলা যাবে?

: শোনা কথা সব সময় সত্যি হয় না। অনেকে শুনেছে,

বিনয়বাবু স্বামী সোহাগিনী মণিমালাকে অপহরণ করেছে। কিন্তু কথাটা মিথ্যে।

সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন আমাকে কেন্দ্র করে পরিক্রমা করতে লাগল। আমি আমার আসনটি শক্ত করে ধরে থাকলাম, যেন ঘূর্ণায়মান জগৎসংসারের ভূমিতলে লুণ্ঠিত না হয়ে পড়ি। আমার ভাব ব্যতিক্রম লক্ষ্য না করে বিনয়বাবু বলে চলেছেন : আপনিই বলেছেন, জরাসন্ধ মহাবীর। আমিও জানি তার পরাক্রমে কৃষ্ণ-বলরাম মথুরা ছেড়ে দ্বারকায় চলে গিয়েছিলেন। এ হেন পরাক্রম-শালী একজন রাজা, প্রতিপক্ষের হাতে পরাজিত হয়ে অবধারিত মৃত্যুর পূর্বক্ষণে, জলভিক্ষা করেছিল—এটা বিশ্বাস হয় না। ও রকম সময়ে পিপাসার জল তো তার কাছে বিলাসিতা।

এতক্ষণে আমার পরিক্রমা শেষ হয়েছে। বললাম : আপনার চিন্তা ধারায় মৌলিকতা আছে।

[এগার]

যে টিলাটির মাথায় মঞ্চের ওপরে আমি আব বিনয়বাবু বসে কথা বলছিলাম, কলরব করতে করতে সেখানে হাজির হল প্রথমে আরতি, তারপরে শ্যামসুন্দরবাবু এবং সকলেব পেছনে শকুন্তলাদি। পশ্চাৎবর্তিনীর মুখ বেশ গম্ভীর।

সামান্য একটু চড়াইএর পথে উঠে আমার জরিমানা স্বরূপ জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে নিতে শ্যামসুন্দরবাবু গম্ভীরভাবে বললেন—

: স্যার, আজ একটা ভাল জিনিষ মিস্ করলেন। আমরা দেখে এলাম।

আমি এবং বিনয়বাবু প্রশ্নের দৃষ্টিতে তাকাতেই তিনি বললেন
: সাইকেল পিওনদের প্রাচীর দেখে এলাম।

আমরা সত্যি বিস্মিত হ'লাম। নানারকমের প্রাচীর দেখেছি। লালকেল্লার প্রাচীর দেখেছি। চীনের প্রাচীরের কথাও শুনেছি। ম্যাজিনো লাইন, সিগফ্রিড্ লাইনের কথা তো ছেড়েই দিলাম। কিন্তু "সাইকেল পিওন" প্রাচীর প্রকৃতই অভিনব। আমরা ব্যাপারটা জানতে চাওয়ায় শ্যামসুন্দরবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন—

: আপনি তো চলে এলেন। আমরা উঠছি। আরতি আগে, আমি মাঝখানে, আপনাদের পূজনীয়া দিদি পেছনে, আমার প্যান্টালুনটা ধরে উঠে আসছেন।

দিদি গম্ভীরভাবে বললেন : আমি কারও প্যাণ্ট ধরি নি।

: না হয় কড়ে আঙ্গুলটা ধরেছ।

: তাও না।

: তা হলে আমার ছায়াটা ধরে উঠে আসছিলে।

: ছায়া আবার ধরা যায় নাকি।

: ছায়া ধরা যায় না? সুকুমার বাবুর "ছায়াবাজি"তে পড়নি, "ছায়ার সাথে কুস্তি করে গাত্রে হ'ল ব্যথা।" পড়ে দেখো, তাহলে আর ছায়াকে সাধারণ জিনিষ মনে হবে না।

: তুমি ছায়ার সঙ্গে কুস্তি কর গিয়ে।

: রাগ করছ কেন! এতো আমার ছায়া। অন্য লোকের ছায়া হলে কি আমি এত লোকের সামনে বলতাম।

দিদি গম্ভীর হয়ে বসে থাকলেন। শ্যামসুন্দরবাবু পুনরায় আরম্ভ করলেন : এই ভাবে আমরা তিনজনে উঠে গেলাম, ঐযে দেখতে পাচ্ছেন বিশাল প্রাচীর, ওদিকে সোনাগিরির গা বেয়ে উঠেছে, আর এদিকে উদয়গিরির ওপরে—ওর কাছে। আমি তো ওয়ালের বিশালত্ব দেখে হতবাক। জিজ্ঞাসা করলাম, ওটা কিসের ওয়াল? আপনার দিদি বললেন, ওটা "সাইকেল পিওন-ওয়াল।"

দিদি বললেন : নিজেরা যত খুসী পাগলামী কর, কিন্তু আমাকে জুড়িও না।

শ্যাম : সে কি কথা! তোমাকে জড়াব না, তবে কি জড়িয়ে ধরবার জন্য প্রতিবেশীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করব?

আরতি একটু দূরে ছিল। আমরা হেসে উঠলাম। দিদি পর্যন্ত হাসি গোপন করতে পারলেন না। হাসির শব্দে আরতি কাছে এলে আমি ঐ "ওয়াল" সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় সে যা বলল, তার অর্থ এই, কেবল এত বড় বড় পাথর সাজিয়ে এই যে প্রাচীর তৈরী হয়েছিল, এটা সেই প্রাচীন যুগের নির্মাণ কলার এক অপূর্ব নিদর্শন। এক একটি পাথরের চেহারা বিশাল। লম্বায় তিন ফুট থেকে পাঁচ ফুট পর্যান্ত। তখনও ক্রেন ছিল না কিংবা বড় বড় ট্রাকও ছিল না। বিশাল বিশাল পাথরকে ছেঁটে প্রয়োজন মত করে একটির ওপর একটি সাজিয়ে এই যে প্রাচীর তৈরী হয়েছে, এটা মানুষের দৈহিক শক্তির দ্বারা সম্ভব হয়েছে, এরূপ বিশ্বাস হয় না। তাই কল্পনা করা

হয়েছে এই বিরাট কর্মযজ্ঞ দৈত্যদের দ্বারা সম্ভব। গ্রীস দেশের রূপকথায় একরকম দৈত্যের উল্লেখ আছে—তাদের বলা হোত, "সাইক্লোপ"। সেই সাইক্লোপ থেকে এই নির্মাণ কৌশলকে বলা হয় "সাইক্লোপিয়ান ওয়ার্ক"।

আমি : এই প্রাচীর কার সময়ে নির্মিত হয়েছিল?

আরতি : প্রচলিত বিশ্বাস—জরাসন্ধের রাজত্বকালে।

শ্যাম : আহা! বেচারীকে অনেক কুকার্যের নায়ক তৈরী করা হয়েছে। প্রাচীর নির্মাণের গৌরবটা দিয়ে কিছুটা কলঙ্ক মোচন করা হয়েছে। তাছাড়া দৈত্য-দানোর কারবার তার হয়ত ছিল।

আরতি : ঐ সাইক্লোপরা নাকি থাকত সিসিলি দ্বীপে। তাদের নাকি একটি করে চোখ ছিল। তাও কপালের ওপরে।

শ্যাম : তবে তো একটা সত্য এর থেকে প্রতিষ্ঠিত হ'ল।

আমি : সে সত্যটা কী?

শ্যাম : আপনারা ঐ কার্ল মার্কস্ লেনিন, স্ট্যালিন আর মাও সেতুং এর যত জয়গানই করুন মশাই, সমাজতন্ত্রের মূল কথা ঐ গ্রীস দেশেই প্রথম উদ্ভাসিত হয়েছিল।

কথাটা পরিষ্কার করবার অনুরোধ করতেই তিনি আরম্ভ করলেন : বিশ্বে কত লোক আছে—যাদের একটিও চোখ নেই। এমতাবস্থায় দুটি দুটি করে চোখ নিয়ে ঘুরে বেড়ানো পুঁজিবাদের পুতিগন্ধে ভরা। 'হ্যাভস্' আর হ্যাভনটস্'দের শ্রেণী বিন্যাস লোপ করবার জন্য সিসিল দ্বীপের দৈত্যদের একটি করে চোখ দিয়ে পরীক্ষামূলক পরিকল্পনার গৌরব ঐ গ্রীসবাসীদের প্রাপ্য।

শকুন্তলাদি বললেন : গ্রীসে এক চোখের পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হলেও, ধারাটা বজায় রেখেছ তুমি।

শিশি বোতল নাড়াচাড়ার মধ্যেও বিনয়বাবুর রসবোধ নষ্ট হয় নি। তিনিও একটা মূল্যবান কথা বললেন : দুটোর জায়গায়

একটিমাত্র চোখের দ্বারা কাজ মিটিয়ে নেবার জন্য গ্রীস দেশের দেব-সমাজের রিসার্ভ ব্যাঙ্কে ব্যয় সঙ্কোচের আনুকূল্য ছিল।

আমি আরতিকে সাইক্লোপিয়ান ওয়াল সম্বন্ধে বিস্তারিত জানাতে বলতে সে বুঝিয়ে বলল, পঞ্চ-পর্বতের মধ্যে অবস্থিত নগরীর রক্ষা ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করবার জন্য দুটি প্রাচীর ছিল। একটি বাইরের এবং একটি ভেতরের। বাইরের প্রাচীরের গায়ে গায়ে অনেক দুর্গ ছিল। অনেক জায়গাতেই প্রাচীর নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কিছু কিছু ভগ্নাবশেষ এখনও আছে। পুরাতত্ত্ববিদ স্যার মার্শালের মতে, ভারতে প্রাপ্ত সকল ধ্বংশাবশেষের মধ্যে এই প্রাচীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, বানগঙ্গার কাছেই ধ্বংশের সর্বাপেক্ষা বৃহদাংশ দেখা যাচ্ছে। এখনও যে প্রাচীর অবশিষ্ট আছে তা উচ্চতায় এগার ফুট এবং প্রস্থে চৌদ্দ থেকে সতের ফুট। কোনও কোনও জায়গায় দেখা যায় প্রাচীর উনত্রিশ ফুট উঁচু ছিল। লোকে বলে এর ওপর দিয়ে অশ্বারোহী সৈন্য কুচকাওয়াজ করত।

আমি : এই প্রাচীর সম্বন্ধে হিউয়েন-সাঙ্ কি বলেন?

আরতি : হিউএন-সাঙ্এর কথা জানি না। তবে বিখ্যাত পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের বিবরণে পাওয়া যায় রাজগৃহে নগরী পূর্ব-পশ্চিমে এক মাইল এবং উত্তর দক্ষিণে প্রায় দেড় মাইল লম্বা ছিল। গোদাবরী এবং গোমতী নদীর সঙ্গমের প্রায় ১৬০ ফুট দক্ষিণে নগরীর উত্তর তোরণ অবস্থিত ছিল। সেই সেই নদীর নামমাত্র চিহ্ন আপনারা দেখেছেন।

আমি শ্যামসুন্দরবাবুকে বললাম : "সাইক্লোপিয়ান" নামাকরণ বিষয়ে একটা নতুন মতবাদ আপনার "গলগণ্ডগড্ডালিকায়" লিপি বদ্ধ করতে পারব। তার সপ্রশ্ন দৃষ্টির উত্তরে আমি বললাম : সাইক্লোনের সময় ঐ দেয়ালে পিয়ানোর শব্দের মত শব্দ হয় বলে ওর নাম সাইক্লোপিয়ান।

এরই মধ্যে আরতি বলে উঠল দিদিমণি এখনও এলেন না

কেন? এ প্রশ্ন আমার মনে কয়েকবার উঠেছে। কিন্তু বিনা কারণেই উল্লেখ করতে সঙ্কোচের বাধা অনুভব করেছি। ভাবখানা এই যে মণিমালার জন্য আমার এত ব্যাকুলতা কেন। এইবার আরতির প্রশ্নে আমিও উদ্বেগ যোগ করলাম। দিদিও ব্যস্ত হয়ে বললেন : এখানে বসে বসে এত গবেষণা না করে একটু এগিয়ে দেখলেই তো হয়।

ততক্ষণে আরতি রওনা হয়ে পড়েছে। দিদি বললেন : ধিঙ্গি মেয়ে একাই চললেন। তুমি যাও ভাই। কোথায় যেতে কোথায় চলে যাবে তার ঠিক নেই।

মণি উপস্থিত নেই। সুতরাং সামান্য অনুরোধ আরতির অনুগামী হতে বিপর্য্যয়ের আশঙ্কা নেই। অন্ততঃ "কোথায় যেতে কোথায় যাওয়া" নিবারণ করে একটা নির্দিষ্ট স্থানের দিকে যাত্রাটা গমাতাং করতে পারি।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে আরতির সঙ্গলাভ করলাম। আরতি জিজ্ঞাসা করল : আমরা যে দিকে যাচ্ছি, এটা কোনদিক বলুন তো?

: আমরা এখন উত্তর দিকে যাচ্ছি এবং এই পথে এগিয়ে গেলে আমরা বিম্বিসার-কারা হয়ে রাজগীর শহরে পৌঁছে যাব। আরও এগিয়ে গেলে পাটনা।

: আরও এগিয়ে গেলে দিল্লী।

: আরও এগিয়ে গেলে খাইবার পাশ হয়ে কাবুল। বলেই দুজনে হেসে উঠলাম।

আরতি : আমাদের ডানদিকটা পূর্বদিক। এখানে কি আছে জানেন?

: জানি বৈকি!

: বলুন তো।

: ওখানে আছে আমার জিনিষ।

আরতি : তর্কশাস্ত্রে ভালই জানেন দেখছি। ওখানে সত্যিই

আপনার অজ্ঞাত "শঙ্খলিপি" আছে।

: বর এলে মেয়েরা তো শঙ্খ বাজায় জানি। তবে আবার লিপিও আছে নাকি?

: নিজেকে বোকা সাজিয়ে আমাকে বোকা বানাবার চেষ্টা কেবল। সেলইনস্‌ক্রিপসন্ আপনি জানেন না বুঝি!

: তা কোথায় সেই শঙ্খলিপি?

: এই যে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা জায়গাটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা নতুন তৈরী হয়েছে। আগে এটা খোলাই পড়েছিল। ঐ দেখুন পাথরের চট্টানের গায়ে কি সব অবোধ্য লিপি উৎকীর্ণ রয়েছে দেখুন।

: এমনি সব হিজিবিজি দাগ উড়িষ্যায় উদয়গিরি এবং খণ্ড-গিরিতেও আছে।

: এর পাঠোদ্ধার সম্ভব হলে নতুন ইতিহাস রচিত হবে।

: এ লিপি কত দিনের?

: মহাভারতের সময়কার বলে কথিত।

: এখানে সব কিছুর মধ্যেই জরাসন্ধের গন্ধ আছে। তা এর মধ্যে নেই?

: নিশ্চয়ই আছে। যারা এই স্থানটি ভীম এবং জরাসন্ধের মল্লস্থান বলেন, তারা বিশ্বাস করেন এই দাগগুলি তাদের হাঁটুর দাগ।

আমি বললাম : তাঁদের হাঁটু কী ধাতু দিয়ে তৈরী ছিল জানি না, যার আঘাতে পাষাণে এমন চিহ্ন থাকে।

আরতি হঠাৎ চিৎকার করে উঠল : ঐ যে দিদিমণি এসে গেছেন।

রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখি সত্যি একটি টাঙ্গা আসছে। তার সামনের আসনে মণিমালা একা এবং পেছনের আসনে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক এবং একজন মহিলা। গাড়ী নিকটবর্তী হ'লে দেখলাম দূরত্বহেতু দৃষ্টির অক্ষমতায় যে দুই নরনারী অপরিচিত ছিলেন, তাঁরা পরিচিত। এই পরিস্থিতিতে তাঁদের মণিমালা দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিতি, নিতান্তই বিস্ময়কর।

[বার]

নবীন রক্ষা প্রাচীরের মধ্যে প্রাচীন রহস্যময় শঙ্খলিপি। আমি আর আরতি দেখছি কিন্তু পাঠোদ্ধারের কোনও দুরাশা নেই। কিন্তু আকাঙ্ক্ষা এই, মণিমালা নির্জন দ্বিপ্রহরে কী রহস্য অনুসন্ধান করবে কে জানে। যদি তার মনে বিন্দুমাত্র সংশয় আসে, তবে তা প্রকাশ করতে কিছুমাত্র দ্বিধা করবে না। অগ্রপশ্চাৎ কিছুমাত্র বিবেচনা না করে আমি প্রাচীরের আড়ালে বসে পড়লাম। কাক অতি ধূর্ত পাখী। কিন্তু বিশেষক্ষেত্রে সে কোনও প্রিয় দ্রব্য অন্যের আক্রমণ থেকে রক্ষা করবার জন্য নিজের চোখ দুটোকে বন্ধ করে দিয়ে ভাবে, জগৎ সংসার অন্ধকার হয়ে গিয়ে নিজের দ্রব্য সুরক্ষিত হল। বুদ্ধিহীন পাখীর অন্তঃসারশূন্য রক্ষা ব্যবস্থার মত আমার আত্মরক্ষা ব্যবস্থাকে অচিরে অর্থহীন প্রমাণিত করে মণিমালা একেবারে সামনে এসে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল : জঙ্গলের মধ্যে বসে কি করছ ?

: পায়ে কী একটা কামড়েছিল, তাই।

: মাথায় কামড়ায় নি তো ?

: না।

: তবে ভয়ের কথা কম। মস্তিষ্কে দংশন হলে বিপদ।

মাথায় দংশন বলতে সে কি বলতে চাইছে জানি না, কিন্তু এটা জানি, তার মস্তিষ্কে দংশন হলে আর উপায় নেই। এমন কি আরতির উপস্থিতি পর্য্যন্ত বিস্মৃত হয়ে এমন সব কথা বলে ফেলবে, যার জন্য লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাবে। ভবিষ্যতে বিপদ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা অনুমান করবার জন্য তার মুখের দিকে তাকিয়ে কিন্তু আমি একেবারে বিস্মিত।

আজই গবাক্ষপথে প্রভাতের রবিরশ্মি প্রতিফলিত মুখখানাতে

যে শুচিস্নিগ্ধতা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম, মধ্যাহ্নসূর্য্যের প্রদীপ্ত গরিমায় সেই মুখশ্রীতে বিকশিত শতদলের অনুপম সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হয়েছে।

আরতি বলে উঠল : আমি দিদিমণির পৌঁছান সংবাদ সকলকে পৌঁছে দেই গে। আমি ভাবলাম প্রস্তাব মন্দ নয়। আরতি অন্ততঃ দৃষ্টির অন্তরালে চলে যাক। ঈশানের আকাশে মেঘ পুঞ্জীভূত হ'লে বিকশিত শতদল সঙ্কুচিত হতে কতক্ষণ।

আরতি বিদায় নিতে মণি বলল : মামা, নতুন অতিথিদের আপ্যায়ন কর। বলতে তার মুখখানা উদ্ভাসিত হল। মনে হল, সে যেন আজ সকল সঙ্কীর্ণতার উর্দ্ধে কী এক পরিপূর্ণতার সাগরে অবগাহন করেছে। নিজের অজ্ঞাতে মুখখানার দিকে তাকিয়েই ছিলাম। মণিমালার কণ্ঠস্বরে সম্বিৎ ফিরে এলো : অমন করে কী দেখছ? তাড়াতাড়ি দৃষ্টি আনত করলাম। অনেকটা দূরে রাস্তায় টাঙ্গায় নবাগত অতিথিযুগল বসে আছেন। আরতি স্থান ত্যাগ করেছে। নির্জন প্রান্তরের মধ্যে মণিমালা একেবারে কাছে এসে পড়েছে। মণিমালা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আমার হাতখানা ধরে ম্লানমুখে বলল : চল অতিথিদের আপ্যায়ন করি। বোধহয় মনে মনে ভেবে নিল, "কি পাইনি তার হিসেব মেলাতে......"

আমি বললাম : এমন অভাবিত অতিথি কি ভাবে সংগ্রহ হল?

: আমাকে যতটা নিষ্ঠুর ভাব, আমি তো তা নই। তোমার মত অতটা দয়ার শরীর না হলেও, মায়া-দয়া বলে জিনিষটা একেবারে নেই তা নয়। ফলে একেবারে ইয়ে থেকে অমনভাবে ছিনিয়ে নিয়ে এলাম—

: তাই আসবার সময় তুলে নিয়ে এলে?

: আমাকে তুলতে হয়নি। বাবা! ঐ দেহ আমি তুলতে পারি?

: না হয় তোমার আপ্যায়নে নিজেই উঠলেন।

: তা আপ্যায়ন একটু করেছি। হোটেলের সামনে আসতেই গত যামিনীর কথা মনে হল। নেমে পড়লাম। মুখোমুখি হতেই অন্ধকারের অপরিচয় দিবালোক দূরীভূত হল। সঙ্গে সঙ্গে পায়ের কাছে টিপ করে এক প্রণাম। আমি বললাম : একি হল। তিনি চিৎকার চ্যাঁচামেচি করে বললেন : ওগো দেখে যাও, কি ভাগ্যি, বৌদি এসেছেন।

: তারপর নিশ্চয়ই ভদ্রলোক এলেন? উত্তর দেবার আগেই আমরা টাঙ্গার কাছে পৌঁছে গেয়েছি। উভয়ে নেমে এলেন। ভদ্রলোক অর্থাৎ রিপুঞ্জয়বাবুর সঙ্গে নমস্কার বিনিময় হল। মিসেস "আলুথালু" এসে আমাকেও এক প্রণাম। তাঁর অঙ্ক নির্ভুল। বৌদিকে প্রণাম করে অর্ধেক কাজ করে রেখেছিলেন। এবার বোধহয় দাদারটা শেষ করে কার্য্য সুসম্পন্ন করলেন। বয়সের ব্যবধানের হিসেবটা এখানে নিরর্থক, সামাজিক পরিচয়ের সম্বন্ধটাই বড়। বেশভূষা এবং পোশাক পরিচ্ছদে তিনি নিজেকে মোটামুটি এমন করবার চেষ্টা করেছেন—যাতে সকলেই তাঁর প্রণম্য হতে পারে।

আজ আর তিনি আলুথালু নন। আধুনিকার মত বেশ আঁটসাঁট পোষাক পরিচ্ছদ। ইস্কুলগামী মেয়েদের মত ছুটি নাতিদীর্ঘ বিনুনী ঝুলছে। তার ওপরে মাথায় গৃহলক্ষ্মীর মত ঘোমটার নীচে চওড়া সিঁথিতে লাল টকটকে সিঁদুর। গাঢ় গোলাপী রং-এর একটি হালফ্যাসানের শাড়ী। তার নীচে লাল টুকটুকে স্বচ্ছপ্রায় একটি হ্রস্ব ব্লাউজের অবকাশে গাত্রবর্ণ পরিমার্জনার বিপুল প্রয়াস লক্ষ্যণীয়। সর্বোপরি অনেকদিন আগে বিদায়-নেওয়া বক্ষসুঠামকে ফিরিয়ে আনার হাস্যকর নিষ্ফল প্রচেষ্টা।

ওদিকে মণিমালা রিপুঞ্জবাবুর সঙ্গে কি কথাবার্তা বলছে। সুতরাং সম্মুখবর্তিনীর সঙ্গে আলাপের দায়িত্ব আমার। আমি বললাম : কি বলে ডাকব, তাই ভাবছি।

: আমার নাম মুক্তকেশী, মা আমাকে মুক্তো বলে ডাকতো। আপনিও তাই ডাকবেন।

আমি শুধু মনে মনে ভাবছি বোনের আমার কেশ মুক্তই থাক আর কবরীবন্ধনেই থাক, কিন্তু রিপুঞ্জয়বাবুর সঙ্গে এই মহিলার গ্রন্থি বন্ধন নিতান্তই রহস্যময়।

অন্যদিকে বিগতরজনীর নাটকীয় প্রস্থানের পরে মণিমালা আজ এই দম্পতিকে এমন নিবিড় ভাবে আমন্ত্রণ জানাল কি করে। এটা কি আদিত্যদেবের আশীর্বাদপুষ্ট উদারতা অথবা হৃদয়ের দহনজ্বালা? ধরিত্রীর বুকে অনুষ্ঠিত অনন্ত অনাচারের মধ্যেও সংসারটা এখনও টিঁকে আছে তার কারণ, অপরূপ সৃষ্টিকর্তার বিচিত্র সৃষ্টির মধ্যে মানুষের বুকে অবস্থিত হৃদয়খানিতে ঐ "দহনজ্বালা"। এই দহনের অনন্ত মহিমা।

কাছে পিঠে কেউ নেই। ভক্তি ভরে দাদা বলে ডেকে প্রণাম করেছে। মনটা একটু নরম হয়েছে—একথা স্বীকার করতে লজ্জা কি। বললাম : চল মুক্তো, ওদিকে এগিয়ে যাই।

এই সম্বোধনে মুক্তকেশী এতটা বিগলিত হয়ে পড়ল যে পুনরায় প্রণামের ভয়ে সরে গেলাম। দুজনে পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতে যেতে মুক্তো বলল : কাল নেহাৎ রেগে গিয়েছিল তাই! তা ভাই ঐ দুর্যোগের মধ্যে বাড়ী না ফিরলে কার না রাগ হয়! কিন্তু তুমি ভাগ্যবান দাদা, যে এমন বৌদি পেয়েছো।

হাত-পা বেঁধে নদীর মধ্যে ফেলে দিলেও এমন পারিস্থিতি হয় না। এ প্রসঙ্গ অবিলম্বে বন্ধ করা দরকার। আমি বললাম, মুক্তো, তুমি এর আগে এখানে এসেছ?

: কতবার এসেছি। হোটেলের বাবুরা কতবার টেনে নিয়ে এসেছে। কিন্তু ভাই, বৌদির ঐ একটী জিনিষ আমার পছন্দ নয়। সধবা মানুষ, কিন্তু কপালটা খাঁ খাঁ করছে। শ্বশুর শাশুড়ী না থাকলেও তুমি তো আছ ভাই। তোমাব ভগ্নিপতির কাছে ওটা

হবার উপায় নেই। একদিন যদি স্নান করে উঠে সিঁদুর দিতে দেরী হ'ল, একেবারে কুরুক্ষেত্তর বাধাবে।

: এখানে এই হোটেলের কারবার কতদিন করেছ?

: তা পাঁচ-সাত বছর হবে। আমি কিন্তু ভাই যাবার সময় বৌদিকে সিঁদুর পরিয়ে দেব। ওকি! সধবা মানুষ।

আমি মনে মনে দুর্গানাম জপ করতে করতে মণিমালাদের কাছে এসে পড়লাম। এসেই সর্ব প্রসঙ্গ পরিহারের জন্য চিৎকার করে নারী-হৃদয়ের দুর্বল দুয়ারে আঘাত করলাম : জঠর নামক অবাধ্য বস্তুটি কোন কথা শুনতে চাইছে না যে!

মণিমালা তাড়াতাড়ি বলে উঠল : বড়ই দেরী হয়েছে। এ আমারই দোষ। আমি সব তৈরী করে নিয়ে এসেছি।

সকলে এগিয়ে চললাম বানগঙ্গার দিকে। মনে মনে ভয়, মুক্তোর "দাদা-বৌদি" সম্পর্ক নিয়ে কখন গোলমাল বেধে ওঠে। কিন্তু আশু সমাধান কি করে হয়, তাই ভাবছি। মণিমালা একবার "মামা" বলে ডেকে উঠলে কী কাণ্ড হয় কে জানে? ওদিকে আরতির কাছে সংবাদ পেয়ে ওঁরাও এগিয়ে এসেছেন। টাঙ্গা থেকে মালপত্র নামিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে পুনরায় আসবার কথা স্মরণ করিয়ে তাকে বিদেয় দেওয়া হ'ল। "দাদা-বৌদি" সমস্যা আমার অন্তরের মধ্যে সকল আনন্দ নীরস করে দিল।

বনবিভাগের তৈরী মঞ্চের চারপাশে শালপাতা বিছিয়ে খাদ্যাদি পরিবেশন করা হ'ল। মণিমালার উদ্যোগে আয়োজন বেশ ভালই ছিল। রিপুঞ্জয়বাবুকে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে মুক্তো সম্বন্ধে যখন ভাবছি, তখন রিপুঞ্জয়বাবু তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে নিজের স্ত্রী বলে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেই মুক্তো মুখবিবরে সঞ্চিত তাম্বুলরস অদূরে নিক্ষেপ করে, বলে উঠল : হয়েছে, হয়েছে। সকলেই বুঝতে পেরেছেন। তোমাকে আর অত ব্যাখ্যান্ করতে হবে না। বলেই মাথার আঁচলটা একটু টেনে

দিলেন। বোধহয় বিনয়বাবু, শ্যামসুন্দরবাবু, দিদি ইত্যাদি গুরুজনের সম্মুখে স্বামীর উপস্থিতিতে লজ্জাবতীর লক্ষণ। এরপরে প্রণামের পালা। পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও সে একমাত্র আরতিকে ক্ষমা করে বাকী সকলকেই প্রণাম করল, এমন কি রিপুঞ্জয়বাবুকে পর্য্যন্ত।

মণিমালার শত অনুরোধ উপেক্ষা করে মুক্তো কিছুতেই পংক্তিতে না বসে বৌদিকে সাহায্য করবার জন্য পরিবেশনে নিযুক্তা হ'ল।

পরম পরিতোষের সঙ্গে আহারাদি শেষ করে, পরস্পরের অনুমতি নিয়ে সকলেই উঠে পড়ল এবং আস্তে আস্তে বানগঙ্গার প্রবাহের দিকে নেমে গেল। আমি আস্তে আস্তে মণির দিকে এগিয়ে বললাম : এবার তোমরা বসে পড়।

মণি হেসে বলল : আমার জন্য ভেবে তুমি শরীর খারাপ করো না। তুমি মিসেস্ "আলুথালুর" ব্যবস্থা কর।

: আলুথালু তোমার অতিথি। আমি ব্যবস্থা করব কেন? তাছাড়া ওদিকে বিনয়বাবু মুখখানা কেমন বিষণ্ণ করে রেখেছেন!

: বিনয়বাবুর মুখে হাসি ফোটাবার দায়িত্ব তুমি গ্রহণ করেছ, তা জানি। কিন্তু তা করতে গিয়ে আরও অন্যান্য কার্য্যাদি যা করণীয়, তা করতে পারবে তো?

: এদিকে অহঙ্কার তো আছে বেশ।

: সম্পদ থাকলেই মানুষের অহঙ্কার হয়। সে কথা যাক্। তুমি আস্তে আস্তে পাথরের ধাপে ধাপে নেমে গিয়ে বানগঙ্গার জলে হাতমুখ ধুয়ে এসো। পিছ্‌লে পোড়না যেন।

: তোমার সাবধান বাণী ছাড়াই আমি অনেক ওঠানামা করেছি। পিছ্‌লে পড়লে অনেক আগেই হাত-পা ভেঙ্গে বসে থাকতাম। তুমি আমার হাত ধরে চালিয়েছ কি?

: বরং পঙ্ককুণ্ডের দিকে ঠেলে দিয়েছি।

: এর মধ্যেই আবার অভিমান হল। যাক্, তোমরা খেতে

বসলে তবে আমি হাত ধুতে যাব।

: কিছু নেই যে। খাব কি ?

: সব বিলিয়ে দিয়েছ ? তাড়াতাড়ি বাঁ হাতে হাঁড়ির ঢাকনাগুলো খুলে দেখি, অন্ততঃ পাঁচজনের খাদ্য রয়েছে। আমি বললাম : একি! প্রচুর রয়েছে তো ?

মণি হাসতে হাসতে বলল : চরম প্রাচুর্যের মধ্যেও মানুষ যে নিঃস্ব, রিক্ত হয়ে বসে থাকতে পারে, একথা তুমি যদি জানবে তবে আমার ভাবনা ছিল কি ?

তাকিয়ে দেখি মুক্তোও বানগঙ্গার দিকে নেমে গেছে। মণিমালার পরিচয় যতটুকু জেনেছি তাতে ভাবলাম যে, কারণ যাই হোক, সে যা ভেবে রেখেছে তার থেকে বিচ্যুত করা শক্ত। তবুও নিজেরা আকণ্ঠ ভোজন করে, তাকে অভুক্ত রাখব কি করে ? এর পরে মুক্তোর কাছে না-খাওয়ার কৈফিয়ত দিতে গিয়ে অবস্থা কি দাঁড়াবে কে জানে। আজ সকল আনন্দলাভের মূলে এই নারীর কায়িক ও আর্থিক বদান্যতা। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে একমাত্র বিনয়বাবু ছাড়া কারও মুখে এই অভুক্তা মহিলার জন্য এখনও পর্য্যন্ত কোনও উৎকণ্ঠা দেখি নি। মণিমালার কাছে আমাকে উপস্থিত দেখে বিনয়বাবু নিশ্চিন্ত হয়ে বানগঙ্গার দিকে এগিয়ে গেছেন। কিন্তু আমার বিফলতা তাঁকে আঘাত করবে।

মণিমালা অভুক্তা। যে কোন হৃদয়বান ব্যক্তি তাকে খাবার জন্য অনুরোধ করতে পারে। কিন্তু বিনয়বাবুর বোধহয় সঙ্কোচ। এ যেন প্রাচীন বৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবারে নববধূর জন্য পরিণয় কর্ত্তার অসহায় উদ্বেগের মত। হৃদয়ে যতই ব্যাকুলতা থাক, প্রচলিত লোকচক্ষুর বিদ্রুপাত্মক সম্মার্জ্জনী তাকে নিরস্ত করত। সে একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথা তার সকল অঙ্গসজ্জা নিয়ে অন্তর্হিত হয়েছে। চলার পথে মহাকালের পদচিহ্নের রূপ প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে।

আমি কিন্তু অভুক্ত মণিমালাকে রেখে স্থান ত্যাগ করতে পারলাম না। দক্ষিণ হস্ত অভীষ্ট কার্য্যের অযোগ্য বিবেচনায় বাঁ হাতে মণির চিবুকখানি স্পর্শ করতেই, শুভ্র মেঘপুঞ্জের ওপরে অস্তগামী সূর্য্যের রক্তিমাভা ছড়িয়ে পড়ার মত, তার মুখখানা আরক্তিম হয়ে উঠল। মাথার কাপড়খানি একটু টেনে দিয়ে সলজ্জ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাতেই, আমার অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ একাকার হয়ে গেল। চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম আমি আর মণিমালা ভিন্ন সকলেই বানগঙ্গায় চলে গিয়েছে!

মুখখানি নীচু করে মণিমালা বলল : আজ প্রভাতে তোমার প্রথম কথা—"সুপ্রভাত মণিমালা"—আমার কানে ইন্দ্রসভার ঝঙ্কৃত সুরের মত সারাদিন আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। প্রাপ্তির শিখরে উঠে এখন মনে হচ্ছে তুমি আদেশ করলে আমার অসাধ্য আজ আর কিছু নেই। তবুও মিনতি করে বলছি, খাবার আদেশটি কোরো না, লক্ষ্মীটি!

বুঝলাম, কারণ যাই হোক, আজ তার পক্ষে এই খাদ্যগ্রহণ নিতান্ত অসম্ভব না হ'লে সে আমাকে মনোযন্ত্রণা দিত না। অগত্যা গাত্রোত্থান করে এগিয়ে চললাম। ধীর পদে কালো এলোমেলো পাথরের গা বেয়ে নেমে এসে শীর্ণকায়া বানগঙ্গার একেবারে কিনারায় দাঁড়িয়ে মনে মনে বললাম : লোকে বলে, মৃত্যুপথযাত্রী জরাসন্ধের পিপাসা নিবারণের জন্য তোমার জন্ম। তার পিপাসা নিবারণ করতে পেরেছিলে কিনা সে প্রশ্ন অবান্তর। তবে তার মৃত্যুকে তুমি রোধ করতে পার নি। ব্যর্থতার মধ্যে লব্ধজন্ম তোমার এই শীর্ণকায়া, আমার এই হস্ত প্রক্ষালনের সাক্ষী হয়ে থাক্। পাতাল থেকে উৎসারিত তোমার বুকে প্রবাহমানা এই নীল জলধারা যেন মণিমালার সর্বকলুষতা বিদূরিত করে। আমার কৃতকর্মের পরিণাম যে পথ নির্দেশ করে, আমি সকল ব্যর্থতার গ্লানি বহন করে হাসিমুখে চলে যাব, কিন্তু সংসারের আরোপিত সহস্র নির্য্যাতনের

মাঝে, আমার যাত্রা-পথের অর্জিত মালিন্য যেন মণিমালার জীবনকে বিড়ম্বিত না করে।

[তের]

ওপরে উঠে আসতে আসতে বিনয়বাবুর সঙ্গে দেখা হতেই অপরাধীর মত বললাম : অনেক অনুরোধ করেও মণিকে খেতে রাজী করাতে পারলাম না।

: ও তো খাবে না। আপনি অনুরোধ করছিলেন, আমি দেখেছি। কিন্তু ও খাবে না, আমি জানি।

বিরক্তিতে মনটা ভরে উঠল। এদের মধ্যে চলছে কোন মান অভিমানের পালা! আর আমি একটি আস্ত বলদ, মানভঞ্জনের দায়িত্ব নিয়ে বসে আছি। আর বিকশিতদন্ত এই বিনয়ের অবতার, দূরে দাঁড়িয়ে আমার কৃতিত্ব পরীক্ষা করছেন। দূর হোক ছাই।

ওপরে এসে দেখি শকুন্তলা দিদিমণি শালপাতায় করে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সাজিয়ে মণিমালাকে এবং মুক্তোকে নানা প্রকার মিষ্টান্ন দিয়েছেন এবং উভয়ে উক্ত কার্যে বিশেষ ভাবে নিযুক্ত। আমাকে দেখেই মণি বলে উঠল : আজ আমি অন্নপূর্ণা। কিছু চাই তো, চলে এসো মামা।

আমার অন্তরটা জ্বলে উঠেছিল। আমার সহস্র অনুনয়ে যে কাজ হ'ল না, সেই কাজ কী মন্ত্রবলে সম্পন্ন হ'ল। মনে মনে বললাম : অন্নপূর্ণার প্রসন্ন দান গ্রহণের জন্য বরং বিনয়বাবুকে ডেকে দিই। নীলকণ্ঠ বিনয়বাবু যা অম্লান বদনে গলাধঃকরণ করবেন, তা আমার পক্ষে অসাধ্য।

দিদি বললেন : আমি সেই সকালেই বলেছিলাম, আজ একাদশী, এসব হাঙ্গামায় কাজ নেই। তা কে কার কথা শোনে। তাই ব্যবস্থা আমি নিয়েই এসেছিলাম। এদিকে আবার এই বোনটিরও রবিবারের ব্রত ; অন্নগ্রহণ নিষেধ। তাই একই পর্বে দুই কার্য্য সমাধা হ'ল।

এদিকে মুক্তোর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি, বিচিত্র বর্ণের এবং নানা আকারের দাঁতগুলোর পেছনে, একটি ভাল প্রমাণ আকারের আস্ত রাজভোগ, বিল্বপত্রের ওপরে শিবলিঙ্গের মত, অনড় অচল হয়ে জিভের ওপরে বসে আছে। মণিমালার মুখে মাতুল-সম্বোধন এই হতবাকের কারণ তা আমি ভিন্ন কেউ জানে না। আমি বললাম : মুক্তো, খাও।

রাজভোগ খেতে গিয়ে মুক্তো বিষম খেলো, তারপর জল খেলো এবং আর কিছু খাবার অভিরুচি নেই জানিয়ে, দিদির সকল অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে মণিমালাকে সঙ্গে নিয়ে বানগঙ্গায় নেমে গেল। প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী সময় নিয়ে তারা যখন উঠে এলো তখন উভয়েই বেশ গম্ভীর।

ওপরে এসেই গম্ভীরভাবে মুক্তো আমাকে ডেকে একটু নিরিবিলি নিয়ে গিয়ে প্রথম সম্ভাষণেই বিমূঢ় করে বলল : মামা, আমার শত অপরাধ তুমি ক্ষমা করবে জানি। তোমরা শাপভ্রষ্ট দেবতা। ঐ যে একজন দেখতে পাচ্ছ—ঐ তাই। আমি পায়ের ধুলোর যোগ্য নই, কিন্তু লোকের কাছে পরিচয় দেবে নিজের স্ত্রী বলে। আমি হলাম নরকের কীট, আমি হব কিনা ওঁর স্ত্রী? উনি সত্যিকার আমার কে হন শুনবে?

আমি তাড়াতাড়ি বললাম : না, এখন নয়, পরে শুনব।

: তাই শুনো। আমার কথাটা 'তোমার বইয়ে একটু লিখে রেখো।

: আচ্ছা, সে হবে। গাড়ী এসে গেছে। তোমাদের হোটেলে

কেউ নেই। তোমরাই আগে চলে যাও।

গলায় আঁচল দিয়ে একমাত্র আরতি ভিন্ন সকলকে সজল চক্ষে প্রণাম করে রিপুঞ্জয়বাবু সহ মুক্তকেশী বিদায় নিল। যাবার সময় আরতিকে আদর করে সকলকে পদধূলি দেবার অনুরোধ জানিয়ে গেল।

বিদায় লগ্নের নীরসতাকে দূর করতে শ্যামসুন্দরবাবু বললেন : জানলে মণি, তোমাকে বাদ দিয়ে সকলে সাইকেল পিওন দেখে এলো।

মণিমালা রহস্য উদ্ঘাটনে বিশেষ মনোযোগী হ'ল না কারণ কলকাতার জীবনেও সাইকেল পিওনের সঙ্গে তার কোন পরিচয় নেই। আগ্রহের অভাবে বিষয়টা চাপাই পড়ে গেল। মণিমালাকে একটু একান্তে চেয়েছিলাম। সুযোগও এলো, কিন্তু মণিমালারই অনাগ্রহের জন্য সুযোগটা নষ্ট হ'ল।

আরতি বলল : মামা, ঐ যেখানে শঙ্খলিপি দেখলেন না, ঐখানেই রথচক্র চিহ্ন আছে।

রথচক্রের কথা শুনে শকুন্তলাদির পক্ষে আত্মসংবরণ করা কঠিন হয়ে পড়ল। ফুল, বেলপাতা বললেই যেমন দেবগৃহের কথা মনে পড়ে, তেমনই "রথ"এর কথা শুনে দিদিমণি স্বর্গীয় ভাবে আত্মহারা হয়ে অস্বাভাবিক গলায় বলে উঠলেন : "কোথায় রথ?" ভাবখানা এই, নিকটেই কোথাও রথের মধ্যে দেবতা বসে আছেন। শুধু স্থানটি জানলে এখনই দৌড়ে যাওয়া যায়।

শ্যামসুন্দরবাবু বিচলিত ভাবের অভিনয় করে বললেন : কি মুস্কিল! তাই বলে তুমি এই জঙ্গলের মধ্যে কান্নাকাটি আরম্ভ করবে নাকি?

আমি বললাম : চলুন আপনাকে রথের দাগ দেখিয়ে নিয়ে আসি।

শ্যামসুন্দরবাবু করুণ কণ্ঠে বললেন : এই বৃদ্ধের দিকে একটু

নজর রাখবেন স্যার। রথে করে যিনি এসেছেন, তার নজরে পড়লে, যদি তিনি এই বানগঙ্গাকে যমুনা মনে করে একবার বেণুতে ফুঁ দিয়ে বসেন, তবে এই বৃদ্ধ আয়ান ঘোষের দুর্গতির শেষ থাকবে না।

বাবা কথা বলতে আরম্ভ করলেই আরতি দূরে সরে যায়। অন্যদিকে দৃষ্টি আবদ্ধ করে তার বাবাকে স্বাধীনতা দান করে। মা এবং বাবার মধ্যে এই রসমধুর সম্পর্কের জন্য তাঁদের প্রতি আরতির ভক্তি-ভালবাসার অভাব নেই। বোধহয় কিছু গর্বও আছে।

সকলে পায়ে পায়ে এগিয়ে আবার সেই প্রাচীরে ঘেরা জায়গাটির মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছি। শ্যামসুন্দরবাবু হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন : সরে এসো, সরে এসো।

আমরা সকলেই সচকিত হলাম বটে কিন্তু দিদি একেবারে লাফিয়ে উঠে শ্যামসুন্দরবাবুকে জড়িয়ে ধরলেন। শ্যামসুন্দরবাবু সামনে ছিলেন তাই রক্ষে। নইলে কোন তৃতীয় ব্যক্তি থাকলে, ঐ অবস্থায় তাকেও জড়িয়ে ধরতে দ্বিধা করতেন না।

শ্যামসুন্দরবাবু গম্ভীর ভাবে বললেন : কোথায় দাঁড়িয়েছিলে জান? একেবারে রথের চাকার দাগের ওপরে। এর ওপর দিয়ে দেবতাদের রথ যাতায়াত করত, আর একেবারে তার ওপরে দাঁড়ানো কি উচিৎ?

এইবার সকলে হেসে উঠেছে, একেবারে আরতি পর্য্যন্ত। ঘটনা পরিষ্কার হলে দিদি কর্তাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন : তোমাদের সব তাতেই হাসি। এই ধিঙ্গি মেয়েটা পর্য্যন্ত।

আরতি : তুমি এমন করনা, মা। আমরা সকলেই তো দাঁড়িয়ে ছিলাম। কথাটাও সবাই শুনেছি। কিন্তু তুমি চার হাত পায়ে লাফিয়ে উঠলে। তুমি এমন কর বলেই তো বাবা তোমাকে কেবলই রাগিয়ে দেন।

দিদি : লোকে বলতেই বলে—অবোধের গোবধে আনন্দ।

শ্যাম : তুমি এই দেবস্থানে দাঁড়িয়ে গো-বধের কথা বললে?

শ্যামসুন্দরবাবু এই কথার এত প্রখরতা, আগে ভাবেন নি। এই মন্তব্যে দিদি দিশেহারা অবস্থায় বসে পড়ে প্রগল্‌ভতাজনিত অজ্ঞাত পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য পুনঃ পুনঃ মৃত্তিকা অর্থাৎ পাথর স্পর্শ করে কপালে আঘাত করতে লাগলেন। আমাদের দিকেও কাতর ভাবে তাকালেন। বোধহয় অর্থ এই, শ্রবণজনিত পাপের জন্যও একই ট্রিটমেণ্ট দরকার।

মণি আমার কানে কানে বলল : পেটে এত বিদ্যে, এত বুদ্ধি, কিন্তু অন্তরে কি সরল বিশ্বাস। আমাদের মূর্খের অন্তরে কেবল সন্দেহের বিষ।

শিশি বোতল ছাড়া অন্য বিষয়ে বিনয়বাবুর উৎসাহ দেখা গেল। বললেন : খুবই আশ্চর্য্য নিদর্শন। আমরা পাড়াগাঁয়ে কাঁচা রাস্তায় গাড়ী চলতে চলতে এমন দাগ হয় দেখেছি। কিন্তু এমন শক্ত পাথরের ওপরে চিহ্ন রাখতে পারে, সে কোন গাড়ীর কেমন চক্র বোঝা যায় না।

আমি : এমনও তো হতে পারে, আগে মাটির রাস্তায় দাগ পড়েছিল। পরে দাগশুদ্ধ মাটি পাথরে রূপান্তরিত হয়েছে।

আরতি : দাগ পড়বার মত নরম মাটি কতদিনে পাথর হয় মামা?

মনে মনে ভাবলাম পৃথিবীর বুকে যত পাথর, সবই কি কালের ব্যবধানে পাথর হয়েছে? তাহলে তো গোটা পৃথিবীটাই একদিন পাথর হয়ে যাবে। মণিমালা অবশ্য বলবে, তাই হচ্ছে। মানুষ শুদ্ধ পৃথিবীটা আস্তে আস্তে পাথরই হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাতো সত্যি নয়। হিমালয়ের পাথরগুলো কোত্থেকে এলো কে জানে। হয়ত মাটির তলা থেকে উঠে এসেছে। কিন্তু সে সব "অমৃতং বালভাষিতং" একমাত্র শ্যামসুন্দরবাবুর গলগণ্ডগড্ডালিকায় স্থান

পেতে পারে। আমি বললাম : জানি না আরতি।

বিনয়বাবু এর মধ্যে একটা কাঠি সংগ্রহ করে দূরত্ব মেপে ফেলে বললেন : রথগুলো পাঁচ ফুট গেজ্ এর ছিল।

শ্যাম : তাহলে কেমন কথা হ'ল? পুরীতে জগন্নাথের রথের গেজ অনেক বড়। জগন্নাথ অর্থ—শ্রীকৃষ্ণ। এই রথের গেজ যদি পাঁচ ফুট হয়, তবে শ্রীকৃষ্ণ এখানে অন্য রথে এসেছিলেন।

দিদি : শ্রীকৃষ্ণ কি এখানে রথ নিয়ে এসেছিলেন নাকি?

শ্যাম : বেদে সে রকম উল্লেখ আছে।

দিদি : ঠাকুর দেবতা নিয়ে অত উপহাস না করে সত্যি করে বলনা—শ্রীকৃষ্ণ এখানে রথে করে এসেছিলেন?

শ্যাম : গল্পগণ্ডগড্ডালিকার মতবাদটা জানালাম। এ বিষয়ে অন্য মতবাদও আছে। এই গিরিব্রজনগরীতে শ্রীকৃষ্ণের পদধূলি পড়েছিল।

আমি : সে তো জরাসন্ধ উপলক্ষ্যে।

শ্যাম : সত্যি কথা। বেদব্যাস মহাভারত গ্রন্থের সভাপর্বে ঊনবিংশতিতম অধ্যায়ে বলেছেন, শ্রীকৃষ্ণ, ভীমসেন ও অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে গিরিব্রজে এসেছিলেন। কোন যানবাহনের উল্লেখ নেই।

আরতি : তাহলে ধরে নিতে হয় পদব্রজে এসেছিলেন।

শ্যাম : হয় তো তাই। তারপর জরাসন্ধ নিধনের পরে তারা বিজিত রাজার অমূল্য রথখানি অধিকার করে শ্রীকৃষ্ণ নিজে সারথি হয়ে গিরিব্রজ পরিত্যাগ করেছিলেন। এতে মনে হয় নিজেদের রথ থাকলে অন্যের রথ নিতে যাবেন কেন? আর যদি বা থাকত, তবে সেখানাও সঙ্গে নিতেন।

দিদি : তোমার মত বিষয়-বুদ্ধি হয়ত ভগবানের ছিল না।

দিদি ঐ চাকার দাগের মধ্যে একটা দেবত্ব আরোপ করতে চান। করতে পারলে তিনি শান্তি পান—এটা আমি বুঝেছি। সেই কোন

দ্বাপরযুগের কথা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পদধূলি এখানে পড়েছিল কিনা এমন সাক্ষ্য কোথায় মিলবে? কিন্তু দিদির অন্তরে অত বিচারের অবকাশ নেই। তিনি মনে মনে মোটামুটি একটা ধারণা করতে চান। এতে কেউ সাহায্য করলেই তিনি ধন্য। তিনি বললেন : কালিদাস "রঘুবংশ" গ্রন্থে লিখেছেন রামচন্দ্র রাবণবধ সমাপ্ত করে যখন সীতাকে নিয়ে ফিরে আসেন, তখন একটি পুষ্পক-রথে করে এসেছিলেন।

শ্যাম : সুতরাং তুমি বলতে চাও, তিনি এই বিমানক্ষেত্রে অবতরণ করেছিলেন—এই সেই চক্রচিহ্ন। এ কথা অবশ্য গলগণ্ড-গড্ডালিকায় উল্লেখ আছে।

দিদি : সংসারে তোমার যত প্রকার আনন্দ আছে, তার মধ্যে প্রধান হ'ল আমাকে একটি মূর্খ প্রমাণ করা। রামচন্দ্রের পুষ্পকরথ এখানে অবতরণ করেছিল, এমন ছেলেমানুষী চিন্তা আমি করি নি। তবে শুনেছি সূর্য্য বংশের রাজা বসু এই গিরিব্রজ নগরী স্থাপন করেছিলেন। সুতরাং রাজা বসুরও একখানা রথ থাকা অসম্ভব নয়।

শ্যাম : সে গুড়ে বালি। রামচন্দ্র যে রথ খানায় এসেছিলেন, সেটা পরের ধনে পোদ্দারী। রাবণ রাজা গতায়ু হলে, বিভীষণ রাজা হয়ে রথের মালিক হন। তিনি রামচন্দ্রের অনেক চামচেগিরি করেছেন। সুতরাং সাময়িকভাবে ঐ রথখানা তিনি রামচন্দ্রকে ব্যবহারের জন্য দিয়েছিলেন।

আমি : সিলোন থেকে অযোধ্যা পর্যন্ত ঐ চার্টার্ড পুষ্পকের জন্য তেল খরচাটাও রামচন্দ্রকে দিতে হয় নি?

সকলেই হেসে উঠল। এমন কি দিদি পর্য্যন্ত। আমি বললাম : সকল হাস্যরসের ওপরে একথা বলা যায় যে এই দাগগুলো কোন বিমানের অবতরণক্ষেত্রের।

: এটা কোন বিমানক্ষেত্র হলে আমার লাভ ছাড়া লোকসান

নেই। বলেই হাসিমুখে দিদির দিকে তাকিয়ে বললেন : কারণটা জানলে আমি গ্রন্থে স্থান দিতে পারতাম।

আমি বললাম : দাগগুলো দৈর্ঘ্যে খুব বেশী নয়। ভূমি ভাগের ওপরে কোনও নিত্য-চলমান গাড়ীর চাকার দাগ হলে, সে দাগ এই স্থানটির মধ্যেই শুধু সীমাবদ্ধ থাকত না।

শ্যাম : আপনাদের সকলের সহযোগিতায় আজ আমি গ্রন্থের জন্য অনেক উপাদান লাভ করেছি।

আমি : ভবতুলালবাবুকে অভিনন্দন জানিয়ে আমি আর একটি তথ্য নিবেদন করতে চাই। সকলের সাগ্রহ দৃষ্টি আমার ওপরে পড়ল। বিশেষ করে রথের চাকার দাগের সমর্থনে আমি এত জোর সওয়াল করেছি যে দিদি আমার ওপরে বিশেষ প্রসন্ন দৃষ্টি স্থাপন করলেন। আমি বললাম : এই যে ক্ষেত্রে আপনারা শঙ্খলিপি এবং রথচক্রচিহ্ন দেখলেন, বৌদ্ধরাও এই স্থানটিকে বিশেষ পবিত্র মনে করেন।

শ্যাম : বৌদ্ধরা অহিংস। সুতরাং নির্ভয়ে আপনার মতবাদ প্রকাশ করতে পারেন।

আমি : তাদের বিশ্বাস ভগবান তথাগত বুদ্ধ এইখানেই প্রথম ভিক্ষা দ্বারা সংগৃহীত অন্নগ্রহণ করেন এবং এইখানেই মহারাজ বিম্বিসারের সঙ্গে বন্ধুত্ব লাভের পর তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়।

এই কথা বলতে বলতেই আরতি ঘোষণা করল, আমাদের নিয়ে যাবার জন্য দুখানা টাঙ্গা এসে গেছে। সকলে মিলে পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতে যেতে বিনয়বাবুর গতি বন্ধ হল এবং লক্ষ্য করে দেখা গেল মণিমালা দল থেকে কোন অবসরে বিচ্যুত হয়েছে। সকলে চতুর্দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করতেই আমি দেখলাম শঙ্খলিপি এবং রথচক্রচিহ্নকে ঘিরে আয়ত ক্ষেত্রের একেবারে প্রান্তদেশে মণিমালা দাঁড়িয়ে আছে। বিনয়বাবুর উপস্থিতিতে আমি চুপ করেই থাকলাম। বিনয়বাবু কী ভাবলেন জানিনা, বললেন : আমরা এগিয়ে যাই। একখানা

টাঙ্গা থাকল, মণিকে নিয়ে আসুন। বলে আমার মুখের দিকে এমন ভাবে তাকালেন যেন আমি যদি এই কাজটি করি, তবে তাঁর কৃতজ্ঞতার শেষ থাকবে না।

আমি যে জীবনে কোনও দিন কোনও উপকার করি নি এমন কথা নয়। সুতরাং বিনয়বাবুর অনুরোধে মণিমালার দিকে এগিয়ে চললাম। ওঁরা সকলে ঘরের টানে এগিয়ে গেলেন।

মণিমালার অবস্থিত দৃষ্টিপথে খুব একটা দূরে নয়, কাছেই। কিন্তু চলাচল না থাকায় পথ বড়ই বন্ধুর। সাধারণ লোক যেখানে বিশেষ যাতায়াত করে না, সেই পথেই আমাকে এগিয়ে যেতে হবে। ছোট, বড়, মাঝারি, নানা আকারের নানা বর্ণের পাথরে আচ্ছন্ন স্থানটির এখানে সেখানে কণ্টকাবৃত গুল্মাদি পরিবৃত ভূমিখণ্ড অতিক্রম করে মণিমালার দিকে এগিয়ে চললাম।

এগিয়ে যেতে যেতে মুগ্ধ বিস্ময়ে আমার গতি স্তব্ধ হল। প্রাচীরের উপর কনুইটি রেখে হাতের ওপর চিবুকটি স্থাপন করে মণিমালা দূরে সেই প্রাগৈতিহাসিক প্রাচীরের দিকে তাকিয়ে আছে। আধুনিক একটি প্রাচীরের ওপর দেহভার রেখে দৃষ্টিটি নিবদ্ধ আছে কোন অনাদি অতীতের এক অজ্ঞাত নির্মাণকলার ওপর। সবুজের তরঙ্গে আচ্ছাদিত সোনাগিরির শিখরের অন্তরালে সূর্য্যদেব অস্ত যাচ্ছেন। অস্তগামী সূর্য্যের শেষ স্বর্ণরশ্মি মণিমালার মুখের ওপর এসে পড়েছে। তার সর্বদেহে আদিত্যদেবের লাবণ্যছটা আশীর্বাদের মত ছড়িয়ে পড়েছে। আমি ভাবলাম, আজই যেন মণিমালার অঙ্গে অঙ্গে এত রূপের জোয়ার। পূর্বদিগন্তে নবারুণ রাগে প্রভাতসূর্য্যে যার নব অভ্যুদয়, মধ্যাহ্ন ভাস্করে যার পূর্ণ গরিমা, সোনাগিরির অন্তরালে অবস্থিত সূর্য্যদেবের সোনার কিরণে আজ সে উদ্ভাসিতা। মনে মনে ভাবি, সংসারের সমস্ত রিক্ততাই যদি বিধাতার অভিপ্রেত, তবে সমারোহের প্রাচুর্য্যে একে পরিপূর্ণ করেছ কেন?

আস্তে আস্তে মণিমালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। মধ্যেকার ব্যবধান শুধু একটি সামান্য প্রাচীর। সেই প্রাচীর দুর্লংঘ্য নয়। উভয়ের উর্দ্ধাঙ্গ নিতান্তই সন্নিহিত।

আমি বললাম : সূর্য্যদেব অস্ত যাচ্ছেন যে।

: রাত্রির অবসানে সূর্য্যদেব আবার উদিত হবেন। কিন্তু আজকের এই দিন আর ফিরে আসবে না।

: এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে কি আজকের দিন চিরদিন বেঁচে থাকবে মণি? অন্ধকার এসে দিনকে তো গ্রাস করবে।

: দিবসের আলো রাত্রের তমসায় অবগাহন ক'রে নতুন গরিমায় প্রভাতসূর্য্যে উদ্ভাসিত হয়। আলো যেমন তরঙ্গময়, অন্ধকার তেমনি নিস্তরঙ্গ। তরঙ্গহীন নিথর সেই কৃষ্ণ সলিলে নরনারী তাই অমৃতকুম্ভের সন্ধান করে। তা তুমি তো সাঁতারই জান না। অন্বেষণ করবে কি করে?

: নিরর্থক সন্ধানে লাভ কি? অমৃতকুম্ভ দেবতারা হস্তগত করেছে। আমার জন্য যা পড়ে আছে, একমাত্র নীলকণ্ঠ ছাড়া তা কেউ হজম করতে পারবে না। কিন্তু সবাই তো ঘরে ফিরল। তুমি ফিরবে না?

: যারা ঘরে যাবার তারা ঘরে গেছে, আর যারা পারে যাবার, তারা পারে গেছে। কিন্তু

"ঘরেও নহে পারেও নহে যেজন আছে মাঝখানে
সন্ধ্যাবেলা কে ডেকে নেয় তারে।"

: ডাকবার জন্যই তো এসেছি। এসো।

: কি করে আসব? দুজনের মধ্যে তো প্রাচীর?

: প্রাচীর উঁচু নয়। অতিক্রম করে চলে এসো।

: ক্লান্ত এই দেহে অতিক্রমের ক্ষমতা নেই। তুমি পাথর অপসারণ করে, আমাকে অতিক্রমের পথ করে দাও।

: এই এক একটা জগদ্দল পাথর অপসারণের শক্তি কোথায় আমার?

: তবে আমি এই অন্ধকারেই বসে থাকি?

: তা থাকবে কেন? দশজনের চলার পথ দিয়ে বেরিয়ে এসো।

মণিমালা বলল : বুঝেছি, বুঝেছি—

"ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোট সে তরী"

আমি বললাম : থামলে কেন? বল। শেষ কর—

"আমারই সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।"

মণি : সত্যি কথা?

আমি : অনুমান।

এই জন্যেই মনে হয় অপেক্ষা করছিলেন। সাক্ষ্যগ্রহণ সমাপ্ত হ'লে, সূর্য্যদেব সোনাগিরির অন্তরালে অস্ত গেলেন।

প্রদোষের প্রায়ান্ধকারে মণিমালার হাতখানা ধরে ঘরের দিকে পা বাড়ালাম। পিছনে পড়ে রইল উদয়গিরির বুকে হৃত গৌরব প্রাগৈতিহাসিক প্রাচীরের ধ্বংশাবশেষ আর প্রাচীন প্রস্তরখণ্ডের দ্বারা আধুনিক স্থাপত্যে তৈরী প্রাচীরের মধ্যে দুর্বোধ্য রহস্যময় শঙ্খলিপি আর অজ্ঞাত দেবতার কোন্ বিস্মৃতকালের রথচক্রচিহ্ন। আর পাশেই প্রবাহিতা ব্যর্থতার অবসাদে ভরা বানগঙ্গার শীর্ণ প্রবাহ।

চৌদ্দ]

সেদিন উদয়গিরির প্রান্তদেশ থেকে মণিমালার হাতখানি ধরে যখন ঘরের দিকে পা বাড়িয়েছিলাম, তখন প্রদোষের প্রায়ান্ধকারে দিনান্তের বিহঙ্গকুল দিবসের সঞ্চয় নিয়ে বাসায় ফিরে চলেছে। কিন্তু আমি যা নিয়ে প্রত্যাবর্তন করলাম, তা কি দিবসের সঞ্চয় অথবা অবক্ষয়, তা জানেন শুধু অন্তর্যামী।

ভুবনেশ্বরের ভুবনে এসে যখন হাজির হলাম তখন রাত্রির নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে এবং সেই নীরবতা ভঙ্গ করবার জন্য একমাত্র রাস্তার পাশে নিক্ষিপ্ত ভষ্মরাশির মধ্যে শায়িত পরস্পর বিবদমান কুকুর-গুলোর চিৎকার ভিন্ন অন্য কিছু নেই।

ঘড়ির দিকে প্রথম তাকালাম, যখন দেখলাম বিনয়বাবু একবার ঘর একবার বার করছেন। আধঘণ্টার পথ আসতে সময় লাগল চার ঘণ্টা। বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসার উপযুক্ত ক্ষেত্র, সন্দেহ নেই। আমাদের দেখেই বিনয়বাবুর পদচারণা বন্ধ হল। প্রশ্নের পরিবর্তে কৃতজ্ঞতার প্রকাশ। অর্থাৎ আমরা যে দয়া করে ফিরেছি—এই জন্য কৃতজ্ঞতা। তিনি নিজের কক্ষে প্রবেশ করলেন। মণির কানে কানে বললাম : এত বিলম্বের কৈফিয়ৎ কি দিলে, কাল শুনব।

মণি : তোমার দুষ্টুমির কথা সব বলে দেব। তারপর তোমার কপালে মাষ্টার মশায়ের বেত।

: বেত তোমার কপালেও আছে।

: আমার অভ্যেস আছে। তা ছাড়া আমি বেত খেলে তোমার যন্ত্রণা কিছু কমবে কি ? বলে তাদের ঘরে প্রবেশ করল। আমি এসেই ক্লান্ত শরীর বিছানায় এলিয়ে দিলাম। উৎকর্ণ হয়ে থাকলাম বিরূপ কথোপকথনের কিছু কানে আসে কিনা। কিন্তু

একেবারে নীরব। ভাবলাম গভীর রাত্রির একান্ত নিরালায় দুইজনের বোঝাপড়ার পালা।

এইভাবে অন্ধকারে মিনিট দশেক কাটাবার পর হঠাৎ ঘরের আলো জ্বলে উঠল এবং সহাস্যে মণিমালার হাতে উত্তপ্ত চায়ের পেয়ালা দেখে নিমেষের মধ্যে "থ্যাঙ্ক্‌" বলে উঠে বসে পেয়ালা হাতে নিলাম।

মণি : জানলে মামা, খুব অন্যায় হয়েছে।

আমি : ন্যায় অন্যায়ের এত সূক্ষ্ম বিচার বোধ আছে জানলে, এত অন্যায় আমি হতে দিতাম না।

: ন্যায় অন্যায় যাই হয়ে থাক, তার দায়িত্ব দু'জনেরই। তুমি এত রেগে যাচ্ছ কেন? তাছাড়া একটু দেরী হয়েছে—এই তো অপরাধ।

: তুমিই তো বলছ, অন্যায় হয়েছে।

: বিনয়বাবুর চা খাওয়া হয়নি—এখনও, তাই বলেছি। সংসারে বিলাসিতার মধ্যে ওঁর ঐ একটি জিনিষ—চা খাওয়া। তাছাড়া তিনদিন ওঁকে ভাত না খাইয়ে রেখে দাও, কিচ্ছু বলবে না।

: আর চা না দিলে?

: তাও মুখে কিছু বলবে না। কিন্তু মুখখানা দেখলেই মনে হবে খুব কষ্ট হচ্ছে।

সামান্য একটু চায়ের অভাবে বিনয়বাবুর জন্য মণির এতখানি কাতরতায় নিজের মনে একটু জ্বলুনি হয়েছিল কিনা জানি না, একটু শ্লেষের সঙ্গে হঠাৎ বলে ফেললাম : অন্য কিছু ঘুষ একটু বেশী করে দিয়ে, আজ না হয় চায়ের অভাব পূর্ণ করে দিও।

মণির মত প্রখরা বুদ্ধিমতী মেয়েও এর কিছু বুঝতে পেরেছে কিনা জানি না। মনে মনে ভাবলাম, ভালই হয়েছে। কারণ নিজের কুৎসিত রসিকতায় নিজেই লজ্জিত হয়েছিলাম। কথাটা

ঘোরাবার জন্য বললাম : তা এখন ডবল কাপের ঘুষ দিয়ে এসেছ তো ?

তা হবে না। নিয়মের ব্যতিক্রম হবার উপায় নেই। সেই এক কাপ।

: এটা তোমার তরফের মুখের কথা বলছি।

: ঘুষ দিলেই কি সকলে নেয় ?

: আমাদের মত দারোগাবাবুদেরকে চেষ্টা করায় ক্ষতি নেই। কি বল ?

: ও বাবা! এযে আবার রাগ হয়ে গেল। ওসব কথা থাক। হাতমুখ ধুয়ে নাও। আধঘণ্টার মধ্যে খাবার দিয়ে দেব।

আমি চুপ করেই থাকলাম। মণি বলল : একটা কিছু কথা বল। তা না হলে আমি যাই কি করে ?

: খাবার দেবে—খাব। এর মধ্যে কথা বলবার কি আছে ?

মণি এসে এইবার বিছানায় বসে আমার চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে বলল : ভালমুখে একটা কথা বল। আমি প্রসন্ন মনে কাজ করি।

আমি হেসে ফেলে বললাম: খুব ভালমুখে বলছি। তুমি প্রসন্নমনে কাজ আরম্ভ কর।

এই কথা শুনে আমাব চিবুকটি ধরে একটু নেড়ে দিয়ে সে হাসিমুখে বেরিয়ে গেল।

আমি বিছানায় চিৎপাৎ হয়ে ভাবতে লাগলাম, মণিমালা আজ আনন্দের জোয়ারে ভেসে চলেছে। "চন্দ্রগুপ্ত" নাটকে চাণক্য বলেছেন, "বিশুষ্ক হৃদয় নিয়ে রাজত্ব করা চলে না।" অন্তরে যদি স্নেহ, মায়া, মমতার অবকাশ না থাকে তবে তার হৃদয়ের নিষ্ঠুরতা জলন্ত অঙ্গার হয়ে দাহ্য পদার্থ খুঁজে বেড়ায়। মণিমালা আজ কি পেয়েছে, আমি ঠিক জানি না। কিন্তু তার কথায়, চলায়, বলায় আজ একটা প্রসন্নতার স্নিগ্ধতা। উদয়গিরির মঞ্চে বসে আমি যখন

সোহাগ জানিয়ে তাকে খেতে অনুরোধ করেছিলাম, তখন তার বিনম্র লজ্জারক্ত মুখখানা দেখে মনে হয়েছিল, ঐ স্নিগ্ধ অনুরাগের অনুভূতি তার সহজলভ্য নয়। আজ সে যা পেয়েছে সেই প্রাপ্তির আনন্দের জোয়ারে সে ভেসে চলেছে। কিন্তু কী সে পেয়েছে, তা জানে সে এবং জানেন অন্তর্যামী। এই প্রাপ্তির অনাবিল আনন্দই বুঝি আজ বিনয়বাবুর প্রতি তাকে প্রীতির মাধুর্য্যে পূর্ণ করেছে। চায়ের প্রতি বিনয়বাবুর আসক্তি মণিমালার ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে আজ পরম রমণীয় রূপ লাভ করেছে। এই আনন্দধারায় অবগাহন করে সে সকল ঈর্ষাকে ক্ষমা করবার বলিষ্ঠতা অর্জন করেছে।

এইভাবে এলোমেলো ভাবতে ভাবতে কখন আধঘণ্টা পার হয়েছে জানি না। মণিমালার কণ্ঠস্বরে সম্বিৎ ফিরে এলো : একি! তুমি তেমনি শুয়ে আছ? খেতে হবে না?

: সত্যি বলছি, একেবারে খিদে নেই।

: ওসব আমি জানি। শিগগির ওঠ। বিনয়বাবু বসে আছেন।

: বিনয়বাবু তো ওঘরে খাবেন।

: এ ঘরে তুমি আরম্ভ না করলে ওঘরে তিনি বসেই থাকবেন। তুমি অতিথি।

: যদি কোনও দিন ভগবানের দেখা পাই, তবে বর চেয়ে নেব, যেন জন্ম জন্মান্তরে অতিথি হবার সুযোগ পাই। নিখরচায় এমন সেবাধর্ম গ্রহণ অন্য কিছুতে সম্ভব নয়।

: তবু তো কথায় কথায় কেবলই রাগ।

: যদি বলি ওটা অনুরাগ! উপসর্গেন ধাত্বর্থ বলাৎ অন্যত্র নীয়তে। ছেলেবেলায় পড় নি?

: আর বক্তৃতা করতে হবে না। সকলেই তো তোমার মত খিদে তেষ্টাকে জয় করে ষড়রিপুকে বশীভূত করে নি। বিনয়বাবু খিদেয় কাতর হয়েছেন।

: খিদে ভিন্ন অন্য কিছুতে কাতর হননি তো?

এ কথার কিছু উত্তর না দিয়ে মণিমালা আমার হাত দুখানি ধরে তুলে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে মণি তাম্বুলরঞ্জিত ওষ্ঠাধর নিয়ে আমার বিছানার পাশে বসে দুচারটি কথা বলে উঠে পড়ে বলল : তোমাকে উঠতে হবে না। তোমার ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে আমি দুই ঘরের মাঝখানকার দরজা দিয়ে ও ঘরে চলে যাচ্ছি। ওটা খোলাই থাকছে।

: কেন? খোলা থাকবে কেন? ওদিক থেকে বন্ধ করে দাও।

: ওদিক থেকে দরজা বন্ধ করবার ব্যবস্থা নেই। একটা ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু সেটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে দেখলাম।

: তা বলে দরজা খোলা থাকবে—সেটা বড় লজ্জার কথা হবে।

: এতে আবার লজ্জার কথা কি থাকতে পারে।

: লজ্জার কথা যদি না থাকে, তবে না হয় নির্লজ্জের কথাই থাকল। কিন্তু তুমি দয়া করে বন্ধ করে দাও।

: এদিক থেকে তো বন্ধ করবার ব্যবস্থা আছে। অত ভয় থাকলে তুমি করনা।

: তা হলেও তুমি ওদিক থেকে বন্ধ করে দাও।

: আমি কি দুপুররাতে দরজা বন্ধ করবার জন্য মিস্ত্রী ডাকব নাকি? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছেলেমানুষী করতে আমার ভাল লাগে না। এই বলে সশব্দে দরজা খুলে ওঘরে চলে যেতে যেতে আস্তে আস্তে বলল : বিনয়বাবু ঘুমিয়ে পড়েছেন। চেঁচিও না। সর্ববিধ আক্রমণের হাত থেকে আত্মরক্ষার নিরাপত্তা তোমারই হাতে থাকল। ইচ্ছা হয় খোলা রাখ, ইচ্ছে হয় মিস্ত্রী ডেকে বন্ধ করে দাও।

বলেই সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিল। আমি এদিক থেকে দরজা অর্গলবদ্ধ করলাম না। দুই ঘরের মধ্যে দরজা, ব্যবধান রক্ষা

করে, দুই দিক থেকেই মুক্ত হবার অধিকার নিয়ে রাত্রির অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকল। সারাদিন ধরে প্রাপ্তির আনন্দ জোয়ারে তরঙ্গায়িত মণিমালার এই আকস্মিক মানসিক অবক্ষয়ে আমি বেদনা বোধ করলাম।

অনেক আরাধনার পরে কখন নিদ্রা দেবীর অনুগ্রহ লাভ করে-ছিলাম জানি না। ঘুম ভাঙল একটি কলরবে। একটু পরেই বুঝলাম, ওটি কলরব নয়—সঙ্গীত। করতাল সহযোগে প্রভাতের আরাধনা সঙ্গীত। যে সব দেবতাদের সঙ্গে আমাদের চাক্ষুষ পরিচয় আছে, তাঁদের শ্রবণেন্দ্রিয় হয় মাটি, না হয় পেতল, না হয় কাঠ, বড় জোর অষ্টধাতু নির্মিত; সুতরাং যে কোন প্রকার কণ্ঠসঙ্গীতে তাঁদের বিচলিত হবার আশঙ্কা নেই। কিন্তু রক্তমাংসের ইন্দ্রিয় সমন্বিত অনিদ্রাজনিত অবসাদগ্রস্থ দেহে, মনে মনে প্রার্থনা করলাম, "গানটা থামাও লক্ষ্মী।" কিন্তু কার প্রার্থনা কে শোনে। দেবতার আশীর্বাদ ভক্তের দিকে। সুতরাং ভক্তিমূলক গীতি করতাল সহযোগে তার সুনির্দিষ্ট পথে এগিয়ে চলল।

পরদিন ভুবনেশ্বরবাবুর কাছে সবিনয়ে কণ্ঠসঙ্গীতের উৎস সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলাম, তিনি একজন নবাগত ভক্তপ্রাণ স্বাস্থ্যান্বেষী। তিনি কিছুদিন এইখানে অবস্থান করে ভক্তিযোগ এবং স্বাস্থ্যতত্ত্ব একসঙ্গে সাধন করবেন। ভুবনেশ্বরবাবু এমন কথাও বললেন, একমাত্র মাতা পিতার আশীর্বাদেই এমন ভক্তসঙ্গ লাভ করা যায়। আমি মনে মনে বললাম, মাতাপিতার আশীর্বাদধন্য ভুবনেশ্বর পাণ্ডা জন্মজন্ম সৎসঙ্গ লাভ করুন, আনন্দের কথা। কিন্তু প্রভাতের প্রার্থনা সঙ্গীতের কণ্ঠস্বর আমাকে রাজগীর ছাড়া করবে কিনা কে জানে।

সঙ্গীত যখন শেষ হ'ল তখন সূর্য্যদেব উদিত হয়েছেন কিন্তু তিনি মেঘের আড়ালে। বিগত প্রভাতের কথা মনে হল। শরতের সোনালী রোদে বিশ্বজগৎ যেন ঝলমল করে উঠেছিল এবং আজ

অঙ্গে সেই প্রভাতকিরণ মণ্ডিত মণিমালা গবাক্ষপথে অপরূপা হয়ে আমার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ যেন একাকার করে দিয়েছিল।

আজ ঘুম ভাঙ্গার পর থেকে এ পর্য্যন্ত মনে মনে একটা মৃদু পদধ্বনির আশা। কিন্তু সব প্রতীক্ষাই ব্যর্থ হল। মনে মনে ভাবলাম, রাত্রে বিনয়বাবুর কাছ থেকে গঞ্জনা লাভ করে ভবিষ্যত জীবনযাত্রায় হয়ত মণিমালা গতিপথ পরিবর্তন করেছে। তা করুক। সে আমার জীবনে কিছু অবিচ্ছেদ্য নয়। পূর্বেও ছিল না, ভবিষ্যতেও থাকবে না। বর্তমান-সর্বস্ব মণিমালা তার নিজের ভালমন্দ নিজে বুঝে, আমাকে মুক্তি দিক। এর মধ্যে হাহাকার করবার কোনও কথা নয়।

বালিশের তলা থেকে ঘড়ি বের করে দেখলাম, চায়ের পেয়ালা নিয়ে তার হাসিমুখে হাজির হবার সময় অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হয়েছে। হায়রে রমণীর মন! সত্যি তোমরা তরল পদার্থ। যে পাত্রে রাখা যায় তারই আকার ধারণ কর।

হঠাৎ আদিত্যদেব প্রসন্ন হলেন। এক ঝলক স্বর্ণরশ্মি এসে ঘরময় ছড়িয়ে পড়ল। এরপরে নিতান্ত দৈহিক অক্ষমতা না হলে শুয়ে থাকা যায় না।

বারান্দার দরজায় করাঘাত হল। ভাবলাম মাঝখানকার দরজা অর্গলমুক্তই আছে। সে দরজা দিয়ে না এসে বারান্দার দরজা দিয়ে আসবার নির্দেশ বুঝি বিনয়বাবুর। কিন্তু আমার ঘরের দরজা আমি নিজের ইচ্ছায় খুলব। অন্যের নির্দেশে নয়। তাই চুপ করেই থাকলাম। পুনঃ পুনঃ করাঘাতে দরজা খুলতে বাধ্য হলাম এবং দৃশ্য দেখেই আমার আপাতমস্তক জ্বালা করে উঠল।

সংসারের কাজকর্ম করবার জন্য যে মহিলাটিকে নিযুক্ত করা হয়েছিল, তার হাতে আমার জন্য এক পেয়ালা চা। আমি তাড়াতাড়ি তার হাত থেকে পেয়ালাটা নিয়ে পুনরায় দরজা বন্ধ করলাম। ক্রোধ প্রকাশের অন্য কিছু অভিব্যক্তি না থাকায়,

জানালা দিয়ে পেয়ালাটি শূন্য করে পুনরায় শুয়ে পড়লাম। মনে মনে ভাবলাম, এইবার ঘুম থেকে উঠে প্রকাশ্যভাবে গৃহত্যাগ করব। কেউ এই গৃহত্যাগ রোধ করতে পারবে না। সে মণিমালাই হোক আর যেই হোক।

কিছুক্ষণ পরে দুই ঘরের মাঝখানে দরজা খোলার শব্দ পেলাম। দেয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে ছিলাম। নির্বিকারভাবে তাই থাকলাম এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, মিঠে কথায় আর ভুলি ভুলবে না। ঝগড়া যদি করতে হয় তবে ভালভাবেই করব।

: চা ফেলে দিলে? মাথার যন্ত্রণায় উঠতে পারছি না বলে ওকে দিয়ে পাঠিয়েছি। চা তৈরীটা আমি কোনও মতে করেছি।

তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে দেখি, আমার বিছনার থেকে একটু দূরে মেঝের ওপরে কপালে হাত দিয়ে যন্ত্রণা কাতর মুখ নিয়ে মণিমালা বসে পড়েছে। আমার মনে হল, দৌড়ে গিয়ে নর্দমার পচা জল ঐ পেয়ালা ভরে তুলে নিয়ে এসে খেলে, তবে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। আমি তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম। মণি বলল: মুখ ধুয়ে এসো। আমি আবার চা করে দিচ্ছি।

আমি বললাম: বিনয়বাবু কোথায়?

: তিনি বেরিয়ে গেছেন।

: ভাল।

: ভালমন্দের কথা নয়। পুজোর ছুটির আগেই তাকে রিপোর্ট পৌঁছে দিতে হবে।

: তা রিপোর্ট তিনি পৌঁছে দিন না। কে বারণ করেছে। তিনি তোমার শরীরের অবস্থা জানেন?

: তা জানেন বৈকি। সারারাত তাঁর ঘুম হয়েছে নাকি?

: আমি তার সেবাধর্মে সন্দেহ করিনি। আমি অন্য কথা ভাবছিলাম। সে সব কথা থাক। ঠাণ্ডা মেঝের উপর বসে থেকে কাজ নেই। নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়।

: তা যাচ্ছি। তুমি আদর করে তোমার বিছানায় শোয়াবে সে আশায় আসিনি।

বলেই অসুস্থ শরীরে অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রতার সঙ্গে উঠে নিজের ঘরে গিয়ে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল। জানি, ইচ্ছে করলে দরজা খোলা যায়। কিন্তু সে চেষ্টা না করে হাতমুখ ধুয়ে নিজের কর্তব্য স্থির করে বেরিয়ে পড়লাম।

[পনের]

ঘরে ফিরতেই বিনয়বাবু তাম্বুলরঞ্জিত ওষ্ঠাধর বিস্ফারিত করে বিগলিত বিনয়ে আমাকে অভ্যর্থনা করে তাড়াতাড়ি স্নানাহারের আবেদন জানালেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, খাদ্য তৈরী করল কে? উত্তরে তিনি বললেন, মণিই রান্না করেছে। আমি বললাম :

: আপনি তাই তৃপ্তি করে খেলেন?

: আমি এসে দেখি, রান্না করে ফেলেছে। না খেলে তো ফেলে দিতে হবে। ফেলে দেওয়া অপেক্ষা খাওয়া ভাল।

: আমারটা ফেলেই দিন।

: আপনি কি অন্য কোথাও খেয়েছেন?

: হ্যাঁ।

: তা হলেও আপনাকে খেতে হবে। না খেলে তো অনর্থ বাধাবে। তখন ভাববেন খাওয়াই ছিল ভাল।

মণির ঘরের দরজায় উঁকি দিয়ে দেখি, সে বোধহয় নিদ্রিতা।

প্রতিবাদের সম্ভাবনা নেই মনে করে নিজের ঘরে চুপ করেই ছিলাম। বিনয়বাবু দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সেই পরিচিত হাসির দ্বারা পূর্বকথা স্মরণ করালেন। অন্য কিছুর জন্য না হোক, ভদ্রলোকের বিড়ম্বনা-মুক্তির জন্য কাজগুলো শেষ করে ফেললাম।

সন্ধ্যার পূর্বে বিনয়বাবু শিশি বোতলভর্তি ব্যাগ নিয়ে বেরিয়েযাবার সময়ে আমাকে জানিয়ে গেলেন যে মণি আমার দর্শন-প্রার্থিনী।

রাজগীরে পদার্পণের দিন থেকে একই বাড়ীতে আছি। মেলামেশা অন্তরঙ্গতার শেষ নেই। কিন্তু কোনও দিন কোনও কারণে মণিমালার ঘরে যাই নি। প্রতিবন্ধকতা কিছু নেই। তবুও যেন একটা সঙ্কোচের প্রশ্ন। এই সঙ্কোচ কেন তাও জানি না। কারণ হয়ত আমার অজ্ঞাত, মণিমালা এবং বিনয়বাবুর বিতর্কিত সম্বন্ধ। তাদের সহাবস্থানের ভিত্তিমূল কতদূর, আমি জানি না, মণিও কিছু বলে না। কিন্তু শকুন্তলা দেবীর মত ভক্তিমতী মহিলা যে অবস্থানকে স্বীকার করে নিয়েছেন, সেই অবস্থাকে তর্কের ঊর্দ্ধে বলে হয়ত স্বীকার করে নেওয়া উচিত। কিন্তু আমি এতদিনেও সহজভাবে গ্রহণ করতে পারিনি। আমার অন্তরের মধ্যে বিষ আছে কিনা জানি না। মণিকে দেখে দেখে কেবলই সিদ্ধান্ত নেবার চেষ্টা করেছি, এত সুন্দর কখনও অসুন্দর হতে পারে না। চাতক যখন আকণ্ঠ পিপাসা নিয়ে তার ক্ষুদ্র চঞ্চু বিস্ফারিত করে বারি বিন্দুর জন্য হাহাকার জানায়, তার মধ্যেও সুন্দর অসুন্দরের প্রশ্ন থাকে। চাতক কখনও নর্দমায় নেমে জল পান করে না। তার আবেদন আকাশের পথে নির্ঝরণীল জলবিন্দুর কাছে।

এইভাবে নানা কথা চিন্তা করতে করতে কক্ষান্তর থেকে মণিমালার ক্লান্ত আহ্বান এলো। সাড়া দিয়ে মাঝের দরজা দিয়ে এই সর্বপ্রথম মণির মণিকোঠায় প্রবেশ করলাম। বৃহৎ ঘরখানার একেবারে দুই প্রান্তে দুইটি শয্যা। ঘরে যেতেই মণি মৃদু হেসে বলল : এসো।

: আমার পাদ্য অর্ঘ্য আসনাদি কোথায় ?

: তুমি কি জীবানন্দ হলে নাকি ?

: যদি হই, তবে তুমি কি ষোড়শী না অলকা ?

: তার আগে তুমি আমাকে একটা কথার জবাব দাও। ব্যর্থ জীবনের হাহাকার নিয়ে জীবানন্দ যখন বলেছিল, "আমি বাঁচতে চাই—মানুষের মাঝখানে মানুষের মত বাঁচতে চাই। বাড়ী চাই, ঘর চাই, স্ত্রী চাই, সন্তান চাই—" তখন তার আবেদন ছিল কার কাছে ? অলকা ? না ষোড়শী ?

আমি : অলকা অথবা ষোড়শীর দেখা যদি পাই,—এবং যদি প্রশ্ন হয়, তবে উত্তরের কথা ভেবে দেখব।

: যাই হই না কেন, শরীর ভাল থাকলে যোগ্য পাদ্য, অর্ঘ্য, আসনাদির ব্যবস্থা করতাম। আমার যে আজ বড় সৌভাগ্য। আমার ঘরে আজ অমূল্য পায়ের ধুলো পড়েছে। শুধুই ভাবি—

"শুধু আসন পাতা হল আমার সারাটি দিন ধরে,
ঘরে হয়নি প্রদীপ জ্বালা, তারে ডাকব কেমন করে।"

: সন্তোষজনক প্রতিশ্রুতি থাকলে, সারা পৃথিবীর ধুলো পায়ে মেখে তোমার ঘরে ছড়িয়ে দিতে রাজী আছি। সে কথা থাক। শরীর কেমন ?

: ভাল।

: সে তো দেখতেই পাচ্ছি। খেয়েছ কি ?

: তুমি একটু আগে বোস। বলে নিজে একটু সরে জায়গাটা হাত দিয়ে পরিষ্কার করে দিল। আমি বসে বললাম : কি খেয়েছ ?

: যা হোক আমি খেয়েছি। এতক্ষণে এতো ব্যাকুল কেন ?

বলতেই তার মুখখানা একটু রক্তিমাভ হল। পড়ন্ত রোদের জন্য কিনা জানি না। আরশির অভাবে নিজের মুখখানাও দেখতে পারিনি। বললাম : আমি সব ব্যবস্থা করে এসেছিলাম। হোটেল থেকে খাবার আসতো। বাসায় এসে দেখলাম তুমি রান্না করে

রেখেছ। একবার ভেবেছিলাম, থাক পড়ে তোমার এই দেহ নিয়ে রান্না করা খাদ্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তোমার জীবন পণ করা এত কষ্টের অন্ন আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারলাম না।

: আমি জানতাম, তুমি খাবে। একটা কথা জান মামা, পুরুষ-মানুষের মুখে অন্ন তুলে দিতে কোন স্ত্রীলোক কষ্ট মনে করে না।

: সে কোন পুরুষ?

: আবার অহঙ্কার?

এতক্ষণ মনিমালা কাত হয়ে শুয়ে আমাব ডান হাতের মধ্যমার আংটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খেলা করছিল। সেটা ছেড়ে দিয়ে এবার পাশ ফিরে ছাদের দিকে মুখ করে শুলো। সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতি অঙ্গে অঙ্গে দোলায়িত রূপতরঙ্গে অবগাহনরত আমার প্রসন্ন দৃষ্টি নৃত্য করতে লাগল। বাক্যহীন আমার মুখের দিকে একদৃষ্টি তাকিয়ে. বোধহয় আমার দোলায়িত অন্তরতম প্রদেশ পর্যান্ত অনুসন্ধান করে, নিজের অঙ্গের বস্ত্রাদি একটু গুছিয়ে নিল।

আমি বললাম : আজ কি জানি কেন, কালিদাসের একটি শ্লোক মনে পড়ছে।

: যথা—

: "চিত্রে নিবেশ্য পরিকল্পিত সত্যযোগা
রূপোচ্চয়েন মনসা বিধিনা কৃতানু।
স্ত্রীরত্ন সৃষ্টিরূপরা প্রতিভাতি সা মে
ধাতুর্বিভুত্বমনুচিন্ত্য বপুশ্চ তস্যাঃ॥"

মণি : আমি তো আরতি নই মামা, একটু বুঝিয়ে দাও।

: তবে কি তুমি মিসেস আলুথালু?

: ও বেচারার কথা নিয়ে আর রসিকতা কোরো না, মামা।

: একটু মায়া পড়েছে? ঐ সঙ্গে আর কারুর ওপরে পড়েনি তো?

: কেন হিংসে হচ্ছে নাকি ? যাকগে, তুমি কালিদাস বল।

: রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে দেখে বলছেন যে সৃষ্টিকর্তা চিত্রপটে প্রথমে নিজের ইচ্ছেমত মূর্তি এঁকে নিয়ে তার মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন! না হয় ধ্যানস্থ হয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য-রাশি তিল তিল সংগ্রহ করে কল্পনায় মানসমূর্তি নির্মাণ করেছেন। তা না হলে এত রূপরাশির এক দেহে কি করে সমাবেশ হয়।

: ইংরেজিতে তোমরা একে বল "ফ্ল্যাটারী"।

: আর বাংলায় এটাকে বলে "বিনয়"।

মণিমালা একটু গম্ভীর হয়ে বলতে লাগল : সেই শিশুকাল থেকে রূপের কথা শুনতে শুনতে আমি নিজেই যেন নিজের মধ্যে অপরূপা হয়ে দিশেহারা হয়ে গেলাম। মা বলতেন মেয়ের আমার এত রূপ, যে ঘরে যাবে, ঘর আলো করবে। বসন্ত বাতাসের মৃদুদোলায় আন্দোলিত হৃদয়ে আরশির সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজেই নিজের রূপে মুগ্ধ হয়ে যেতাম। কিন্তু ভাবি, স্ত্রীলোকের এত রূপ কি ভাল ?

: আমার তো মনে হয় ভালই।

একটু উদাস সুরে মণি বলতে লাগল : আমিও একদিন তাই ভাবতাম। ধীবর কন্যা সত্যবতী অসামান্য রূপ আর তপ্ত যৌবনের বিনিময়ে হয়েছিল হস্তিনাপুরের রাজরাণী, কিন্তু পরাশরের আশীর্বাদধন্যা ঐ নারীর ললাটেও নির্বন্ধ ছিল শান্তনুর মত বিগত-যৌবন স্বামী।

: কিন্তু ধীবরকন্যার রূপের আশীর্বাদে পৃথিবীর বুকে জন্ম নিল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস। আর সৃষ্টি হল পৃথিবীর অমর মহাকাব্য "মহাভারত"।

: পুত্র-গরবিনী সত্যবতী, পিতৃদত্ত চিরযৌবনবতী রূপ আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে হস্তিনাপুরের রাজছত্রছায়ায় বৈধব্য যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে থাকল। কোথায় গেল স্বামী, কোথায় গেল পুত্র, সব মিথ্যে

হয়ে গেল। চিরসত্য হয়ে থাকল, সত্যবতীর দেহে অনন্ত যৌবন।

: হস্তিনাপুরের রাজছত্রছায়াই বল, আর শান্তনুর রাজকীয় বৈভবই বল, বঞ্চিত দেবব্রতের করুণ ইতিহাস তো ভুললে চলবে না। তাছাড়া পদস্খলনের অনুতাপে বিদ্ধ পরাশর কৌমার্য্যের বিনিময়ে যে আশীর্বাদ দান করেছিলেন, তা অভিশাপে রূপান্তরিত হতে বাধ্য। কিন্তু তুমি এই সব কাহিনী বিশ্বাস কর মণি?

: বিশ্বাস করি বা না করি তাতে কিছু এসে যায় না। এমন ঘটনা সংসারে তো ঘটে।

: আমি তো দেখি না।

: তুমি যা দেখ না তা সত্যি নয়, এটা লজিক নয়। সব ঘটনা দেখবার জন্য হাত ধরে ধরে কে তোমাকে নিয়ে যাচ্ছে বল? আমার জীবনের ঘটনাই কি তুমি জান?

: যতটুকু দেখেছি, ততটুকু জানি। যা জানি না তার জন্য কৌতূহল নেই।

: আমার দেখেছ অনেকখানি, কিন্তু জান সামান্য। যাও বা জান, তাও না-জানার চেষ্টা কর। আমি যে আগুনের ফুলকি আঁচলে বেঁধে বসে আছি, জান?" আমি নীরবে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। সে বলতে লাগল : সেই আগুনের ফুলকিটা ঝেড়ে ফেলতে না পারলে, কোনদিন জ্বলে উঠে আমাকে তো পুড়িয়ে মারবেই, আরও কি সর্ব্বনাশ করবে কে জানে?

: তোমার শরীর অসুস্থ। বেশী কথা বলে কাজ নেই।

: ঠিকই বলেছ। মাথায় বেশ যন্ত্রণা হচ্ছে।

: কথা বোলো না। চুপ করে শুয়ে থাক।

আমি আমার ডানহাতখানা মণিমালার ঘনকুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশ রাশির নীচে কুন্দশুভ্র অপ্রশস্ত ললাটের ওপর রাখতেই সে "আঃ" বলে একটি শব্দ করে চোখ বুজে কিছুক্ষণ চুপ করে শুয়ে থেকে বলল : কথা না বলে কি করব? এত আনন্দ কি চেপে রাখা

যায়? মনে হচ্ছে স্বর্গের অমিয় ধারা আমার মাথায় নেমে এসেছে। এত সৌভাগ্য আমি কোথায় রাখব? আমার মনে হচ্ছে, চিরদিন আমি এমনিই অসুস্থ থাকি আর তুমি আমার পাশে বসে থাক।

: শুধু বসে থাকলে কি হবে, মাথায় হাত রাখতে হবে না?

: মাথা কি আমার আছে? তুমি তো অনেক দিন আগে শেষ করেছ।

: শেষ করেছি কোথায়? এই তো হাত দিয়ে আছি।

: তুমি জান না। কিন্তু শেষ করেছ। সেদিন রেগে গিয়ে বলেছিলাম না, যেটা তুমি দেখছ, এটা কবন্ধ? সত্যিই তাই।

ওর কপালের শিরাগুলো দপদপ করছিল। একটু টিপে ধরতেই বলল : অত কষ্ট করতে হবে না। একটু ছুঁয়ে থাকলেই হবে। বলে নিজের হাতখানা আমার হাতের ওপর রেখে আবার বলতে লাগল : তোমার বন্ধু, আমার কাবেরামামা, সজ্ঞানে আমার একটি উপকার করেছে। পুনঃ পুনঃ অনুরোধের পর সত্যি সত্যি একদিন তোমাকে ধরে নিয়ে এলো। সে যে আমার কি আনন্দের দিন।

: তারপর বহুদিন বহুভাবে তোমাকে দর্শন দিয়েছি এবং তোমার দর্শন পেয়েছি।

: তবুও মনে হচ্ছে এখনও অনেক বাকী।

: যা দেখেছ আর যা পেয়েছ, তার ভালমন্দ বিচারের ভার তোমার কাছে। যা প্রাপ্য বলে আশা করে বসে আছ, সম্ভাবনাময় সেই প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাই প্রকৃত আনন্দ।

: তোমার ইস্কুলের ছাত্ররা কাকের মত বেলগাছের দিকে হাঁ করে আনন্দে তাকিয়ে থাকুক। আমার অমন আনন্দে দরকার নেই।

: প্রাপ্তির চরম প্রাচুর্য্যের মধ্যেও মানুষের প্রকৃত আনন্দ নেই। আনন্দ যা আছে তা মানুষের অনাগত দিনের রহস্তময় হাতছানির মধ্যে।

: আর অনাগত দিনের রহস্য-প্রতীক্ষার ব্যর্থতায় যার বুকে অহর্নিশি কালবোশেখির ঝড়? হাত দিয়ে দেখ।

কপাল থেকে তুলে এনে আমার হাতখানা তার তরঙ্গময় বুকের ওপরে ছেড়ে দিল। ঈশদুষ্ণ সুকোমল স্পর্শে আমি ঝড়ের তাণ্ডব অনুভব করলাম। মণি বলল : একটা কথা শোন।

আমি বিকৃতস্বরে বললাম : বল।

: কাছে এসো। কানে কানে বলব।

: বল-না! এখানে তো কেউ নেই।

: শোন-না! তুমি বড় অবাধ্য।

আমার প্রতি স্নায়ুতে, তন্ত্রীতে তখন চরম আলোড়নের অনুভূতি। নিজের বিব্রত মুখখানা মণির মুখের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতেই, সদর দরজায় করাঘাত হল। হঠাৎ বিদ্যুতের আলোকে চমকিত হয়ে মানুষ যেমন বজ্রপাতের শব্দের প্রতীক্ষায় থাকে তেমনি সকল শ্রবণশক্তিকে সদর দরজার দিকে কেন্দ্রীভূত করে শকুন্তলাদির কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। আমি উঠবার চেষ্টা করতেই দেখি আমার দুই বাহু মণিমালার দুই দৃঢ়মুষ্টিতে আবদ্ধ।

আমি বললাম : ছেড়ে দাও। শকুন্তলাদি এসেছেন। দরজা খুলে দিই।

ঊর্দ্ধদিকে ছুঁড়ে দেবার ভঙ্গীতে আমার বাহুযুগল ছেড়ে দিয়ে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে মণিমালা বলে উঠল : শেষকালে দিদিমণি পর্য্যন্ত আমার উৎসবের বাতি ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিতে এলেন। রিক্তা বসুমতীর নিকষ কালো অন্ধকারের মধ্যে বিন্দুমাত্র আলোর রেখা পর্য্যন্ত সকলের নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্রে নিভে যাবে।

আমি আস্তে আস্তে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে ভাবলাম, বিধাতার বিধান বুঝি এমনই আশীর্বাদের মত নেমে আসে। মুহূর্তের ব্যতিক্রমে মানুষের সমগ্র জীবন পদ্ধতি যাতে পর্যুদস্ত না হয়—সেজন্য সদাজাগ্রত প্রহরীর নীরব অন্তহীন ব্রতনিষ্ঠা।

শকুন্তলাদি মণিমালার জন্য ডাক্তার নিয়ে এসেছিলেন। মনে হয়, শিশি বোতল নিয়ে কুণ্ডে যাবার পথে বিনয়বাবুর নির্দেশ। আমি দিদির কাছে বড়ই বিড়ম্বিত বোধ করছিলাম। তাঁদের এগিয়ে দিতে এসে ডাক্তারের নির্দেশ জেনে নিয়ে এবার পুনরায় ঘরে ফেরার পালা। সেখানে নিঃসঙ্গ পীড়িত মণিমালা। মনের মধ্যে সহস্র দ্বিধা। নির্জন গৃহকোণে মণিমালার একান্ত সান্নিধ্য যতই কাম্য হোক, নিতান্তই উৎসাহের অভাব বোধ করতে লাগলাম। এরই মধ্যে হঠাৎ দেখি ক্লান্ত চরণে বিনয়বাবু গৃহে ফিরে চলেছেন। ঘরে ফেরার হাত থেকে অব্যাহতি পেয়ে বেঁচে গেলাম। ডাক্তারের নির্দেশ সব বিনয়বাবুকে বুঝিয়ে দিয়ে আমি কুণ্ডের দিকে এগিয়ে চললাম।

শরতের প্রায় শেষ। রাজগৃহের সন্ধ্যায় বেশ ঠাণ্ডার ভাব। কিন্তু উত্তেজিত দেহমনে এই শীতলভাব ভালই লাগছিল। উত্তপ্ত মস্তিষ্কে নানা কথা, নানা চিত্র এসে ভীড় করতে লাগল। ছাত্র জীবনে কুচবিহারে সেই নিরুদ্বেগ নিস্তরঙ্গ জীবনে একদিন কাবেরীবান্ধবের অনুরোধে মণিমালার সাহচর্যে এসে, তার অন্তহীন রূপের মধ্যে থেকে একটা অব্যক্ত আবেদনের আনন্দ-তরঙ্গ এসে দোলা লাগিয়েছিল! আত্মীয়-অনাত্মীয় প্রায় সকলের কাছ থেকে চিরদিন ধরে সহানুভূতির অনুকম্পায় পীড়িত দেহমন এই তরঙ্গ বিক্ষোভে একটা প্রচ্ছন্ন উল্লাস লাভ করে। এদিকে যোগানন্দবাবুর অনায়াসলব্ধ সহস্র ভোগবিলাসের অপরিমিত উপকরণের মধ্যে মণিমালাকেও একটা ঠাঁই দিয়েছিল! কিন্তু সেই সঙ্কীর্ণ স্থানে রুদ্ধনিঃশ্বাস মণিমালা মুক্তির পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে। তারই মাঝখানে উপস্থিত হলাম আমি।

আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেছি। ডানদিকে শত্রু বিমর্দন কামনায় অজাতশত্রু গড়, বাঁ দিকে ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধমন্দির, সরকারী ডরমিটারী, ইউথ হোস্টেল, জাপানী বৌদ্ধমন্দির পার হয়ে ডানদিকে বেনুবন অতিক্রম করে, কখন যে সরকারী বাজার পেছনে ফেলে সিঁড়ি বেয়ে ব্রহ্মকুণ্ডের চত্বরে এসে উপস্থিত হয়েছি, তা খেয়াল করিনি।

নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে কুণ্ডের বাঁধানো চত্বরের ওপর দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ বহুদিন অব্যবহৃত, ছেলেবেলায় ডাকা, প্রায় ভুলে-যাওয়া আমার নাম ধরে কে ডেকে উঠল। সম্বোধন আমাকে নয় মনে করে এগিয়েই যাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি আমার যাত্রাপথ অবরোধ করে এক সুবেশ ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে মৃদুমৃদু হাসছেন। তিনি বললেন: পালাবার চেষ্টা করছিস কেন? আমি কি ভূত?

: ভূত দেখে পালাবার বয়স অতিক্রম করেছি। তার জন্য নয়। তবে খুব কষ্টকর হলেও, মনে হয় চিনেছি। কৃষ্ণপদ না?

: অত ভদ্রলোক বানাবার চেষ্টা করছিস কেন? বল্—কেষ্ট।

বৃন্দাবনে বাস মোর মথুরায় রাজা।
দ্বারকায় গিয়ে আমি একেবারে খাজা॥

সে কাছে আসতেই দেখলাম তার অঙ্গে অর্জিত সকল সুগন্ধকে অতিক্রম করে একটি গন্ধ বিশেষ প্রকট। সে বলল: সরি, তোর বোধহয় অসুবিধে হচ্ছে। তুই কি এখনও সেই রকম আছিস না-কি? একটু আদিরসের কথাটথা বললেই রেগে আগুন হতিস?

: তুই বল-না। তোর পেটে যত আদিরস, অন্তরস আছে, সব ঢেলে দে।

: আদিরস একেবারে অস্তে নেমে এসে চৈত্রের দাবদাহে শুকনো খটখটে। রসের নামগন্ধ নেই।

: তুই কবে এসেছিস? এই অশ্বত্থ গাছের তলায় অন্ধকারে বসে বসে কি করছিলি?

: সকলে কাপড়-টাপড় ছাড়ছে, তাই দেখছি।

: সে কি রে?

: কি করব? স্নান করা দেখে অরুচি ধরে গেল, তাই কাপড়-ছাড়া দেখছি।

: তুই কি এই স্নান-করা আর কাপড়-ছাড়া দেখবার জন্যেই এখানে এসেছিস না কি?

: তা ঠিক নয়। এটা আমার এ্যাপ্রেনটিস্‌সিপ বলতে পারিস।

: তার মানে?

: আমার ফুলমামা সারাজীবন ধরে যত বিষপান করেছেন—নীলকণ্ঠ তো নন, তাই এখন সর্ব অঙ্গ ফুটে বেরুচ্ছে। নানারূপ চর্মরোগ, বাতব্যাধি ইত্যাদিতে জরাজীর্ণ দেহটার ভার পড়ল আমার ওপর। তাই আপত্তি না করে নিয়ে এলাম। ভাবলাম এ্যাপ্রেনটিস্‌সিপটা শেষ করে রাখি।

: কিসের এ্যাপ্রেনটিস্‌?

: পূর্বপুরুষদের একমাত্র বংশধর আমার পিতৃদেব নিত্যনূতন উদ্ভাবনী শক্তি দ্বারা আবিষ্কৃত বিভিন্ন পন্থায় অর্থ নির্গমন করেও কলির পরমায়ুর স্বল্পতার দোষে সব নিঃশেষ করতে পারলেন না। তিনি অমরত্ব ধামে প্রস্থানের সময় যা রেখে গেলেন, তা এই তস্য একমাত্র নন্দদুলালকে জাহান্নামে পাঠাবার পক্ষে যথেষ্ট। তাই ভাবলাম জাহান্নামের পান্থনিবাসের পথটা চিনে রাখি।

আমি বললাম: তুই কি বলতে চাস, এখানে যারা আসে তারা সকলেই জাহান্নামের পান্থশালায় আসে?

: তুই তো লজিকের খুব ভাল ছাত্র ছিলি। এতবড় ফ্যালাসি করলি কি করে? জাহান্নামে যারা যাবে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ এখানে আসে। তা বলে যারা আসে, তারা সকলেই জাহান্নামের পথিক হবে কেন?

কৃষ্ণপদর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তার ভবিষ্যৎ বাণী নেহাৎ মিথ্যে নয়। প্রসাধনের উগ্রতা সত্ত্বেও তার লাবণ্যহীন সর্বদেহে চরম অত্যাচার আর আত্ম নিগ্রহের নিষ্ঠুর চিহ্ন বর্তমান। ছাত্রাবস্থায় প্রথম যৌবনের নবাগত লালসার আহ্বান তাকে কোন এক অন্ধকার বিশ্বের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছে, তা জানি। আমরা যখন কুচবিহারে গেলাম, তখন কৃষ্ণপদ প্রবল প্রতাপে হোষ্টেলে থেকে কলেজের খাতায় নাম বজায় রেখেছে। তারপর 'এনিবডি মে কাম এ্যাণ্ড এনিবডি মে গো, বাট কৃষ্ণপদ রিমেন্স ফরেভারের' মত অখণ্ড প্রতাপে সকলের অভিভাবকস্বরূপ বর্তমান থাকল। তার ব্রতনিষ্ঠা কবে শেষ হয়েছে জানি না। আমি বললাম: বিয়ে-থা করেছিস?

: না। হিসেব করে দেখলাম, পিতৃদত্ত এবং মাতুলদত্ত সঙ্গতি আমাকে উচ্ছন্নে পাঠাবার পরে, পরবর্তী পুরুষকে আমার অনুগামী করাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তা যাক্। তোর খবর কি? চাকরী-বাকরী ভালোই একটা করছিস নিশ্চয়ই?

: ভালমন্দ জানি না, একটা কিছু করছি।

: বিয়ে-থা?

: আমাদের মত ছাপোষা জীবনে ওটা ছাড়া কখনও চলে?

: ভালই হয়েছে। একদিন শাঁখা ধোওয়া জলের মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খাব। নেমন্তন্ন করিস ভাই। ভয় নেই। তোর বৌয়ের দিকে নজর দেব না। সে সব দিন আর নেই।

: এখন কি করছিস? সে সব দিন তো নেই বললি।

: এখন আপাততঃ কাজের মধ্যে এই অশ্বত্থ গাছের নীচে, আধো আলো, আধো অন্ধকারে বসে সিক্ত-বসনা সুন্দরী-অসুন্দরীদের দর্শন করছি।

: শুধুই দর্শন? তাও আবৃতা নারীদের?

: হ্যাঁ ভাই। অনাবৃতা নারী-অঙ্গে অরুচি ধরে গেছে। তাই

স্বল্পাবৃতার সন্ধানে ঘুরে বেড়াই।

কেষ্ট বলল : ওসব কথা যাক্। কবে নেমন্তন্ন করবি বল ? মা গত হবার পরে শাঁখা ধোওয়া জলে মাছের ঝোল খাই নি রে!

: তা আমার বাড়ীর মাছের ঝোলে যদি শাঁখা ধোওয়া জল না পড়ে।

: সে কি। বৌ কি তোকে রান্না করে দেয় না ? নাকি বৌ সঙ্গে নেই, নাকি শাঁখা ছাড়া বৌ বিয়ে করেছিস ?

: ধর, তাই যদি করে থাকি ?

কৃষ্ণপদ তার দৃষ্টিটা আমার দিকে নিবদ্ধ করে কি যেন ভেবে নিয়ে বলল : সত্যি ? আমি কিন্তু ভাই ঐ রকমই একটু শুনেছিলাম।

আমার চতুর্দিকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আবর্তিত হয়ে উঠল! পায়ের নীচে অন্ধকারে বাঁধানো চত্বরটা ভূমিকম্পের দোলায় কেঁপে উঠল। মৃদুমন্দ বাতাসে সঞ্চরণশীল অশ্বত্থপাতার ফাঁকে ফাঁকে নির্গলিত কম্পমান আলোর রেখা, চত্বরের ওপরে সেই রহস্যময় শঙ্খলিপির ভাষায় কী ইতিহাস রচনা করে চলেছে। তার পাঠোদ্ধার করবার সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায়, কোনও মতে টলতে টলতে দু এক পা এগিয়ে যেয়ে সিঁড়ির পাশে উঁচু দেওয়ালের গায়ে হাত রেখে আত্মরক্ষা করলাম।

কেষ্ট বলল : কি রে, তোর মৃগীরোগ আছে নাকি ?

আমি : মাঝে মাঝে ওরকম হয়।

: দাঁড়া, আমি জল নিয়ে আসি।

: কিছু লাগবে না। ভাল হয়ে গেছি। তাছাড়া এখানে তো সবই গরম জল।

: এই ব্রহ্মকুণ্ডের জলে সব গুণ আছে। যদি ঠাণ্ডা গুণের দরকার হয়, তাও পাবে। আবার গরম গুণের দরকার হলে তো কথাই নেই।

: ঠাণ্ডা গুণ কি করে পাব ?

: আমাদের সেই সর্বরোগহরা গোবিন্দবাবাজীর মাদুলির মত। মাত্র সোয়া পাঁচ আনা পয়সার বিনিময়ে সেই মন্ত্রঃপূত মাদুলি লালসুতোয় বেঁধে ধারণ করলে, তিন রাত্রির মধ্যে যে কোন রমণী—তা সে যত সীতা সাবিত্রী হোক—বাপের আশ্রয়, স্বামীর বাহুডোর ছিন্ন করে, এসে হাজির হবে। আবার প্রয়োজন হলে একই মাদুলির প্রভাবে, পতিপ্রাণা সহধর্মিণীও অবাঞ্ছিতা হলে, তিন দিনের মধ্যে গৃহত্যাগ করবে।

আমি বললাম : তোর কি রমণী প্রসঙ্গ ছাড়া কথা নেই ?

: কি করে থাকবে ভাই। জীবনব্যাপী সাধনার ধন দেহের কোষে কোষে আবদ্ধ হয়ে আছে। সে কথা যাক্। এখানে আসবার আগে ফুলমামা রাজগীর বিষয়ে আমাকে অনেক জ্ঞানদান করেছেন কি না, তাই জলের কথা বললাম।

প্রসঙ্গান্তর দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে ফুলমামার কাছ থেকে তার অর্জিত জ্ঞান বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। কৃষ্ণপদ জানল, কুণ্ডের উষ্ণ জলে স্নান করলে, অতি কৃশকায় ব্যক্তি অতি শীঘ্র শরীরে মেদসঞ্চার করবে। আবার কোনও মেদবহুল ব্যক্তি অচিরে অনাবশ্যক চর্বির হাত থেকে মুক্তি পাবে। কেষ্ট বলল : ফুলমামা বলেছিলেন, তোর ফুলমামীমা বেঁচে থাকলে সঙ্গে নিয়ে যেতাম।

আমি : তোর ফুলমামীমা বুঝি খুব রোগা ছিলেন ?

: বালাই, বালাই, ষাট, ষাট। সকল শত্রুপক্ষের বদনে ভস্ম নিক্ষেপ করে সাড়ে তিন মণ ওজনের দেহখানা নিয়ে স্থিতপ্রজ্ঞ হয়েছিলেন। কোনও দিন রাত্রে ঐ দেহখানা, তরল প্রভাবে অচৈতন্য ফুলমামার কাছে নিয়ে যাবার দরকার হ'লে, তিনি লোকজন ডাকাডাকি করতেন।

: তোর ফুলমামার দেহ বুঝি মামীর কাছে যেত না ?

: না। কিন্তু ফুলমামীমার ভরসা ছিল, গোবিন্দবাবাজীর

মাদুলিটি পুরো সাড়ে তিন গজ লাল সুতোয় বাম বাহুতে বেঁধে, ঐরূপ নৈশ অভিসারের দ্বারা তিনি ফুলমামার মতিগতির পরিবর্তন করবেন।

আমি : তা তোর ফুলমামীমার মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছিল ?

কেষ্ট : তা হ'লে আর যোগানন্দের সংসারে আগুন লাগল কেন? কৃষ্ণপদর ফুলমামা কে আমি জানি না। প্রজ্জ্বলিত-অগ্নি-সংসারের মালিক এ কোন্ যোগানন্দ তাই বা কে জানে। অশ্বত্থ-গাছের নীচে দোলায়িত আলো-আঁধারে এ আবার কী দুর্জ্ঞেয় রহস্যের ইতিহাসের পূর্বাভাষ?

আহারে প্রবৃত্ত কোনও ব্যক্তি নিকটে কোনও ঘৃণিত কীটের সঞ্চরণ দেখলে, যেমন সে দিকে তাকাতেও পারে না অথচ সেটাকে দূরীভূত না করা পর্য্যন্ত তার গতিপথ নিরীক্ষণ না করেও পারে না, তেমনই অবস্থার মধ্যে আমি কেষ্টর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। অবস্থাটা এমন, যেন চলার পথের শেষ সীমায় একেবারে খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছি। ইচ্ছে করলে কৃষ্ণপদ পায়ের নীচের পাথরটা সরিয়ে দিয়ে আমাকে অন্তহীন গহ্বরে নিক্ষেপ করতে পারে।

বহু দূরাগত ধ্বনির মত একটা কণ্ঠস্বর আমার গলা দিয়ে বেরিয়ে এলো : কুণ্ডের জলে আর কী কী গুণ আছে রে ?

কেষ্ট : ফুলমামীমার কাহিনী তো নন্দন কাননে পারিজাত হয়ে ফুটে থাকল। এই মাটির পৃথিবীতে আচ্ছন্ন করে রেখেছে চৈত্র-দিনের ঝরাপাতা। সে কাহিনী থাক্!

একটু চুপ করে থেকে বলল : তোর মুখখানা যে দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায় ছাই-এর মত সাদা হয়ে গেল। আমি বোধহয় তোকে অজান্তে ব্যথা দিয়ে ফেলেছি। যোগানন্দের সংসারে তোর ঘনিষ্ঠতার কথা আমার মনেই ছিল না। সরি, আমি কুণ্ডের কথাই বলি। ফুলমামার কৃপায় আমি ও ব্যাপারে একটা অথরিটি বলতে পারিস।

[সতের]

ফুল মামীমার সকল আয়োজন নষ্ট করে দিয়ে, যোগানন্দর সংসারে আগুন লেগেছিল। এদিকে যোগানন্দর সংসারের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতার কথা কৃষ্ণপদ জানে। তাই করুণা করে সে প্রসঙ্গ বন্ধ করল। আমি বেঁচে গেলাম। গর্তের মধ্যে সাপই থাকুক, নিশ্চিন্ত মনে অবস্থান করুক। কৃষ্ণপদ কুণ্ডের প্রসঙ্গে ফিরে এসে বলল: স্যার জে, সি, অর্থাৎ আচার্য্য জগদীশচন্দ্র পর্য্যন্ত এই উষ্ণ জলের জনপ্রিয়তা দেখে একে পরীক্ষা করেছিলেন। অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে একমত হয়ে তিনি ঘোষণা করেছিলেন—এই জলে রেডিয়াম, আয়রণ, কপার সালফেট, নাইট্রেটস্ এবং ক্লোরিন আছে।

: তুই আবার এত রসায়নশাস্ত্র কবে আয়ত্ব করলি ?

: ফুলমামার কৃপায় ঐ এ্যাপ্রেনটিস্‌সিপ।

: তা ঐ সব গুণ থাকলে বুঝি জল গরম হয় ?

: জল গরম কেন, তা কোনও বৈজ্ঞানিক বলতে পারেনি। কিন্তু আমি বলতে পারি।

: তোকে আমি নোবেল প্রাইজ দেব। তুই বল্।

: মায়ের বুক থেকে যে ক্ষীরধারা আসে, তা গরম। সুতরাং ধরিত্রীর বুক থেকে ক্ষরিত জলধারা গরম হবে না কেন ?

: তোর উপমাটি স্বর্গীয়।

: হবে না ? আমি মায়ের একমাত্র নন্দদুলাল, অনেক বড় হয়েও সকল নিষেধ অগ্রাহ্য করে মাকে কত বিরক্ত যে করেছি, তা আমার বেশ মনে আছে।

কৃষ্ণপদর দৃষ্টিটা হঠাৎ উদাস হয়ে গেল। বুঝতে অসুবিধা হল

না, জীবনের সহস্র উপাচার যে নিষ্ঠুরভাবে পদদলিত করেছে, তারই অন্তরে কণ্টকে সমাকীর্ণ শতদলের মত, মাতৃস্মৃতি বিকশিত হয়ে আছে। কৃষ্ণপদর মুখখানাকে মুহূর্তের জন্য, জীবনে এই প্রথম বড়ই পবিত্র বলে মনে হল।

আমি বললাম : তোর মায়ের কথা খুব মনে হয়, নারে কেষ্ট ?

: ও সব কথা ছেড়ে দে। তারপর শোন্। এই জল রেডিও এ্যাকটিভ। এটা জনশ্রুতি নয়, ফুলমামার ধৃতি। ভারত সরকারের এটমিক এনার্জি বিভাগ নাকি ঘোষণা করেছে—এই জল বাত, হাঁপানি, চর্মরোগ, ডিসপেপসিয়ার পক্ষে খুব উপকারী।

: ভারত সরকার এত কথা কোথায় বলেছেন ?

: সে সব কাগজপত্র ফুলমামার কাছে আছে। তিনি নোটিফিকেশান্ নম্বর পর্য্যন্ত বলে দিতে পারেন। তাঁর রোগগুলোর চিকিৎসা হতে পারে ছুটো জায়গায়।

: যথা—

কেষ্ট : হয় এই রাজগীরের কুণ্ডে, নতুবা কৃতান্ত নামক ভদ্রলোকের সর্বরোগহরা হাসপাতালে। কিন্তু তিনি এখানকার চিকিৎসা শেষ না করে সে হাসপাতালে যেতে চান না।

: সে হাসপাতালে ভাই, ইচ্ছে করলেই কি যাওয়া যায় ?

: কেওরাতলার খরচা বাবদ বাইশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা যোগাড় করতে পারলেই, সে হাসপাতালের দ্বার উন্মুক্ত।

আমি বললাম : এই কুণ্ডকেই ব্রহ্মকুণ্ড বলে। আবার সপ্তর্ষি কুণ্ডও বলে। কেন বলে, কে জানে ?

কেষ্ট : এই পাহাড়টার নাম বৈভার পাহাড়। পাহাড়ে ওঠবার সিঁড়ি আছে। সেই সিঁড়ির দিকে যেতে ঐ যে কুণ্ডটা দেখতে পাচ্ছিস, ঐটে মেয়েদের জন্য। সেদিন আমি ভুল করে ওটার মধ্যে ঢুকে পড়েছিলাম।

: ভুল করে, না না-জানার ভান করে ?

: মিথ্যে কথা বলা পাপ, আর পাপ আমার সয় না। সুতরাং তোর কথা আমি ঠিক অস্বীকার করলাম না।

: যত পাপ, সব কি ঐ সত্য-মিথ্যে বলার মধ্যে ? জেনেশুনে যেটা করলি. সেটার মধ্যে কি কোন পাপ নেই ?

: আছে বোধহয়। যদি নাই থাকবে, তবে আমার সর্বাঙ্গে এমন প্রায়শ্চিত্ত ফুটে বেরুবে কেন ? দেখনা, আমার কি অকাল-বার্ধক্য। কুণ্ডে স্নান করে উঠেই একটা মেক্‌আপ দিয়েছি। মেক্‌আপ না দিলে আমার মুখের দিকে তুই তাকাতে পারবি না। আমার এই ব্যাগটার মধ্যে মেয়েদের মত সব মেক্‌-আপ-এর ব্যবস্থা আছে।

: কেন নিজের সর্বনাশ নিজে এমনভাবে করিস ভাই ?

: ওসব কথা ছাড়্। চল্, কুণ্ডটা দেখে আসি। ভেরী ইন্টারেষ্টিং।

: কুণ্ড আমি দেখেছি। ও আমার কাছে ভাল লাগে না।

: বলিস কি ? ভেরী ইন্টারেষ্টিং। মেয়েরা সব স্নান করে। আর স্নানের সময় ওদের অত খুত্‌খুতুনি থাকে না।

জোর করে আমার জুতো খোলাল এবং অনেকগুলো সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম একটা আয়তক্ষেত্রে। বেষ্ট বলল : এই ত্যাখ পশ্চিম-দিকে প্রাচীরের গায়ে পাঁচটি জলের ধারা আর পূর্ব দিকে দুটি। এই হ'ল সপ্তধারা।

: এই জন্যই কি এর নাম সপ্তর্ষিকুণ্ড ?

: ঐ ভূগর্ভস্থ মন্দিরে সাতটি মূর্তি আছে। তাদের নাম গৌতম, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, জামদগ্ন্য, দুর্বাসা, বশিষ্ঠ এবং পরাশর।

: মহাভারতে শুনেছি এই উষ্ণ প্রস্রবনের কথা আছে। তাতে নাকি এদের নাম "তপোদ"। পাণ্ডারা বলেন—ব্রহ্মার তপস্যার ফলে এগুলির উদ্ভব হয়েছিল।

: ও সব দেবদেবীর মহিমা জানি না ভাই। যেখানেই যাই,

এত ঠাকুর দেবতার ভীড় দেখে, নিরালা একটু পাপকার্য্যের যোগ্যস্থান পাই না।

: আর এঁরা সব চিত্রগুপ্তের গুপ্তচর। সকলের সব কথা গোপনে জেনে নিয়ে ঐ ভদ্রলোকের পাকা খাতায় তুলে দেয়।

: তাই দেখে দেখে আমাদের পারলৌকিক ব্যবস্থা। আমি গোবিন্দবাবাজির আখড়ায় দেখেছি, সচিত্র বিবরণ দেওয়া আছে, কোন্ পাপে কোন্ শাস্তি। অন্ধকারে অশ্বত্থতলায় বসে নয়নরঞ্জনের জন্য কি শাস্তির বিধান আছে, জানি না।

: মনু যখন সংহিতা রচনা করছিলেন, তখন এরূপ কোন অপরাধের প্রচলন ছিল না। তাই বোধ হয় কোনও বিধান বর্তমানে নেই। সুতরাং দেবতাদের লোকসভায় যতদিন সংবিধান পরিবর্তন না হচ্ছে, ততদিন তুই নির্ভয়ে অশ্বত্থগাছের তলায় অন্ধকারে বসে বসে নয়নরঞ্জন করতে থাক্।

: আর যদি দেবতাদের মধ্যে আমার সমগোত্রীয় কেউ থাকেন, তবে কোন কালেই নতুন বিধান রচিত হবে না।

দক্ষিণ দিকে তাকাতেই দেখি, একটি সিঁড়ি অনেক নীচে নেমে গিয়ে বড় একটা চৌবাচ্চার মত জলাশয়ে শেষ হয়েছে। সেখানে ঐ সন্ধ্যাবেলাতেও গা ঘেঁষাঘেষি করে অনেক নারী-পুরুষ আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে আছে। মনে মনে হিসেব করে দেখলাম, প্রথম স্তরে চত্বরে নেমে আসতে অনেকগুলো সিঁড়ি নেমে এসেছি। পুনরায় ঐ জলাশয়ে নামতে হলে আমরা সমতল ভূমি থেকে প্রায় পাতালেই প্রবেশ করব।

এরই মধ্যে কেষ্ট বলল : চল্, কুণ্ডের দিকে যাই। ওখানে ফুলমামাকে দেখতে পাবি।

: তা যাচ্ছি। কিন্তু ছোট একটা জলাশয়ে রোজ যদি এতগুলো লোক রোগ ব্যাধি নিয়ে স্নান করে, তবে জল দূষিত হবে না?

নীচে যেতে যেতে কৃষ্ণপদ তার দৃষ্টিকে সম্মুখ দিকে নিবদ্ধ করে

রেখেছে। কি অন্বেষণ করে কে জানে? আমি বললাম: কী খুঁজছিস? পড়ে যাবি যে।

কেষ্ট হেসে বলল: রাস পরিমণ্ডল দেখে কৃষ্ণের নেশা ধরেছে। তা যাক্। এখানকার জল কিন্তু আবদ্ধ নয়। তলদেশ দিয়ে যাতায়াতের পথ আছে। একদিক দিয়ে জল প্রবেশ করে। অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। এই আবর্তনের মধ্যে দিয়ে এখানকার জল তার পবিত্রতা বজায় রাখে।

: কিন্তু এখানকার ব্যবস্থা বড়ই অশালীন। মহিলাদের পক্ষে বিশেষ অসুবিধে।

: অসুবিধে হলে, তারা আসে কেন?

: আসে হয়ত প্রয়োজনে।

: আমিও তো ভাই প্রয়োজনেই আসি আর স্নান করি। কিন্তু সেই প্রয়োজনের চরিত্র-বিচার না করে, ঐ আমার ফুলমামাকে দেখ।

দেখলাম এক গৌরবর্ণ স্থূলকায় পুরুষ কোমর পর্যান্ত জলে ডুবিয়ে সিঁড়ির ওপর বসে আছেন। বয়স প্রায় বৃদ্ধই বলা যায়। এদিকে ওদিকে কি হচ্ছে না হচ্ছে—কোনও দিকে দৃষ্টি নেই। মনে হয় একদিন আয়ত দৃষ্টিতে সমগ্র বিশ্ব দেখে নিয়ে, সে পাট চুকিয়ে দিয়ে দেখার পালা সাঙ্গ করেছেন। এখন মুদ্রিত নয়নে কুণ্ডের উষ্ণ জলে প্রতিবিম্বিত জগৎ-সংসার অনুভব করছেন।

কেষ্ট বলল: দেখেছিস্? বাঁ কানের পেছন দিকটা লক্ষ্য করে ছাখ্। একটা জড়ুল চিহ্ন আছে। ঐ মাষ্টারমশায়-এর কানের পেছনে এমনি একটা জড়ুল আছে। আবার যোগানন্দের বৌএরও আছে।

আমি হঠাৎ চিৎকার করে উঠলাম: যোগানন্দের কোন্ বৌ? মাষ্টারমশায়ই বা কে?

কৃষ্ণপদ আমার দিকে তাকিয়ে একটু একটু হাসতে থাকল।

মনে হ'ল, রহস্য-দুর্গের চাবিকাঠি হাতে নিয়ে পৃথিবীর এই নিষ্ঠুরতম মানব-সন্তান যেন আমাকে পথ ভুলিয়ে এই পাতালপুরীর মধ্যে টেনে এনেছে। এখনই হয়ত দুর্গের দ্বার খুলে আমাকে ঠেলে দিয়ে পুনরায় রুদ্ধদ্বারে তালা বন্ধ করবে। সেখানে আলো নেই, বাতাস নেই। আমার যেন দম বন্ধ হয়ে আসছিল। চারদিকে তাকিয়ে দেখি, একমাত্র ধাপে ধাপে উঠে যাওয়া সিঁড়ি ছাড়া এই পাতাল-পুরী পরিত্যাগের জন্য কোনও পথ নেই। আমি ওপরে ওঠবার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখি কেমন যেন শরীরের মাধ্যাকর্ষণ হারিয়ে ফেলেছি। কেষ্ট তাড়াতাড়ি আমাকে ধরে ফেলে বলল : আস্তে আস্তে উঠে যাবার চেষ্টা কর। তাড়াহুড়ো করিস না। এত নীচে এসে এই গরম জলের ধারে দাঁড়িয়ে থেকে এমন হয়েছে। তবু তো তুই জলে নামিস্ নি। আমার কি হয়েছিল জানিস্? আমি জানতাম না। বেশ করে ডুব দিয়ে স্নান করে আমি যেই উঠতে যাচ্ছি, মাথা ঘুরে পড়ে যাই আর কি! এক ভদ্রলোক বললেন মাথায় গরম জল দিতে নেই। তাছাড়া কুণ্ডের জলে নামবার আগে এবং স্নান করে ফিরে এসে ধারার জল গায়ে নিতে হয়।

কৃষ্ণপদর অনর্গল প্রলাপের কিছু শুনেছি, কিছু না শুনে, তার পেছনে পেছনে আস্তে আস্তে এসে সেই অশ্বত্থগাছের নীচে সেই সঞ্চরমান আলোছায়ায় চিত্রিত বিচিত্র রহস্যলিপির ওপরে এসে দাঁড়ালাম। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি রাত্রি গভীর। রাস্তা লোক-বিরল।

কেষ্ট বলল : তোকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসব?

: আমি একাই যেতে পারব।

: তোকে এইভাবে পাঠিয়ে আমি চিন্তিত থাকব। কাল কোথায় কখন দেখা হবে বল্। ভয় নেই। বাসায় গিয়ে তোকে বিব্রত করব না।

: বিব্রতই বটে। এক ভদ্রলোক দয়া করে আশ্রয় দিয়েছেন।

বন্ধু-বান্ধব নিয়ে যাবার মত নয়।

: বাড়ীর মধ্যে না গেলেও, কাছাকাছি পৌঁছে দিয়ে আসতাম। কিন্তু ফুলমামাকে নিয়ে যেতে হবে। আর দেরী করা চলে না। আবার কোথায় কখন দেখা হবে বল্‌লি না?

মনে মনে ভাবলাম, ভেবেচিন্তে একটা সমাধান না করা পর্যান্ত কিছুতেই বিনয়বাবু অথবা মণিমালার সঙ্গে কৃষ্ণপদর সাক্ষাৎ হতে দেওয়া যায় না। বললাম : কাল সকাল ন'টায় ঐ অশ্বত্থগাছের তলায় দেখা হবে।

আমি একটু এগিয়ে যেতেই কেষ্ট ডেকে কাছে চলে এলো এবং বলল : আমি না ভেবে-চিন্তে কথাটা বলে ফেলে ভাল করি নি।

: কোন্ কথাটা?

: ঐ মণিমালার কানের পেছনের দাগের কথাটা।

: তাতে আমার কি এসে যায়?

: তুই এক সময়ে মণিকে খুব ভালবেসেছিলি তো?

: সে তো পরস্ত্রী।

: পরস্ত্রী বলেই তো ভালবাসার প্রশ্ন। নিজের স্ত্রী হ'লে তুই অনর্থক ভালবাসবি কেন? স্ত্রী হিসেবে স্বামার কাছে নিঃস্ব হয়ে যাবার পরে পরস্ত্রী হিসেবেই পুরুষের চোখে নারীর মর্যাদা।

: মণিমালার ওপরে তুইও তো ভাই বিরূপ ছিলি না।

: সর্ব একাগ্রতা নিয়ে একদিন মণিমালার দেহসঙ্গ কামনা করেছিলাম।. কিন্তু অচিরেই কলসী-কলসী জল ঢেলে সেই কামনার আগুনকে নিবিয়েও ফেলেছিলাম। তা না হলে কৃষ্ণপদকে পদদলিত করে মণিমালার দ্বারদেশে তুই কোনও দিনই উপস্থিত হতিস না ভাই।

[আঠার]

কৃষ্ণপদকে বিদায় দিয়ে কুণ্ডের চত্বর ছেড়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াতেই একটি টাঙ্গা পেয়ে উঠে বসে বললাম, ভুবনেশ্বর পাণ্ডার বাড়ী।

গাড়ী এগিয়ে চলল। চুপচাপ বসে ভাবতে লাগলাম, ভাগ্যের কী পরিহাস! জীবনে অনেক জটিল কর্তব্য করেছি। কিন্তু আমার সামনে যে আশু কর্তব্য, তা বিচিত্রতম। অনেক কিছু খুঁজে বেরিয়েছি। এবার আমাকে জড়ুল চিহ্ন খুঁজে বেড়াতে হবে। যদি সত্যি সত্যি বিনয়বাবু আর মণির বাঁ কানের পেছনে জড়ুল চিহ্ন থাকে, তবে সেই রহস্য আমাকে কোন অজ্ঞাত বিশ্বে নিয়ে যাবে জানি না। অথবা এই কাহিনী কৃষ্ণপদর সুরাপান-জনিত প্রলাপোক্তিও হতে পারে। নিজের ওপর নিজের রাগ হতে লাগল। কী দরকার ছিল আমার ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার। আমার কণ্ঠলগ্না-পাশসুন্দরী একটি কান ধরে নিয়ে এসেছে ঠিক, কিন্তু সে দ্বিতীয় কানটি মণিমালার দিকে এগিয়ে দেয়নি। নিজেই ফাঁদে পা বাড়িয়ে দিয়ে আজ এ কোন অক্টোপাশের বন্ধনে আবদ্ধ হতে চললাম?

গাড়ীটা যখন বৌদ্ধমন্দিরের কাছাকাছি এসেছে তখন দেখি, বিপরীত দিক থেকে বিনয়বাবু ক্লান্ত চরণে এগিয়ে আসছেন। বুঝলাম অতি বিলম্বের জন্য মণিমালার ব্যাকুলতায় বিনয়বাবু গভীর রাত্রে আমার খোঁজে বেরিয়ে পড়েছেন। মণির ব্যাকুলতার কথা মনে হতেই অন্তরটা বেদনায় বিদ্ধ হল। মনে মনে বললাম: ঠাকুর, নিজের জন্য কিছু চাই না। আমার সুকৃতি যদি কিছু থাকে, তার বিনিময়ে মণিমালার জড়ুল চিহ্ন যদি থাকে, তবে তা নিশ্চিহ্ন করে দাও।

বিনয়বাবুর দৃষ্টি গাড়ীর দিকে পড়তেই আমি আহ্বান জানালাম। বিনয়বাবু যথারীতি বিনয়ে বিগলিত হয়ে উঠে বসলেন। তিনি আমার বাঁ দিকে বসাতে তাঁর বাঁ কানের পেছন দিক আমার দৃষ্টির অগোচরে থাকল। রাস্তায় গাড়ীটি এক একটি আলোর কাছে আসতেই আমি বারবার চেষ্টা করেও আমার জ্ঞাতব্য বিষয়টি অজ্ঞাতই থেকে গেল। কিছু পরেই তিনি শরতের সামান্য হিম প্রতিরোধের জন্য চাদরটিকে গলায় এমনভাবে জড়ালেন যে তাঁর কানদুটো চাপা পড়ে গেল। আমার ভাগ্য দেবতার অনাগত নির্দেশ সামান্য বস্ত্রখণ্ডের অন্তরালে আত্মগোপন করে নিশ্চিন্ত হল। বিনয়বাবুর ওপর অকারণ রাগ হোল। এই ভদ্রলোক নানাভাবে তার বিনয়ের ছদ্মবেশে আমাকে অকারণ রহস্য-যন্ত্রণার দিকে ঠেলে দিচ্ছেন।

নিজের ঘরে প্রবেশ করে জামা-কাপড় না ছেড়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। তার আগে লক্ষ্য করলাম আমার ক্লান্ত দেহ অনুমান করে মণিমালা আমার বিছানা পরিপাটি করে তৈরী করে রেখেছে। মণির ওপর রাগ হ'ল। ভাবলাম, আমি কি অন্যায় করেছি, যার জন্য তোমরা আমাকে এমন ভাবে জড়িয়ে ফেলছো ?

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দুই ঘরের মাঝখানের দরজা উন্মুক্ত করে মণিমালা এলো। আমার সমগ্র দৃষ্টিকে লক্ষ্যে নিবদ্ধ করতে গিয়ে দেখলাম, তার কেশরাশি বিপর্য্যস্ত হয়ে কান দুটিকে ঢেকে রেখেছে। সে তাড়াতাড়ি এসে পায়ের কাছে বসেই চোখেমুখে ব্যাকুলতা নিয়ে বলল : সেই দিদি আর ডাক্তারবাবুর সঙ্গে বেরিয়ে গেলে, আর তোমার খোঁজ নেই।

বলেই পায়ের ওপর মুখখানা রাখতেই উষ্ণ ভাব বোধ করলাম। বুঝলাম অশ্রুজলে আমার পা ভিজে যাচ্ছে। তার মাথায় হাত দিয়ে বিপর্য্যস্ত কেশরাশি সরাতেই আমার ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত আলোড়িত করে জড়ুল চিহ্ন প্রকাশিত হয়ে পড়ল। দেখলাম, পাতালপুরীতে

নেমে যাবার সিঁড়িতে নিশ্চিন্ত মনে বসা স্থবির মূর্তির বাঁ কানের পেছনে দেখা জড়ুল চিহ্নের ঠিক অনুরূপ একটি জড়ুল চিহ্ন ধরণীর যাবতীয় রহস্যের ঈঙ্গিত বহন করে মণিমালার দেহে বিদ্যমান। মনে মনে বললাম: ঘরে ফেরার সামান্য বিলম্বের জন্য ব্যাকুলিত হৃদয়ে আজ তোমার এই উদ্গত অশ্রু, নিতান্তই অপব্যয়। অশ্রুজলের সঞ্চয় তোমার কত আছে জানি না। জীবনে যতই ব্যয় করে থাক, অদূর ভবিষ্যতে তোমার সঞ্চিত ভাণ্ডার নিঃশেষ হবার দিন ঘনিয়ে এসেছে। ব্যর্থতার মধ্যে জন্মলাভ করা শীর্ণকায়া বানগঙ্গার কথা মনে হল! বর্ষার প্লাবনে স্ফীত হয়ে ওঠে ঠিকই, কিন্তু চৈত্রদিনের শুষ্কতার দিনেও, শীর্ণতনু হলেও ধারাপ্রবাহ অক্ষুণ্ণ থাকেই।

মণিমালা ততক্ষণে উঠে বসে বলল: খাবে চল।

আমি বললাম: একটা কথা আমার বিশ্বাস করবে?

: সব কথাই বিশ্বাস করব, একটা ছাড়া।

: সে কথাটা কী?

: তোমার খিদে নেই।

: কিন্তু ঐ কথাটাই বলব। কথাটা নিতান্তই সত্যি। আর আমার এই কথাটা যদি তুমি বিশ্বাস কর, তবে তুমি যা বলবে শুনব।

মণি: আমি যা বলব, তুমি তাই শুনবে—এত বড় প্রতিজ্ঞা তোমার হঠাৎ করে কাজ নেই। আমারও বিশ্বাস করে কাজ নেই। খেতে চল।

: আমার প্রতিজ্ঞা আমি প্রত্যাহার করলাম। তোমারও বিশ্বাস করে কাজ নেই। তুমি শুধু আজ আমাকে খাওয়া থেকে অব্যাহতি দাও।

মণি বলল: বুঝেছি। তোমাকে কষ্ট করতে হবে না। এখানে বসে বসেই তোমার খাবার ব্যবস্থা আমি করছি।

বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মনে মনে ভাবলাম, হয়তো এরপরে থালায় ডাল-তরকারী দিয়ে ভাত মেখে দলা করে করে খোকাবাবুর মত আমার মুখে তুলে দেবার চেষ্টা করবে। ভয় পেলাম। কিন্তু ও যখন ফিরে এলো, দেখলাম হাতে ছোট থালায় ভাতের পরিবর্তে অন্যান্য খাবার।

আমি বললাম : এ সব নিমকি, সন্দেশ কোথায় পেলে ?

: তুমি কি বাঙ্গাল নাকি মামা ?

: তোমার অনুমান সত্য।

: তাই। তা না হলে প্যাড়ার নাম সন্দেশ আর খাজার নাম নিমকি বলবে কেন। এগুলো এখানকার প্রসিদ্ধ খাবার। এই প্যাড়া ক্ষীর দিয়ে তৈরী হয়, আর খাজা ময়দা ভাঁজ করে করে বেলে ঘি-এ ভেজে তৈরী হয়। বুঝলে বাঙ্গাল মামা ?

আহারাদি শেষ হতে মণিমালা অতীব ঘনিষ্ঠ হয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে কি একটু ভেবে হঠাৎ আমার কোলের ওপর শুয়ে আমার কটীদেশটি জড়িয়ে ধরে চুপ করে পড়ে থাকল।

আমি ভাত হয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে দেখি তা মুক্ত। বললাম—

: দরজা খোলা রয়েছে। বিনয়বাবু এসে পড়েন যদি ?

: অত ভয় কিসের ? বিনয়বাবু কি তোমার সতীন ?

: পুরুষ মানুষের আবার সতীন হয় নাকি ?

: মেয়েদের সতীনের সম্পর্ক পুরুষদের মধ্যে হলে কি বলে, তা আমি জানি না। তাই সতীন বললাম। আচ্ছা মামা, পুরুষদের মধ্যে এমন সম্পর্ক হয় ?

: সমাজ বিধান দেয়নি।

: কেন ?

: বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, এ্যাসিডের বোতলে জল দিলে আগুন

ধরে যেতে পারে; কিন্তু জলের বোতলে এ্যাসিড দিলে কোন ভয় নেই।

মণি হেসে উঠে আমার মুখের দিকে একটু তাকিয়ে পূর্বাবস্থায় শুয়ে থাকল। আমি বললাম: বিনয়বাবু হয়তো অপেক্ষা করছেন।

: বিনয়বাবুর প্রতীক্ষার অবসান অনেক আগে হয়েছে।

বলে সে চুপ করে শুয়েই থাকল। আমি তার চুলগুলো নাড়াচাড়া করতে-করতে বাঁ কানের পেছনটা পুনরায় দেখলাম। মানুষের দেহে যদি প্রাণসংশয়কারী দূষিত ক্ষতের সৃষ্টি হয়, তবে সে যেমন বারবার ক্ষতের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে নানারূপ সম্ভব অসম্ভব পরিণতির ভয়ে আতঙ্কিত হতে থাকে, তেমনি মণিমালার বাঁ কানের পেছনে জড়ুল চিহ্নের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে নানা কথা ভাবতে লাগলাম। কিন্তু জড়ুল একটি নিতান্তই নিরীহ সাধারণ দাগমাত্র। পাতালপুরীর সিঁড়িতে দেখে আসা সেই নিরীহ দাগচিহ্নটি দিগ্বিদিকে এমন সর্বনাশা দাবানল ছড়িয়ে দিতে পারে, তা কে জানতো। কেষ্ট বলেছে মণির এবং বিনয়বাবুর কানের পেছনে এই চিহ্ন বিদ্যমান। পৃথিবীর যাবতীয় লোককে কান টেনে টেনে দাগ খুঁজে বেড়াতে হবে হয়ত। সাড়ে তিন মণ ওজনের গৃহিণীর বাম বাহুতে সাড়ে তিন গজ লাল সুতোয় বাঁধা গোবিন্দবাবাজির মাদুলির প্রভাব অতিক্রম করে, তিনি বোধহয় বিশ্বময় দাগচিহ্ন ছড়িয়ে দিয়ে আজ পাতালপুরীর দ্বারদেশে বসে চক্ষু বুজে জগৎ নিরীক্ষণ করছেন। আর এ্যাপ্রেনটিস্ কৃষ্ণপদ তার ক্ষীণদেহের ওপরে ঘন প্রসাধন মাখা মুখ নিয়ে, কি অজ্ঞাত কারণে এই বিপুল দেহ বয়ে বেড়াচ্ছে কে জানে?

মণি যেন আরও ঘনিষ্ঠ হল। আমি বললাম: রাত বোধহয় শেষ হয়ে এলো। এইবার প্রত্যূষের কাক ডেকে উঠবে। ঘরে যাও।

: ঘরেই তো আছি।

: তোমার নিজের ঘরের কথা বলছি।

এইবার মণিমালা সোজা হয়ে উঠে বসল। আমার মুখের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলল: আমার নিজের ঘর কোন্‌টা?

: মানুষ যে ঘরে থাকে, সেইটেকেই নিজের ঘর বলে।

: যেদিন থেকে হাঁটা শিখেছি, সেদিন থেকে পায়ে পায়ে কত ঘরকে নিজের ঘর বলে এগিয়ে গিয়েছি। কিন্তু সর্বত্রই প্রত্যাখ্যান ছাড়া কিছু পাইনি। তাই ঘর ছেড়ে পথে এলাম। কিন্তু পথও তো দেখি, কাঁটায় ভরা। তাহ'লে সুখসম্পদে ভরা এই ধরণীর কোথায় আমাদের স্থান, তাই দয়া করে বলে দাও। সেই দিকে চলে যাই।

সে আবার আগের মত শুয়ে পড়ল। আমি বললাম: বিনয়বাবু হয়ত কিছু ভাবছেন।

: বিনয়বাবু খুব ভদ্রলোক। তাকে কোন ভয় নেই তা তুমিও জান, আমিও জানি। তবে কি কলঙ্কের ভয়?

: তা সমাজে বাস করতে হলে কলঙ্কের ভয় কে না করে?

: সে ভয় তো আমার। পুরুষের আবার কলঙ্ক হয় নাকি? এইবার মণিমালা পুনরায় উঠে বসল এবং মুখের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। কিন্তু এবারের দৃষ্টি ভিন্ন। বিছানা থেকে নেমে টলতে টলতে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে আস্তে আস্তে বলতে লাগল—

: নিষ্কলঙ্ক আদিত্যদেব মাথায় থাকুন। পথের ধূলি গায়ে মেখে আমরা পথের ধারে বসে থাকি।

মণিমালা কক্ষান্তরে অদৃশ্য হল। দরজা মুক্তই থাকল। উভয় পথের আগমন এবং নির্গমন অবারিত।

ঘর অন্ধকারই ছিল। শুয়ে পড়লাম। নিদ্রাদেবী আজ অনেক দূরে। ভাবতে লাগলাম সকাল ন'টায় কেষ্টর সঙ্গে কুণ্ডের চত্বরে

অশ্বত্থ গাছের তলায় দেখা করতে হবে। কিন্তু তার আগে বিনয়বাবুর বাঁ কানের পেছন দিক অনুসন্ধান করে নিতে হবে। কাল সকালেও যদি ঠাণ্ডা লাগার অছিলায় কান দিয়ে, গলা দিয়ে চাদর জড়িয়ে রাখেন তবেই তো হয়েছে। এ পর্য্যন্ত ভদ্রলোকের ঠাণ্ডা লাগার বাতিক ছিল না। ঠিক আমার প্রয়োজনের সময় থেকেই ওঁর যত ঠাণ্ডার ভয় চেপে ধরল। কেষ্টর কথা অর্দ্ধেক যখন মণির বেলায় সত্যিই হয়েছে, বাকী অর্দ্ধেক বিনয়বাবুর বেলায় সত্যি প্রমাণিত না হয়ে যায় না।

এত কিছুর মধ্যেও অনেকদিন আগেকার একটা কথা মনে পড়ল। একবার "চেতাবনী" হয়েছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে। এবার হল অষ্টগ্রহ। যে সব গ্রহ উপগ্রহ সূর্য্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে, তারা একে অন্যের সঙ্গে একটা সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হয়ে এমন শৃঙ্খলাপরায়ণ হয়ে চলাফেরা করছে যে কারও সঙ্গে কারও ঠোকাঠুকি হচ্ছে না। কিন্তু সেবার এমন একটা পরিস্থিতি হল যে, পৃথিবীটা নাকি সূর্য্যের মধ্যে প্রবেশ করে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। পৃথিবীর শেষ দিন ঘনিয়ে এলো। যার যা কামনা আছে পূর্ণ করে নাও। নবযৌবনা সাবিত্রী আমাদের সংসারের কাজকর্ম করে দিত। প্রলয়ের পূর্বদিনে সে কাজে এলো না। পরে জেনেছিলাম সারাদিন অঙ্গসজ্জা করে স্বীয় স্বামীকে স্বগৃহে রাত্রিযাপনে প্রলুব্ধ করেছিল এবং কৃতকার্য্য হয়ে বিবাহের পরে একমাত্র শুভরাত্রি ছাড়া এই প্রথম সে, সম্ভাব্য সর্বনাশের পূর্বে, মধুযামিনীর আস্বাদ লাভ করেছিল।

কেষ্ট বলেছিল, ফুলমামীর একের পর এক নিষ্ফল নৈশ অভিসারকে উপেক্ষা করে, প্রয়াগক্ষেত্রের বাণিজ্যলক্ষ্মীর বরপুত্র, যোগানন্দের সংসারে আগুন ধরিয়েছিল। নির্বাপিত বহ্নির চরিত্র-পরিচয় আত্মপ্রকাশের অপেক্ষায় আছে। মণিমালার কানের পেছনে সামান্য একটা দাগ, কাল বেলা ন'টার পরে, পূর্ণিমার রাতে

চাঁদের গায়ে বিরাট চিহ্নের আকার ধারণ করে, আমাকে কোন পথনির্দেশ করবে জানি না। সম্ভব অসম্ভব সেই পরিণতির কথা মণিমালা বিন্দুমাত্রও জানে না। যদি জানতো তবে হয়ত সাবিত্রীর মত কি অঙ্গসজ্জা করত কে জানে?

শয়নকক্ষের মেঝের গর্তে বিষধর সর্পের অবস্থান সন্দেহ করবার পরে, গৃহকর্তা যেমন সংশয়ে রাত্রিযাপন করে, তেমনি ভাবে আমার রজনী এগিয়ে যেতে লাগল।

ও ঘরে মণিমালা আর বিনয়বাবু, এ ঘরে আমি। দরজা খোলা রেখেই মণি শয্যা গ্রহণ করেছে। আমি উঠে গিয়ে দরজা বন্ধ করবার মত উৎসাহ বোধ করলাম না। তবে কি দ্বার রুদ্ধ অথবা মুক্ত করবার সকল দায়িত্ব আমার ওপরেই থাকল। মনে বোধ হয় ক্ষীণ আশা ছিল যে, মণিমালা হয়ত আবার এলে আসতেও পারে।

তা মণিমালা এসেছিল। সে আমারই পরোক্ষ আহ্বানেই এসেছিল। ঘুমভাঙ্গা সদ্যজাগ্রত চৈতন্য দিয়ে নিমীলিত নয়নে অনুভব করলাম—মণিমালা এবং আমার দণ্ডায়মান দেহ, পরস্পর আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে আছে। তার দেহ থরথর করে কাঁপছে। ভাবলাম বুঝি আনন্দ-শিহরণ। চক্ষু বুজেই জড়িত স্বরে জিজ্ঞাসা করলাম, রাত্রি প্রভাত হতে কত দেরী। কম্পিত স্বরে মণিমালা উত্তরে জানাল যে, রাত্রির তমসা শেষ হয়ে দিকচক্রবালে প্রভাতের সূর্য্য উদিত হয়েছে।

তখন তাকিয়ে দেখি, মণিমালার মর্মর শুভ্র কম্পমান পৃষ্ঠদেশ স্খলিত-অঞ্চল হয়ে, শারদীয় সোনালী প্রভাত কিরণে উদ্ভাসিত। আমার বক্ষদেশ তার অশ্রুজলে অভিষিক্ত।

মণিমালা তার মুখখানা বুকের ওপর রেখেই কম্পিতকণ্ঠে অস্পষ্ট স্বরে বলল: ঘুমের মধ্যে বোধ হয় কি স্বপ্ন দেখে ভয়ে চিৎকার করে উঠেছিলে। আমি তাড়াতাড়ি এসে ঘুম ভাঙ্গাবার জন্য গায়ে

হাত দিতেই লাফিয়ে উঠে আমাকে জড়িয়ে ধরেছ।

আমার স্বপ্নের কথা মনে পড়ল। পঞ্চপর্বতের উপত্যকায় সোনাগিরির পাদদেশে শীর্ণকায়া বানগঙ্গায়, হঠাৎ পাতাল থেকে উৎসারিত জলরাশি শঙ্কটাবর্ত সৃষ্টি করে আমাকে যেন জোর করে জলের নীচে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

[উনিশ]

যোগীশ্বর পুণ্যপরশে কোন এক শুভদিনে হর্ষময় ছয় রাগ আর ছত্রিশ রাগিনীর মূর্চ্ছনায় মুগ্ধ কমলাকান্তের চরণ থেকে জাহ্নবী উদ্ভূতা হলেন। অন্যদিকে মুরলীধ্বনি মুখরিত বৃন্দাবনের কেলীকুঞ্জে পুলকে শিহরিত কদম্বকেশর বিধৌত কালিন্দী। এলাহাবাদের প্রয়াগক্ষেত্রে এদের শুভ মিলন। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সরস্বতীর লুপ্ত ধারা। এই নিয়ে ত্রিবেণীর পুণ্য সঙ্গম। ভক্তজন বলে, সরস্বতীর লুপ্ত ধারা অদৃশ্য থেকেও ত্রিবেণীর পুণ্য সলিলে রহস্য সংযোজন। কিন্তু দৃশ্যমান গঙ্গা এবং যমুনার মিলনক্ষেত্র, রেখান্তরে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর।

কৃষ্ণপদ কথিত তার ফুলমামার কাহিনীর দৃশ্যপটও ঐ ত্রিবেণী; কিন্তু চরিত্রে পৃথক। সেই কাহিনী সপ্তপর্ণী গুহার অভ্যন্তরে অন্ধকারের পথে অবতরণশীল সুড়ঙ্গের মত। সুড়ঙ্গের জঠরে অজ্ঞাত তমিস্রার ইতিহাস, ব্রহ্মকুণ্ডের চত্বরে পিপ্পলী বৃক্ষের নীচে, সেই উদয়গিরির পাদমূলে উৎকীর্ণ শঙ্খলিপির ভাষায় মাঝে মাঝে ফুটে ওঠে। কিন্তু তার পাঠোদ্ধার এখনও সম্ভব হয় নি।

স্খলিত অঞ্চলখানি অঙ্গে তুলে দিয়ে লজ্জানম্র মুখখানা নিয়ে মণিমালা দাঁড়িয়েই ছিল। তার মাধুর্য্যমণ্ডিত মুখখানার ওপরে

রক্তিমাভা বিদ্যমান। এই রক্তিমাভা শারদ-প্রভাতের অরুণাভ-সঞ্জাত অথবা অনুরাগে অভিষিক্ত হৃদয়ের অভিব্যক্তি, তা জানি না।

আমার হঠাৎ মনে হল, কৃষ্ণপদ বেলা ন'টায় বিগত ইতিহাসের কালিমালিপ্ত মুখখানার ওপরে উগ্র প্রসাধনের প্রলেপ লাগিয়ে, অনাবৃতার বিতৃষ্ণা দূর করতে স্বল্পাবৃতার সন্ধানে আমার অপেক্ষায় অশ্বত্থগাছের নীচে বসে থাকবে। আমাকে যাত্রা করতে হবে। কিন্তু তার পূর্বে বিনয়বাবুর কর্ণমূলের পশ্চাদ্দেশ পর্যাবেক্ষণ প্রয়োজন।

এই কথা চিন্তা করতে করতেই বিনয়বাবু এসে উপস্থিত। কিন্তু ভদ্রলোকের দ্রষ্টব্য স্থানটি মোটা চশমার ফ্রেমে ঢাকা। কখনও ঠাণ্ডার ভয়ে বস্ত্রখণ্ডের আড়ালে, কখনও বা চশমার ফ্রেমের আবরণে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে গাত্রচর্মের সামান্য একটু বিবর্ণতা আমাকে এমন বিব্রত করবে কে জানতো। মোটকথা আজ বন্ধুবরের সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে তার বক্তব্যের সত্যাসত্য বিচার করা অসম্ভব।

মণিমালা এতক্ষণে ধীরপদে বিনয়বাবুর পাশ কাটিয়ে কক্ষান্তরে প্রস্থান করেছে। আমারও প্রস্থানের সময় আসন্ন। বিনয়বাবুর সঙ্গে কৃষ্ণপদর সম্ভাব্য সাক্ষাৎ নিবারণ করতে হবে। এর উপায় পূর্বাহ্নে বন্ধুবরকে স্থানান্তরিত করতে হবে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি, আটটা বাজে। কাল বিলম্ব না করে প্রাত্যহিক কাজকর্ম কোনও রকমে সেরে বেরিয়ে পড়ব, এমন সময় মণিমালা আনতমুখে চায়ের পেয়ালা নিয়ে হাজির হ'ল। জিজ্ঞাসা করে জানলাম, বিনয়বাবু তার আগেই শিশি বোতলের ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন। উত্তপ্ত চা কোনও রকমে গলাধঃকরণ করে বেরিয়ে যাব, এমন সময় মণি বলল—

: কখন ফিরবে ?

: খুব দেরী হবে না।

: কোথায় যাচ্ছ ?

: তার কি কিছু ঠিক আছে।

: ঠিক যদি না থাকে, তবে বাড়ী না ফিরলে কোথায় খুঁজব ?

: খুঁজতে হবে না। কিন্তু বিনয়বাবু রোজ কোথায় যান জান ?

: কুণ্ডের দিকেই তো যান। সকালে এ কুণ্ডের জল আর বিকেলে ও কুণ্ডের জল, এই নিয়ে তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা। আমি বলি, সকালে বিকালে কি জলের চরিত্র বদলায় ? তিনি বলেন, মানুষেরই যদি বদলায়, তবে জল তো ছেলেমানুষ।

: আমি দুপুরে এসে খাব। তবে কিছু দেরী হতে পারে।

বলে আমি রহস্য উদঘাটনের পথে পা বাড়ালাম। দুপুরে ফেরা এবং খাবার প্রতিশ্রুতি না দিলেই ভাল হতো। আবার হয়ত কান্নাকাটি আরম্ভ করবে নাকি কে জানে। বন্ধুবর অশ্বত্থগাছের নীচে আমার জন্য কি ইতিহাস রচনা করে রেখেছে কে জানে। আর ইতিপূর্বে যদি বিনয়বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে থাকে, তবে ইতিহাসের কানে ধরে কোন পথ নির্দেশ করেছে, তা জানেন শুধু ভগবান। পাতালপুরীর অর্দ্ধপথে উষ্ণ জলের নীচে নিম্নাঙ্গ রেখে অর্দ্ধস্থবির ঐ ইতিহাসের জন্মদাতা চোখ বুজে কুণ্ডের জলে প্রতি-বিম্বিত জগৎ-সংসার নিরীক্ষণ করছেন। আর কৃশতনু ভাগিনেয় প্রসাধনের প্রলেপ লাগিয়ে ইতিহাসের লিপিকে মুছে ফেলবার চেষ্টায় নিরত। আব ছন্নছাড়া আমি একেবারে বিনা প্রয়োজনে তার মধ্যে এসে জড়িয়ে পড়লাম।

রাজপথ ধরে এগিয়ে চলেছি। আবার সেইসব পরিচিত দৃশ্য ! ডানদিকে অজাতশত্রু গড় আর বেণুবন। বাঁ দিকে ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধমন্দির, সরকারী ডরমেটারী, জাপানী বৌদ্ধমন্দির, বৌদ্ধস্তূপের ধ্বংসাবশেষ ইত্যাদি। প্রয়োজনে এবং অপ্রয়োজনে সকলের জন্য সবখানি রাস্তা ছেড়ে দিয়ে আমি একেবারে বাঁ দিকের প্রান্তদেশ

ধরে এগিয়ে চলেছি। প্রভাতের জৈব-ক্রিয়ার আমন্ত্রণে জনপদবাসী, নরনারী নির্বিশেষে, পথের উভয় পাশে পথচারীর দৃষ্টি থেকে যথাসম্ভব আত্মরক্ষায় ব্যস্ত। এরই মধ্যে রাখালরা গরুর পাল নিয়ে মাঠে বেরিয়ে পড়েছে। টাঙ্গা চলাচল কিছু কিছু সুরু হয়েছে। দুই-একখানা মোটর গাড়ী বিদায়ী শরতের প্রথম শিশিরবিন্দু সিক্ত ধূলিরাশি উড়িয়ে নিজেদের উদ্ধত প্রতিষ্ঠা প্রচার করে চলেছে।

সরকারী বাজার বাঁ দিকে রেখে "সরস্বতী" নামে একদা পরিচিত, শুষ্ক নদীপথের ওপর দিয়ে বাঁধানো সেতু পার হয়ে যখন কুণ্ডের চত্বরের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছি তখন ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি, বেলা ঠিক নয়টা।

অশ্বত্থ গাছের নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি, কৃষ্ণপদ নেই আর বিনয়বাবুও নেই। কিছুটা শান্তি, দুজনে সাক্ষাৎ হয়নি। সিঁড়ি বেয়ে একজন একজন করে উঠে আসছে আর প্রত্যেককে কেষ্ট মনে করে তাকিয়ে দেখি, সে কেষ্ট নয়। যত দেরী হয়, তাই ভাল। রহস্য নাটকের পাত্রপাত্রী সবই সে স্থির করে রেখেছে। আমি জানি না। যে কোন মুহূর্তে সে পাদ-প্রদীপের আলো জ্বেলে দিয়ে যবনিকা তুলে দিলে পাত্র-পাত্রীরা নিজ-নিজ চরিত্র রূপায়ণে ঘটনার গতিকে কোন্ দিকে নিয়ে যাবে, তা আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। দর্শকের আসনে দুরু দুরু বক্ষে থেকে আমার ললাটে কি আছে তা জানি না।

বিনয়বাবু কোথায় আছেন জানি না। কুণ্ডের জল নিয়ে তার কারবার ঠিকই। কিন্তু কুণ্ডের কি এখানে শেষ আছে? ঐতো রাস্তার অপর পারে বিপুল গিরি। ঐ পাহাড়ের পাদদেশে ঋষ্যশৃঙ্গ কুণ্ড। পরবর্তীকালে সিদ্ধ মুসলমান ফকির মখদুম শাহ সরফুদ্দিন মনেরীর নামে, ওর নাম "মখদুমকুণ্ড" হয়েছে। ঐ কুণ্ডেরই গা দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে "দেবদত্ত" গুহা পর্য্যন্ত। শোনা যায় বুদ্ধদেবের প্রতিদ্বন্দ্বী শাক্যপুত্র দেবদত্ত ঐ গুহায় কিছুদিন বাস করেছিলেন।

এই বিপুল গিরির পাদমূলেই আরও কত কুণ্ড আছে। আমি কি সব নাম জানি? সূর্যকুণ্ড, সোমকুণ্ড, গণেশকুণ্ড আরও কত কি। আবার ঐ মণিয়ার মঠের কাছাকাছি আরও একটা ঠাণ্ডা জলের কুণ্ড আছে—তার নাম জানি না। সেখানে সম্প্রতি শিখদের একটি গুরুদ্বার হয়েছে।

এখন বেলা সাড়ে ন'টা। বিপুল পাহাড়ের বিশাল দেহে বনানীর তরুশ্রেণী তরঙ্গের পর তরঙ্গে সবুজের সমারোহে শীর্ষদেশ পর্য্যন্ত আচ্ছাদিত করে রেখেছে। মাঝে মাঝে দু'একটা ধূসর বর্ণের বৃহদাকার পাথর সবুজের আস্তরণ ভেদ করে মাথা উঁচু করে যেন জাগ্রত প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে। বিপুল পাহাড়ের বাধাকে অতিক্রম করে সূর্যদেব উঠে এসেছেন। কিন্তু কুণ্ডের চত্বরে তখনও প্রভাতের স্নিগ্ধতা। অশ্বত্থগাছের পাতার মধ্য দিয়ে নির্গলিত আলোর রেখা কাল চত্বরের বুকে অজ্ঞাত লিপিতে ইতিহাস রচনা করেছিল। আজ শিশির-সিক্ত পত্ররাশি থেকে ফোঁটা ঝরে পড়ছে। এ যেন মহাকালের পদচিহ্নে রচিত ইতিহাসের বুকে ঝরে পড়া তারই অশ্রুবিন্দু।

এত সব কথা ভাবতে ভাবতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে ছিলাম। হঠাৎ ছেলেবেলার সেই কানামাছি খেলার অনুকরণে আমার দৃষ্টি অবরুদ্ধ হ'ল। বললাম: সেই ন'টা থেকে এখানে বসে আছি। তুই কোথায় ছিলি?

কৃষ্ণপদ আমার আঁখিদুটিকে মুক্তি দিয়ে সামনে এসে বলল—

: এদিক ওদিক সব দেখে এলাম।

: স্বল্পাবৃতার সন্ধানে?

কৃষ্ণপদ হো হো করে হেসে উঠল। দিবালোকের দিব্য আলোকে নিতান্ত অকালে বিগত-যৌবন উগ্র প্রসাধন-মণ্ডিত শ্রীহীন মুখখানা দেখে আমার অন্তরটা ব্যথিত হয়ে উঠল। কিন্তু তাড়াতাড়ি

বিনয়বাবু এসে পড়ার আগেই রঙ্গমঞ্চ থেকে প্রস্থান করা দরকার। বললাম—

: হ্যারে কেষ্ট, তুই এই বৈভার পাহাড়ে উঠেছিস্?

: একদিন কিছুটা উঠেছিলাম।

: আজ চল্। দুজনে এই পাহাড়ে উঠি।

: এই সকালে, রোদ্দুরে?

: বৈভার পাহাড়ে সকালেই উঠতে হয়, সূর্য্য পেছনে থাকে। আবার বিপুল পাহাড়ে উঠতে হ'লে, বিকেলে উঠতে হয়। কারণ সকালে সূর্য্য সামনে থাকে। কেষ্ট বলল : তবে চল্।

দুজনে ব্যাসকুণ্ড বাঁ হাতে রেখে বৈভার পাহাড়ে ওঠবার সিঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে চললাম। আমি কেবলই ভাবছি, কৃষ্ণপদ কখন রহস্য নাটকের যবনিকা তুলে দিয়ে পাদপ্রদীপ জ্বেলে দেবে।

কোনও গর্তের মধ্যে সাপের নিশ্চিত অবস্থিতি জেনে সাপুড়ে যখন তার বাঁশী বাজাতে থাকে, তখন মানুষ যেমন একটা নিরাপদ দূরত্বে থেকে ভয়মিশ্রিত কৌতূহলে গর্তের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, আমার অবস্থাও অনেকটা তেমনই। সাপও আসে না, আর প্রতীক্ষারও অবসান হয় না।

বেশ কিছুদূর উঠে ডানদিকে দেখলাম, বেশ একটা বাঁধানো চত্বর। এইখানে দ্রষ্টব্য জিনিষের আকর্ষণে কৃষ্ণপদর গতি স্তিমিত হ'ল। একজোড়া যুবক-যুবতী। সিঁথির টকটকে সিঁদুর, হাতের লাল শাঁখা ইত্যাদি। দেখলে বুঝতে অসুবিধা হয় না, এরা সদ্য পরিণয়ের পরে মধুচন্দ্রিমায় এসেছে। কৃষ্ণপদর আকর্ষণের কারণ নববধূটির গায়ের জামায় ভীষণ বস্ত্র-সঙ্কটের লক্ষণ। সঙ্গে সঙ্গে বস্ত্রাঞ্চলের ব্যবহারে বধূটির অবহেলা।

স্বামী-স্ত্রী ইতিহাস বিষয়ে আলোচনা করছে এবং সেই আলোচনা উপলক্ষ্য করে কৃষ্ণপদ গতি স্তব্ধ করে নিবদ্ধ দৃষ্টিতে

ইতিহাসের পাঠ নিতে আরম্ভ করল। অন্যান্য পাঠের কথা বিশেষ বিবৃতির অপেক্ষা রাখে না।

যুবক বলছে : মহারাজ জরাসন্ধ বড় বড় পাথর দিয়ে একদিনের মধ্যে এই চত্বরটি তৈরী করিয়েছিলেন। এর প্রচলিত নাম "জরাসন্ধ বৈঠক"।

যুবতী : রাজগীরে সব কিছুর মধ্যে জরাসন্ধকে জড়িয়ে রেখেছে। কিন্তু ছোট্ট এই চত্বরে বড় বড় বৈঠক হয়েছিল ?

: জরাসন্ধের মিত্রপক্ষ খুব বেশী ছিল বলে মনে হয় না। ছিয়াশি জন রাজাকে তো বলি দেবার জন্য বন্দীই করে রেখেছিল।

: বৈঠক করবার জন্য সমতল ভূমিতে এতটুকু স্থান সংগ্রহ হ'ল না ? এর জন্য এত অর্থ আর শ্রম খরচার কি প্রয়োজন ছিল জানি না।

: রাজকীয় বৈঠকের মর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্য হোতে পারে।

: এর নীচে ছোট ছোট খুপরীর মত ওগুলো কী ?

: ওর মধ্যে নাকি লোক বাস করত।

বৌটি বলল : আমি ত একটা বৌদ্ধ গ্রন্থে পড়েছি, এটির নাম ছিল "পিপ্পলীগুহা"।

: সেও একটা মতবাদ আছে। ঐযে ছোট ছোট খুপরী বললে, ওরই একটির মধ্যে নাকি বৌদ্ধ মহাসম্মেলনের অধ্যক্ষ, ভিক্ষু মহাকাশ্যপ বাস করতেন।

: আবার অনেকে বলে, গঙ্গাযমুনা কুণ্ডের পশ্চিমে যে পুষ্করিনীর চিহ্নটি আছে তার পূর্বপ্রান্তের সামনে এই পাহাড়ের গায়ে পূর্বমুখী গুহাটিই "পিপ্পলীগুহা"।

ভদ্রলোক : "পিপ্পলী" অর্থে "অশ্বত্থ"। যে গুহার কাছে অশ্বত্থবৃক্ষ, তাকেই "পিপ্পলী গুহা" বলতে পার। ওদিকে যে কোন গুহার কাছে খুঁজলে দুটো একটা ছোট-বড় অশ্বত্থ গাছ নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। সুতরাং যে কোন গুহাই পিপ্পলী গুহা।

ওরা দুজনেই হেসে উঠল। আমি কৃষ্ণপদর মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ইতিহাসের কথা শুনছিলাম। হঠাৎ কেষ্টর মুখে উদ্দীপনার ভাব লক্ষ্য করে বৌটির দিকে তাকিয়ে দেখি, আলোচনার আনন্দে সমগ্র অঞ্চলটি তার হাতে স্থান লাভ করেছে এবং সম্পূর্ণ ঊর্দ্ধাঙ্গ বস্ত্র-সঙ্কটের জামার আবরণের নাচে, হাসির দোলায় দোলায় কৃষ্ণপদকে বিভ্রান্ত করছে।

ভদ্রলোক কৃষ্ণপদর দৃষ্টির একাগ্রতা লক্ষ্য করে নিজের দেহদ্বারা কৃষ্ণপদকে পেছনে রেখে বলতে লাগল—

: স্যার জন মার্শালের মতে চত্বরটি একটি প্রাগৈতিহাসিক রক্ষীগৃহ।

বৌটি পুনরায় হেসে বলল : কী সম্পদ রক্ষা করবার জন্য এখানে রক্ষীগৃহের ব্যবস্থা ছিল তা বলেন নি!

অবরুদ্ধ দৃষ্টি কৃষ্ণপদ স্থান পরিবর্তনের চেষ্টা করতেই আমি জামা টেনে ধরে নিবৃত্ত করলাম। কিন্তু ভদ্রলোক কৃষ্ণপদর একাগ্রতার হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য স্থান ত্যাগ করে এগিয়ে চললেন। কেষ্ট বলল : ওদের সঙ্গে সঙ্গে থাকলে অনেক কিছু জানা যাবে।

আমি বললাম : সেই শিশুকাল থেকে এতকিছু জেনেও এখনও জানবার ইচ্ছে শেষ হ'ল না? অনেক জেনেছ, আর দরকার নেই।

দম্পতি এগিয়ে গেল। আমরাও একটু অপেক্ষা করলাম।

কেষ্ট : ওরা এত কথা বলল, কিন্তু চত্বরের ওপরে ঐ যে কবরের মত পাঁচটি স্তূপ আছে, ও বিষয়ে কিছু বলল না।

: ওরা তো নিতান্তই বুদ্ধিহীন। তুমিই বল না।

: আমি বললাম না, একদিন কিছুটা এসেছিলাম। সেদিন আমি জেনেছিলাম।

: জেনেছিলে যদি, সেই জ্ঞানটা দান কর।

: এগুলো দেখতে অনেকটা আমাদের রান্নাঘরের ধোঁয়া বেরবার ব্যবস্থার মত। মুসলমানরা এগুলোকে বলে কবর এবং

চত্বরটাকে বলে "শাহগিলগিল।"

: ঋষ্যশৃঙ্গ কুণ্ডের নাম হল মকতুমকুণ্ড আর জরাসন্ধ বৈঠকের নাম হল "শাহগিলগিল"। ঠিক আছে, এবার এগিয়ে চল।

: ওরা কোথায় চলে গেল, আর এগিয়ে কি হবে?

: তুই কি ওদের দেখতে এসেছিস নাকি?

: বৌটা কিন্তু দেখবার মত।

: সে তোর দৃষ্টি দেখেই বুঝেছি।

: কিন্তু স্ত্রীলোকের এত রূপ থাকা ভাল নয়, অভিশাপ।

: আমার মনে হয় আশীর্বাদ।

: ঐ যে বৌটিকে দেখলি, ও থাকবে না। দেখলি না ও কাপড়-চোপড় গায়ে রাখতে পারে না। ও যেখানে যাবে, রূপের আগুনে সব পুড়িয়ে দিয়ে যাবে।

: তোর কিছুটা পুড়িয়ে দিয়ে গেছে, সে তো দেখতেই পেলাম।

: আমাকে আর পোড়াবে কি ভাই? আমি তো পোড়া কয়লা। কিন্তু স্ত্রীলোকের রূপের দাহ্যধর্ম আমি আমার জীবনদর্শনের ভেতর দিয়ে লাভ করেছি।

আমি চুপ করে থেকে এগুতে আরম্ভ করলাম। কৃষ্ণপদ বলতে আরম্ভ করল: দেখলি না, যোগানন্দর বৌটা, তার অফুরন্ত পসরা নিয়ে যাত্রা পথটা শুধু জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। এত রূপ ও কোথায় পেয়েছিল জানিস্?

: কি করে জানব?

: ওর মার ছিল উর্বশীর মত রূপ। মন্থিত সাগর থেকে উত্থিতা উর্বশীর মত কুন্দশুভ্র কান্তি নিয়ে মণিমালার মা বিদ্যুৎবরণী, ফুলমামার জীবনপ্রবাহে নিজেকে যুক্ত করে. ত্রিবেণী সঙ্গমের পূর্ণ মর্যাদা দান করলেন।

: তোর ফুলমামার জীবনে তা হলে দুটি ধারা পূর্বেই ছিল?

কৃষ্ণ: হ্যাঁ ছিল। এলাহাবাদের বাঙ্গালী সমাজে অর্থে,

সম্পদে, শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে কৃতবিদ্য পুরুষ আমার দাদু তাঁর একমাত্র পুত্রের যোগ্য পাত্রী সংগ্রহ করে আনতে আনতে ফুলমামা পিতার উপর অত্যন্তনির্ভর না হয়ে সকলের অজ্ঞাতে নিজেও একটি যোগাড় করেছিলেন।

আমি : তোর ফুলমামীর শুভ আবির্ভাবে গঙ্গাযমুনার মিলন হল ?

: ভুল করলি ভাই। গঙ্গা আর সরস্বতী হল। অর্দ্ধেক রাজত্বের সম্পদ আর রাজকন্যার রূপ নিয়ে ফুলমামীমা বাসর শয্যায় অবগুণ্ঠনের অন্তরালে সলজ্জ দৃষ্টিতে অনাগত দিনের অশুভ ইঙ্গিত অনুভব করেছিলেন।

: তোর ফুলমামী তখন নিশ্চয়ই সাড়ে তিন মন দৈহিক সম্পদ অর্জন করতে পারেন নি ?

: ফুলমামার যখন বিয়ে হয় তখন আমার কৈশোর কাল। দেবকন্যার মত দৈহিক সম্পদের আধিকারিণী ফুলমামীমা আমার ভক্তিরূপা ছিলেন।

: প্রয়াগের পুণ্যক্ষেত্রে তৃতীয় বেনী, যমুনার সংযোজন তখনও বাকী !

: দাদামশায় এর লোকান্তরের সঙ্গে সঙ্গেই তৃতীয় বেণী যুক্ত হয়ে পুণ্যভূমির দীপ্ত মহিমা পূণ হল।

: আর সেই তৃতীয় বেণীর সঙ্গেই বোধহয় হতভাগিনী মণিমালার গুপ্ত ইতিহাস উপ্ত হয়ে আছে ?

: ইউ আর পারফেক্টলী কারেক্ট।

: সেই কাহিনীটি বলে আমাকে বিদায় দে ভাই।

: সে কাহিনী শুনলে মণিমালার শেষ অবলম্বনও শেষ হয়ে যাবে।

: তার শেষ অবলম্বন কী ?

: তুই। তোর দিকে তাকিয়ে সহস্র নির্য্যাতনের মধ্যেও মণি আজও বেঁচে আছে।

: মণির জীবন-মৃত্যুর পথনির্দেশ করা যদি তোর দায়িত্ব হয়, সে দায়িত্বটা তুই নিজে যেমন ভাবে হোক পালন কর। আমাকে কাহিনীটি বলে মুক্তি দে।

: আমি মাঝে মাঝে ভাবি মণিমালার ভালমন্দে আমার কি এসে যায়। কিন্তু কি এক অদৃশ্য দেবতা আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। মণিমালার ভালমন্দের সঙ্গে নিজেকে আমি অজ্ঞাতে জড়িয়ে ফেলেছিলাম। আমার নিজের তো ভাল-মন্দ বলতে আর কিছু নেই। অনেকের ভালমন্দও উপেক্ষাই করে এসেছি। কিন্তু কাহিনী বলতে গিয়ে মণিকে যদি সর্বহারা করি, তাই ভাবি।

: মণিকে সর্বহারা করা অথবা রক্ষা করা তোর সাধ্যের অতীত। তবে তুই যদি বলতে না চাস, তবে প্রয়োজন নেই।

কৃষ্ণপদ কি যেন চিন্তা করল। একটু চুপ করে থেকে সোজা আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল :

ধূমকেতু দেখেছিস্? আমি বললাম : না, তবে শুনেছি।

কৃষ্ণ : এলাহাবাদে একদিন ধূমকেতুর উদয় হল। একদিন সকলে দেখল, আমার দাদুর প্রতিষ্ঠিত সর্বজনপরিচিত গ্র্যাণ্ড এ্যাণ্ড কোম্পানীর কর্ণধার হয়ে বসলেন জনৈক সাহেবীভাবাপন্ন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক। তাঁর সঙ্গে তরুণী, রূপসী ভার্য্যা। তার নাম বিদ্যুৎ-বরণী। কিছুদিনের মধ্যেই ভদ্রলোক কোম্পানীর সকল দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করলেন এবং প্রতিদানে তরুণী এবং অতীব রূপসী ভার্য্যার সকল দায়িত্ব ফুলমামাকে দিলেন।

: এ যে একেবারে দেনা পাওনার হিসেব নিকেশে চুলচেরা বিচার দেখছি। অর্থশাস্ত্রে একে বলে 'বার্টার সিস্টেম'।

: যথাসময়ে মাতৃত্বগরবিণী বিদ্যুৎবরণীর কোলে নবজাতা কন্যা, মায়ের দেহসুষমা সর্বথা অর্জন করে প্রস্ফুটিত শতদলের মত বিরাজ করতে লাগল।

: তারপরে কালের নিয়মে নবজাতা কন্যা মণিমালা নাম ধারণ

করে বিকশিত শতদলের মত কৃষ্ণপদ নামক ভ্রমরকে আহ্বান জানালে।

: সত্যি কথা, একেবারে সত্যি কথা। কিন্তু আমার অবস্থা দেখে ফুলমামীমা একদিন কাছে ডেকে বললেন যে, আমার ও মণিমালার ধমনীতে একই রক্তধারা। শুনে আমি চিৎকার করে উঠেছিলাম। তখন ফুলমামীমা জড়ুল চিহ্নের কথা বুঝিয়ে দিয়ে বললেন: মামা ও ভাগ্নের মধ্যে যে রক্তধারা, সেই একই জিনিস মণিমালার মধ্যে।

: তোর ফুলমামীমা তাহলে জানতেন?

: না জানলে বোঝালেন কি করে? আমি সভয়ে সরে এলাম।

: মণি জেনেছিল?

: না। আজও জানে না। সরে এলেও মণিকে না দেখে আমি থাকতে পারি না বলে মণির বিয়ের পরেও, কলেজে পড়ার নাম করে দীর্ঘদিন কুচবিহারে ছিলাম।

: কুচবিহারে শুধুই দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য ছিলি?

: হ্যাঁ ভাই। ততদিনে পিতৃদত্ত এবং মাতুলদত্ত অর্থের প্রাচুর্যে নারীদেহের ঐশ্বর্য্য আহরণ শেষ করে আমি প্রায় বিগতস্পৃহ হয়ে, বিজ্ঞান অধ্যয়ন শেষ করে শুধুই দর্শনে অভিরুচি অর্জন করেছি।

: এইবার বিনয়বাবুর ইতিহাসটি বল্।

এই সময়ে আমরা আর একটা ধ্বংসস্তূপের কাছে আসতেই হঠাৎ নারীকণ্ঠের আহ্বান শুনে তাকিয়ে দেখি সেই পূর্বগামী দম্পতি। সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণপদর চোখেমুখে একটা হৃতবস্তু পুনরুদ্ধারের পুলক অনুভব করলাম। ভদ্রমহিলা মৃদু হেসে বললেন: আপনি আমাদের একটা ঝগড়া মিটিয়ে দিয়ে যান।

আমি মনে মনে ভাবলাম যে নিজে মরি নিজের জ্বালায়, এর

মধ্যে আবার দাম্পত্যকলহ মিটিয়ে দেবার জন্ত মধ্যস্থতা? হেসে বললাম: কলহটা কী?

: এই ভগ্নপ্রায় মন্দিরটির মধ্যে দুটি শিবলিঙ্গ আছে। একটি কৃষ্ণপ্রস্তরে তৈরী, অপরটি শ্বেত। প্রথমটির নাম "সোমনাথ" ও দ্বিতীয়টি "সিদ্ধিনাথ"। কিন্তু শিবলিঙ্গের প্রকৃত রূপ কী? আমি বলছি কৃষ্ণ, আর ও বলছে, শ্বেত।

: কৃষ্ণরাধা মিলন করতে হলে, শ্রীরাধিকা কাঞ্চনবর্ণা বলে শ্রীকৃষ্ণের কৃষ্ণবর্ণ মধুর, হরগৌরীর বেলায়ও তাই বলা যায়।

যদিও উপমাটি অদ্ভুত, তবুও বধূটির গৌরবর্ণের জন্য নিজেই লজ্জারক্ত হয়ে উঠল, কারণ যুবকটি শ্যামবর্ণ।

মেয়েটি বলল: দেখলে তো আমার কথা সত্যি।

যুবক: তোমাদের জয় দিকে দিকে।

আমি বললাম: এই মন্দির কে নির্মাণ করেছিলেন?

যুবক: এখানকার সব কিছুর মধ্যেই জরাসন্ধ। ঐ রাজা নাকি এই মন্দিরে পুজো দিতে আসতেন।

যুবতী: পুরাণের সহজলভ্য এই চরিত্রটিকে নানা ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। কৃষ্ণপে মহাভারতকার তার জন্মের মধ্যে রহস্য আরোপ করেছিলেন।

আমার এবং কৃষ্ণপদর মধ্যে দৃষ্টিবিনিময় হল, কারণ আমরাও জন্মরহস্য নিয়ে অগাধ সলিলে আছি। আমি বললাম: মন্দিরটির ভগ্নদশা দেখলে মনে হয়, এটা কালের নিয়মে ভেঙ্গে পড়েনি। পশু-শক্তিতে ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। আর শ্বেতপাথরের লিঙ্গটিও অসমাপ্ত। সুতরাং অনুমান করা যায় সিদ্ধিনাথকে মূর্তি দান করতে করতেই মন্দিরটিকে কেউ ভেঙ্গে ফেলেছে।

ভদ্রলোক: মন্দির ধ্বংসের ইতিহাস এখানে কিছুই অসম্ভব নয়, কারণ হিন্দুস্থাপত্যের পরে এখানে সেখানে বৌদ্ধ এবং জৈনধর্মের

বন্যা এসেছিল, তাতে এগুলো যে বিন্দুমাত্রও টিঁকে আছে এটাই আশ্চর্য্য।

আমি : এখন কিন্তু এখানে বেশ সহাবস্থানের প্রীতি দেখা যায়। শিবমন্দিরও আছে, আবার জৈন মন্দিরও আছে।

মহিলাটি বললেন : সোমনাথ, সিদ্ধিনাথ যেমন ঐতিহাসিক হিন্দুমন্দির, তেমনি পুরাতন জৈনমন্দিরের মধ্যে ঐ দেখুন আদিনাথের আধুনিক শিবমন্দির।

আমি : নামটি হল "আদিনাথ", কিন্তু মন্দিরটি আধুনিক ?

মহিলা : প্রাচীনত্বের মাহাত্ম্য আরোপের জন্যই মনে হয় নতুন মন্দিরে পুরাতনের প্রতিষ্ঠা।

ভদ্রলোক : ওল্ড ওয়াইন ইন দি নিউ বট্‌ল।

সকলে হেসে উঠতেই কৃষ্ণপদও হেসে উঠল এবং পুনরায় তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হতেই আমি পা বাড়ালাম। ভদ্রলোক বলে উঠলেন, আদিনাথের মন্দিরের পাশ দিয়ে সিঁড়ি নেমে গেছে সপ্তপর্ণীগুহা পর্য্যন্ত। ধন্যবাদ জানিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে বললাম : মাথায় থাক সপ্তপর্ণীগুহা। তুই শেষ কর কেষ্ট।

সে বলল : শেষ তো হয়েই গেছে।

: বিনয়বাবুর কথা বল্।

: বিনয়বাবুর ইতিহাস বড় করুণ। যোগ্যপাত্রী অন্বেষণের অবসরে ধৈর্য্যহীন ফুলমামা সরস্বতীর পলিমাটিতে যে বৃক্ষ রোপণ করেছিলেন, তারই বিষফল বিনয়বাবু।

: তিনি কি তা জানেন ?

: তা জানি না। তবে শুনেছি, মাতৃত্ব গরবিনী মাতৃমঙ্গল সমিতিতে শিশু বিনয়বাবু ভূমিষ্ঠ হবার দু'চার দিন পরেই সরস্বতীর প্রবাহকে লুপ্ত করে মহা পথে প্রস্থান করলেন। ত্রিবেণী সঙ্গমের লুপ্ত বেণী সরস্বতীর উষর বালুচরে, অবাঞ্ছিত আগাছার মত শুধু নিজের প্রয়োজনে বেঁচে থাকলেন, শিশু বিনয়চন্দ্র।

: মহাযাত্রায় বিনয়বাবুকে সঙ্গে নিলেই ভাল হোত।

: ঐ ছোট্ট শিশু মহাযাত্রার দুস্তর পথের যোগ্য হতে মাতৃমঙ্গল সমিতিতে শৈশব কাটিয়ে একদিন, ফুলমামার সৌজন্যে পরিচালিত অসংখ্য আশ্রিত পরিজনের মিছিলের সামিল হয়ে গেল।

: মিছিলের গড্ডালিকা প্রবাহে এই অনন্য প্রতিভার বিকাশ হল কি করে, তাই ভাবি।

: বালিকা মণিমালার খেলার সাথী কিশোর বিনয়চন্দ্রের কর্ণমূল লক্ষ্য করে একদিন বিদ্যুৎবরণী ফুলমামাকে কাঠগড়ায় দাড় করালেন; ফুলমামা কিশোরকে বিতাড়িত করলেন। সকলের অজ্ঞাতে পাঠিয়ে দিলেন বিলেতে। ভর্তৃহীনা জবালাপুত্র কলিযুগের সত্যকাম কৃতবিদ্য পুরুষ হলেন।

: তিনি দেশে ফিরে এসে বিদ্যুৎবরণীকে দেখেছিলেন?

: না। বিদ্যুৎবরণী ততদিনে স্বর্গ অথবা নরক, কোনও একটা জায়গায় অবস্থান করছেন।

: আর ফুলমামী?

: তিনি ততদিনে সাড়ে তিন মণ দৈহিক সম্পদ অর্জন করে ফুলমামার বিষ জর্জরিত স্থবির দেহটার দিকে তাকিয়ে শুধু চোখের জল ফেলেন।

: যোগানন্দের সাথে মণিমালার মিলন-কাহিনী?

: নিতান্তই সাধারণ। ফুলমামার অনায়াসলব্ধ অশেষ সম্পদের ফুলদানীতে মণিমালার রূপ যৌবনের পুষ্পরাজি গন্ধ বিতরণ করতেই বঙ্গদেশের কত ভ্রমর উড়ে এলো। তার মধ্য থেকে যোগানন্দ সৌভাগ্যের মুকুটচূড়া পরে মণিমালাকে নিয়ে গেল।

: তুমি তো ততদিনে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভ করেছ?

: নিশ্চয়ই।

: তা হ'লে যোগানন্দর সংসারে আগুন লাগল কেন?

: মণিমালার রক্তের মধ্যে যে ভ্রষ্টাচারের বিষ।

: তোমার এই দর্শন আমি মানি না। তোমার কথা যদি সত্য হয়, তবে নটী সলাবতীর গর্ভজাত সন্তান এত প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন কি করে?

: নটী সলাবতীর গর্ভধারণের মধ্যে কোন ভ্রষ্টাচার ছিল না বাদার।

আমি: আর বিনয়বাবু?

কেষ্ট: আমি তো আগেই বলেছি, ভর্তৃহীনা জবালাপুত্র, কলিযুগের সত্যকাম।

: তবে বিষফল বলেছ কেন?

: সমাজের বিচারে বিষফল বৈ কি।

এই কথা বলতে বলতেই আমরা একটা চত্বরের সামনে এসে হাজির হলাম। ভারাক্রান্ত মনটাকে একটু হাল্কা করবার জন্য অন্য প্রসঙ্গ প্রয়োজন। বললাম: এই বুঝি সেই সপ্তপর্ণী গুহা।

: এখন আমাকে জিজ্ঞাসা করলে কি হবে? ওদের ছেড়ে এলে কেন?

: ওরা কি তোমার গাইড? আমি জানি ভাই। ভগবান বুদ্ধের মহানির্বাণের পর মহারাজ অজাতশত্রু বৌদ্ধ সম্মেলনের জন্য এই চত্বর তৈরী করিয়েছিলেন। এইখানেই প্রথম বৌদ্ধ সম্মেলনে ত্রিপিটক রচিত হয়।

: এই সম্মেলনের অধ্যক্ষই তাহলে ভিক্ষু মহাকাশ্যপ?

: তোর স্মরণ শক্তি বেশ ভালই আছে দেখছি। কিন্তু এখানে সাতটা গুহা ছিল শুনেছি। দেখছি তো দুটো মাত্র।

: তাও আবার একটার মধ্যে সুড়ঙ্গ। সুড়ঙ্গ কোথায় গেছে রে?

: রসাতলে! তুই যা বলছিলি, বল্। বেলা তো গেল।

: কাহিনীও শেষ, আমিও শেষ। বলেই পকেট থেকে একটা চ্যাপ্টা শিশি বার করে বলল: তোর অনুমতি হলে তোর দিকে পেছন দিয়ে...

: তুই আমার সামনাসামনিই কর্, তাতে আমার কোনও ক্ষতি হবে না।

কৃষ্ণপদ অবসাদের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: যোগানন্দবাবুর অর্থ, সম্পদ, বিদ্যা কিছুরই অভাব ছিল না। তবে মণিমালা ব্যর্থ হয়ে গেল কেন ?

: আমি তো সহজ সরল পথে চলেছি, জীবনের অত জটিলতা বুঝি না। তবে এটা বুঝতে পেরেছি. অর্থ. সম্পদ, বিদ্যার অতীত এমন কিছু আছে, যা না পেলে মণিমালার মত নারীর জীবন ব্যর্থ হয়ে যায়।

আমি বললাম: এই পাহাড়ে নাকি চোর ডাকাতের ভয় আছে। তাড়াতাড়ি নেমে চল।

আমরা দুজনে চড়াই-এর পথে আদিনাথের মন্দির পর্য্যন্ত এসে পুনরায় উৎরাই-এর সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে জিজ্ঞাসা করলাম:

: বিনয়বাবু কি তার পিতৃ পরিচয় জানেন ?

: জানতেন না, কিন্তু ফুলমামীমা তাঁকে মণিমালার সঙ্গে রক্তের সম্বন্ধের কথা বলে ওঁকে বিভ্রান্ত করে ফেললেন। মাতৃ মঙ্গল সমিতিতে জন্ম নিয়ে মাতৃহারা শিশু, বিত্তশালী ব্যক্তির বদান্যতায় শৈশব, কৈশোর অতিক্রম করে, আশাতিরিক্ত প্রাচুর্য্যের মধ্যে নিজের বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা দেখে, হয়ত মনে মনে কিছু একটা ধারণা করেছিলেন। কিন্তু ফুলমামীমার অসমাপ্ত কথাই তাঁকে বিপাকে ফেলে দিল।

: ফুলমামীমা বললেনই যদি শেষ করলেন না কেন ?

: সুযোগ পেলেন না। তখন সরস্বতী নেই, যমুনাও নেই। ভাগিরথীর প্রবাহ চৈত্রের খর রৌদ্রতাপে শীর্ণ। ত্রিবেণীর উষর বালুচরে পরিত্যক্ত ফুলমামার দিকে তাকিয়ে বললেন, "সংসারের দেনা-পাওনা সবই বাকী রেখে আমার চলে যাবার সময় হল। কিন্তু শ্মশানের অনলে দগ্ধ মানুষের আত্মা সর্বজন পরিত্যক্ত হয়ে

এককোঁটা জলের জন্য হাহাকার করে। আমার সেই জলবিন্দুর প্রত্যাশাও নেই। শুনেছি পরপারে তৃষিত আত্মা সপত্নীপুত্রের জলগণ্ডুষে তৃপ্ত হয়। বিনয় নাকি বড় বিদ্বান হয়েছে। তাকে নিয়ে এসো! সেই আমার মুখাগ্নি করবে। আর জলবিন্দু দেবে।"

: ফুলমামা কি বললেন?

: ফুলমামার অর্দ্ধস্থবির দেহটা কেঁপে উঠল। তারই নির্দেশে আমি বিলেতে টেলিগ্রাম পাঠালাম। বিনয়বাবু এলেন।

: বিনয়বাবু এসে তাঁর দেখা পেয়েছিলেন?

: পেয়েছিলেন। কিন্তু তখন আর সময় নেই। বিনয়বাবুর মাথায় হাত রেখে ছলছল চোখে ফুলমামীমা শুধু বলেছিলেন যে, মণিমালার সঙ্গে তার রক্তের সম্পর্ক। বাকীটুকু বলা হল না। শেষ পর্যান্ত ফুলমামার নির্দেশে বিনয়বাবুই মামীর মুখাগ্নি এবং শ্রাদ্ধাদি করলেন। তাতেই তার জিজ্ঞাসা আরও সহস্র গুণ বেড়ে গেল।

: মণির সঙ্গে তার যোগাযোগ হল কি ভাবে?

: শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে যোগানন্দ মণিমালাকে নিয়ে এলো। দীর্ঘদিন পরে দুজনে দেখা হল। বিনয়বাবু শ্রাদ্ধান্তে তাদের সঙ্গে কুচবিহারে চলে গেলেন। কুচবিহারে যাবার পূর্বে আমি বিনয়বাবুকে এলাহাবাদ জেলখানার সামনে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছি।

: জেলখানার সামনে ঘোরাঘুরি কেন?

: মণিমালার সঙ্গে রক্তের সম্বন্ধের কথা জেনে, মণিমালার পিতা বলে পরিচিত তৎকালীন গ্র্যাণ্ড এ্যাণ্ড কোং-এর পরিচালকের সঙ্গে সম্বন্ধটা অনুমান করে নিলেন। কিন্তু তিনি ততদিনে কারা-গারের অন্তরালে।

: তুই তখন সত্য পরিচয় দিয়ে হতভাগ্যকে যন্ত্রণার হাত থেকে অব্যাহতি দিস্‌নি কেন?

: তখন যে আমি জানতাম না ভাই। আমি জেনেছি অনেক পরে।

[কুড়ি]

ততক্ষণে আমরা জরাসন্ধ বৈঠকের কাছে নেমে এসেছি। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি দীপাবলিতে রাজগৃহ অপরূপ শোভা ধারণ করেছে। এত আলোর সমারোহের মধ্যে মণিমালা হয়ত অন্ধকারে দিশেহারা হয়েছে। দুপুরে খাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলে এসেছি। আমার পথ চেয়ে সারাদিন অসুস্থ শরীরে বোধহয় অভুক্তই আছে। বিনয়বাবুর খাওয়া হয়েছে কিনা জানি না। অভুক্তা মণিমালার উদ্বেগ দূর করতে সম্ভব-অসম্ভব নানা স্থানে হয়ত ক্লান্ত শরীরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

আমার জন্য মণিমালার উদ্বেগের শেষ নেই, এটা বিনয়বাবু কি চোখে দেখেন ঠিক বুঝতে পারি নি। মণির জন্য বিনয়বাবুর উদ্বেগটা আমি এতদিন উদ্বেগের সঙ্গে পরিপাক করেছি। আজ তাদের মধ্যে পরস্পরের জন্য উদ্বেগ, এক নতুন পরিচয়ে আমার মর্ম-দুয়ারে উপস্থিত।

বিনয়বাবু জানেন যে, মণিমালার সঙ্গে তার রক্তের সম্পর্ক। কিন্তু সেই সম্পর্কের গ্রন্থি অন্বেষণ করতে তিনি জেলখানার লৌহ-কপাটের কাছে ঘোরাঘুরি করেছেন। মূলসূত্রের সন্ধান তিনি পেয়েছেন বলে মনে হয় না। রজনীর অন্ধকারে সেই সূত্র লুকিয়ে আছে। নক্ষত্রালোকেও নয় আর রাজগৃহের এই অপরিমিত আলোর সমারোহের মধ্যেও সে সূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের সুড়ঙ্গে যার জন্ম, তার সূত্র সন্ধানও অন্ধকারেই মিলবে।

অন্যদিকে ফুলমামার আশ্রয়ে পরিচালিত মিছিলের যাত্রী কিশোর বিনয় থেকে বালিকা মণিমালা বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। দীর্ঘ-দিনের ব্যবধানে উভয়ে উভয়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন। তারপরে

আবার সাক্ষাতের পরে, বিনয়বাবুর কথা বাদ দিলেও, মণিমালা কী ভাবে কে জানে ?

বড়ই অবসন্ন বোধ করতে লাগলাম। মনে হতে লাগল, একটু একা থাকতে পারলে, আগাগোড়া বিষয়ে একটা চিন্তা করা যেতো। কি অশুভ ক্ষণে পাশ সুন্দরী আমার কানটি ধরে এখানে টেনে এনেছিল জানি না। কোন্ অতীতে অজ্ঞাত এক মণিমালা বিরাট অজ্ঞাত ইতিহাস পিছনে রেখে আমার সামনে উদয় হয়েছিল। ও বয়সে অমন কত উদয় হয় আর মিলিয়ে যায়। ঐ তো কৃষ্ণপদ কত উদয়-বিলয়ের ইতিহাসের মসিলিপ্ত মুখখানায় হেভী মেক্আপ দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে দর্শনশাস্ত্র অনুধ্যান করে চলেছে। আমার কপালেই যত যন্ত্রণা।

আমি বললাম : কেষ্ট, তুই এগিয়ে যা, আমি পরে যাচ্ছি।

কৃষ্ণপদ জানাল আমাকে একলা ফেলে রেখে তার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। ক্লান্ত চরণে এগিয়ে যেতে যেতে ভাবতে লাগলাম, নাটকের মধ্যপথে পাদপ্রদীপের আলো নিবিয়ে দিয়ে সরে পড়তে পারলে মন্দ হয় না। কিন্তু মুক্তির দ্বার অতিক্রমের অধিকার অর্জন বোধহয় হয় নি। পাশাপাশি দুটি ঘরে বাস করে মধ্যবর্তী দ্বার উন্মুক্ত থাকা সত্বেও, না পারলাম আমি হৃষ্টমনে সে দ্বার অতিক্রম করতে, না পারল মণিমালা। মণিমালা এসেছিল ঘুমের মধ্যে দেখা আমার স্বপ্ন ভাঙ্গাতে। স্বপ্ন ভেঙ্গে আমি আবিষ্কার করলাম, পাতাল থেকে উৎসারিত জলরাশির শঙ্কটাবর্ত মানবিক বিকার ছাড়া কিছু নয়। সোনাগিরির উৎস থেকে নির্ঝরিত শীর্ণ জলধারা বানগঙ্গার পথে কোন আবর্ত সৃষ্টি করে নি।

কৃষ্ণপদ বলল : ঐ যে কুণ্ডের পাশ দিয়ে রাস্তাটা চলেছে, ওটা কোথায় গিয়ে শেষ হল ?

আমি : কোন পথেরই কোথাও শেষ নেই ভাই।

কৃষ্ণ : তা তুই এত বিচলিত হচ্ছিস্ কেন ? আজ কোথায়

বা মণিমালা আর কোথায় বা তুই? বলেই মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

দেখে আমার অঙ্গ জ্বলে গেল। হয়ত মণির অবস্থানের কথা সবই জানে। জানে যদি, জানুক। পূর্বে উভয়ের সাক্ষাৎটা যতখানি অবাঞ্ছিত ভেবেছিলাম, এখন তা ভাবছি না।

কেষ্ট বলল: ফুলমামার জন্য বড় বিব্রত বোধ করি। যতই তাঁর জীবন-দীপ ক্রমে নিবে আসছে, ততই বিনয়বাবু আর মণি-মালাকে দেখবার ব্যাকুলতা বাড়ছে।

আমি: তুমি জান তো ওরা কোথায় আছে?

: জানি।

চমকে উঠে বললাম: তবে দেখা করিয়ে দেনা। ভাবনা কি?

: ভাবনা সেজন্য নয়। ভাবনা এইজন্য যে এই সুন্দর মুখখানা নিয়ে মণির সামনে হাজির হব কি করে?

: মণি কি এখনও তোর সুন্দর মুখখানা দেখবার প্রত্যাশায় বসে আছে?

: তা জানি না। তবে মণির কাছে আমার এই মুখটা দেখাতে পারব না। ফুলমামীর মুখে ওর সঙ্গে আমার রক্তের সম্পর্কের কথা শুনে তাকে একটি কথাও না বলে সেই যে নিরুদ্দেশ হয়েছিলাম, তারপরে সংসারের যাবতীয় অন্ধকার পথে যাতায়াত করে যত কালি সব মুখে মেখেছি। যত প্রসাধন লাগাই না কেন, এ জিনিস চাপা পড়বার নয়। মণি ঠিক ধরে ফেলবে।

: মণিমালা বুঝে ফেললেই বা' তোর লোকসান কি?

: দুনিয়ার সব কারবার লাভ-লোকসানের হিসেবে চলে না। তবে তোর জেলাস হবার কোন কারণ নেই। মণিমালার হৃদয়ে তুই সম্রাট হয়ে থাক্।

: আমার সম্রাট হয়ে কাজ নেই ভাই। আমিও একটা সমাজে বাস করি। সেখানে নিয়ম-শৃঙ্খলা আছে, পাপ-পুণ্য আছে।

: জীবনে পাপপুণ্য বিচারের অবকাশ পাই নি। সমাজ-

সংসারের নিয়ম-শৃঙ্খলাও আপেক্ষিক সত্য। মানুষের প্রয়োজনে, দেশে-দেশান্তরে, কালে-কালান্তরে তার পরিবর্তন হয়। আর বিবেকের কথা যদি বলিস্ তাও নির্ভর করে নিজ নিজ শিক্ষাদীক্ষার ওপর।

এই কথা বলতে বলতে যেই ব্রহ্মকুণ্ডের চত্বরে পা দিয়েছি, অমনি সব অন্ধকার। লোড্ সেডিং। আমাদের অসম্পূর্ণ নব্য-সভ্যতার গ্লানি। তখনও কুণ্ডের চত্বরে বেশ ভীড়। অন্ধকার হতেই চতুর্দিকে একটা সামান্য আতঙ্কের ভাব। সকলেরই প্রায় অপরিচিত স্থান। সুতরাং অপরিচয়ের একটা সংশয় থাকাই স্বাভাবিক। অপরিচয়ের অন্ধকার পরিচয়ের আলোকে অপসৃত হয়।

অন্ধকারটা চোখে একটু সহ্য হয়ে আসতেই একপা একপা করে এগিয়েএসে অশ্বত্থ গাছের নীচে দাঁড়ালাম। কৃষ্ণপদর বড়ই প্রিয় স্থান। এইখান থেকেই সে দর্শনশাস্ত্রের চর্চা করে। কিন্তু আজ অন্ধকারের গ্লানি তার সর্বশাস্ত্রকে পরাভূত করেছে। সে বলেছে সংসারের নিকষ কালো অন্ধকারে থেকে অর্জিত কলঙ্কের ছাপ তার সর্বাঙ্গে। গ্র্যাণ্ড এ্যাণ্ড কোম্পানীর একদা তরুণ কর্ণধার কোন মন্ত্রবলে কারাগারের অন্তরালে প্রবেশ ক'রে সকল লজ্জার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে কিন্তু দিবসের আলোতে কৃষ্ণপদর একমাত্র অবলম্বন মুখের ওপর উগ্র প্রসাধন।

কৃষ্ণপদ তাড়াতাড়ি বলে উঠল: আমি আর দেরী করতে পারব না। ফুলমামা অন্ধকারে বড় ভয় পান। একদিন রাজ্যের অন্ধকার পথে যাতায়াত ক'রে, আজ অন্ধকারকে যত ভয়। বলেই এগিয়ে গেল। আমি দেখলাম পিপ্পলী বৃক্ষের নীচে একেবারে অন্ধকারে একাকার। পত্রাবকাশে নির্গলিত আলোর রেখায় চিত্রিত বিচিত্র ইতিহাসের চিহ্নমাত্র নেই। অন্ধকারের ইতিহাস বুঝি ভিন্ন। অন্ধকারের বুকে লিখিত ইতিহাস কৃষ্ণপদর সর্বাঙ্গে মসিচিহ্নে চিহ্নিত। উগ্র প্রসাধন লাগিয়েও সে মণিমালার সামনে যেতে পারে না।

এই সব চিন্তা করতে করতেই দেখি, কৃষ্ণপদ হাতে একটা ঠোঙ্গায় খাবার নিয়ে বলছে: সেই সকালে কিছু না খেয়েই চলে এসেছিস্। এইটে খেয়ে কুণ্ডের জল খেয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ী যা। আমার দাঁড়াবার সময় নেই।

মনে মনে ভাবলাম, অন্ধকারের নায়ক বুঝি অন্ধকারেই নিজের সত্য পরিচয় প্রকাশ করে। তা নাহলে অন্ধকার হতেই আমার অনাহারের যন্ত্রণায় সে কাতর হবে কেন।

বাসার দিকে পা বাড়াব ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ মহিলা কণ্ঠে আর্তস্বর। পেছন ফিরে দেখি ব্যাসকুণ্ডের সামনে একটা ভীড়। সেই ভীড়ের মধ্যে কয়েকজন লোক একটা লোককে নির্দয় ভাবে প্রহার করছে। বর্তমান মানষিক অবস্থাতে ও সব গণ্ডগোলে মনোযোগ দেবার মত ধৈর্য্য নেই। কিন্তু স্থানটা মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট ব্যাসকুণ্ডের কাছে। এমতাবস্থায় আমার বন্ধুবর যদি আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে থাকেন, তবে আমার পক্ষে চুপ করে থাকা অসম্ভব। এগিয়ে গিয়ে দেখি একজন সুবেশ যুবকের দীর্ঘ কেশরাশি ভাগ করে নিয়ে দুতিন জনে ধরে আছে, এবং চতুর্দিকে বেষ্টিত বীরপুরুষগণ, কেউ বা প্রহার করছেন, কেউ বা প্রহারের নির্দেশ দান করছেন। মণ্ডলীকৃত সেই বীরপুরুষগণ সর্বভারতীয় প্রতিনিধিত্বের দাবী করতে পারে। একমন, একপ্রাণ না হলে বিভিন্ন প্রান্তের ভারতবাসী এমন একতাবদ্ধ হতে পারে না। আক্রমণের লক্ষ্যস্থল হতভাগ্য বঙ্গসন্তান। আক্রমণের বেগ সহ্য করতে না পেরে ভদ্রলোক কেঁদে ভাসিয়ে দিয়ে শুধু চিৎকার করে বোঝাতে চেষ্টা করছেন যে তিনি নির্দোষ। কিন্তু বীরত্বপ্রকাশের এমন সুযোগ থেকে সহজে কেউ নিবৃত্ত হতে চায় না।

কাছেই দেখি দু'একজন ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে প্রহারের তারিফ করছেন। আমি ভদ্রলোককে প্রহারের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে একজন ভদ্রমহিলা জানালেন যে প্রহারের সঠিক কারণ তাঁরা জানেন

না, তবে লোকটা একনম্বরের অসভ্য। আমি অসভ্যতার নির্দশন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করাতে অন্য ভদ্রমহিলা বললেন : অসভ্য না হলে মার খাবে কেন? আমি ভাবলাম যে, চমৎকার লজিক।

আমি : আপনাদের মধ্যে ভয়ে চিৎকার করেছিলেন কে?

জনৈক ভদ্রমহিলা বললেন, সিক্ত বসন পরিবর্তন কালে তিনি নীচে জঙ্গলের মধ্যে একটা অদ্ভুত জানোয়ার দেখে চিৎকার করে উঠেছিলেন।

ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। হিংস্র জন্তুর ভয়ে ভদ্রমহিলার চিৎকার এবং ঠিক সেই সময়ে নিরীহ ভদ্রলোকের আকস্মিক উপস্থিতি বীরপুরুষদের বীরত্বে উদ্বুদ্ধ করেছে।

অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে ভীড়ের মধ্যে হঠাৎ প্রবেশ করতেই প্রহার বন্ধ হল। সঙ্গবদ্ধ আক্রমণের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে একে অন্যের মুখের দিকে তাকিয়ে ক্রমে স্থান ত্যাগ করতে লাগল। কারণ জরুরী প্রয়োজন ছাড়া কেউ ঘরের খেয়ে বন্য মহিষ তাড়াতে চায় না। ক্রন্দনরত ভদ্রলোককে কোনও প্রকারে শান্ত করে রওনা করে দিলাম। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি রাত সাড়ে দশটা।

অন্ধকারের মধ্যে সিঁড়ি দিয়ে বাজারের দিকে নেমে যেতে যেতে ভাবলাম, অন্ধকারের মধ্যে এতক্ষণ অন্ধকার-ভীত ফুলমামাকে নিয়ে কৃষ্ণপদ কি করছে কে জানে। মণি এতক্ষণ কান্নাকাটি আরম্ভ করেছে নিশ্চয়ই। অথবা শ্যামসুন্দরবাবুর বাড়ীতে গিয়ে আরতির অবস্থান পরীক্ষা করছে। হয়ত বিনয়বাবু কোথায় কোথায় আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন কে জানে। যত দিন যাচ্ছে ততই বিনয়বাবুর পাণ্ডিত্যের কথা শুনতে পারছি! অথচ অহঙ্কার তো দূরের কথা, ভদ্রলোকের বিনয়ের শেষ নেই। হয়ত নিজের অজ্ঞাত পাপের জন্য বিশ্বের দরবারে প্রায়শ্চিত্তের প্রার্থনা। নটী সলাবতীর পুত্র জীবক যদি পণ্ডিত সভায় শ্রদ্ধার আসন পেয়ে থাকেন, তবে বিনয়বাবু

কেন পাবেন না? যদি পেতেন তবে সুবিচার হোত। শুধু সত্যবতীই বা কেন? জন্ম রহস্যে ঘেরা কত চরিত্র ইতিহাসে, পুরাণে অমর হয়ে আছে।

[একুশ

কূলকিনারা-হীন চিন্তা ভাবনা নিয়ে এক সময়ে ভুবনেশ্বরের ভুবনের সামনে এসে দেখি, আমাদের ঘরে কেরোসিনের স্বল্প আলোকে বেশী লোকের ভীড়। করাঘাত করতেই আলো জ্বলে উঠল এবং যিনি দরজা খুলে হাসিমুখে আমাকে অভ্যর্থনা করলেন, তিনি শকুন্তলা দিদি। তিনি বললেন : তুমি কি ভাই সকলকে পাগল না করে ছাড়বে না?

সকলকে উন্মাদে রূপান্তরিত করবার মনোবাসনা আমার আছে কি নেই—সে কথা প্রকাশ না করে দাঁড়িয়েই ছিলাম। শ্যামসুন্দর বাবু হাসি হাসি মুখে বললেন : খুঁজতে কোন জায়গা বাকী রাখি নি ভাই। এমন কি থানা, হাসপাতাল পর্য্যন্ত। কোন্ গিরি-গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলে?

অপরাধীর মত নতমস্তকে দাঁড়িয়ে থেকে দেখলাম মণিমালা নিঃশব্দে ধীরে ধীরে পাশের ঘরে চলে গেলো। বুঝলাম, অভিমানের বোঝা নামাতে পাশের ঘরে গেল। তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত না থাকলে, এতক্ষণ কী কাণ্ড হত জানি না।

শকুন্তলাদি বললেন : অসুস্থ মেয়েটা সারাদিন না খেয়ে আছে। আর দেরী কোরো না ভাই। হাতমুখ ধুয়ে খেয়ে নাও।

আমি একপা একপা করে নতমস্তকে পাশের ঘরে গিয়ে দেখি,

মণি বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। এতক্ষণে মনে হয় বালিশ ভিজে গেল। আমি নারী হৃদয়কে জখম করতে চরম আঘাত হানলাম। পিঠে হাত রেখে আস্তে বললাম : খিদেতে পেটটা জ্বলে গেল।

উদ্দেশ্য সফল হ'ল। মণিমালা তৎক্ষণাৎ উঠে বসল। চোখ দুটো মুছে নীরবে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। আমিও আমার ঘরে এসে ওদেরকে বললাম : আপনারা অনেক যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। এইবার বাড়ী যান। অনেক রাত হয়েছে। কিন্তু বিনয়বাবু কি এখনও আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন নাকি?

দিদি আর শ্যামসুন্দরবাবু উভয়ে দৃষ্টি বিনিময় ক'রে, দিদি বললেন : বিনয়বাবু আজ চলে গেছেন।

: কোথায়?

: কলকাতায়। আজ টেলিগ্রাম এসেছে, কাল কন্‌ফারেন্স আরম্ভ হবে। সকালের মধ্যে অবশ্যই পৌঁছতে হবে।

আমি ব্যাকুল হয়ে বললাম : তবে মণিমালার ব্যবস্থা?

দিদি : তিনি নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নিরুদ্দেশ তোমার সন্ধান না করে, মেয়ে কিছুতেই যেতে রাজী হল না।

: আমি ছেলেমানুষ নই। বিশ্বভুবন একাই ঘুরে বেড়াই। খুঁজে বেড়াবার জন্য সঙ্গে লোক থাকে না। আমার জন্য এই বিভ্রাটের সৃষ্টি না করলেও হোত।

এমন সময় ভীষণ গম্ভীর মুখে মণিমালা হাজির হয়ে বলল : আপাততঃ কিছু মুখে দিয়ে আমাকে মুক্তি দিলে, কারও বিভ্রাট যাতে না হয় তার ব্যবস্থা আমি করব।

মণির মুখ দেখে খাবার ইচ্ছা আমার মাথায় উঠেছে। বিভ্রাট-মুক্তির কি ব্যবস্থা সে মনে মনে ঠিক করল, তারই সম্ভব অসম্ভব কিছু কিছু অনুমান করে কণ্টকিত হৃদয়ে অগ্রসর হলাম। ইতিমধ্যে মণিমালা দিদিকে যেতে বারণ করল। ভাবলাম, কেবল আহার

শেষ হবার প্রতীক্ষা মাত্র। তারপরেই বিভ্রাট-মুক্তির আখ্যান নিয়ে আমার জন্য এক অজ্ঞাত নাটক অপেক্ষা করছে। সুতরাং যবনিকা উত্তোলনের পূর্বেই অভুক্তা মণিমালাকে কিছু খাওয়াতে হবে। বললাম—

: তোমার খাবার কোথায় ?

: আমার জন্য অনেক ভেবেছ। নতুন করে কিছু না ভাবলেও তোমার সত্যনিষ্ঠার প্রাসাদ ভেঙ্গে পড়বে না।

: যত কঠিন আঘাতই কর না কেন, তোমার খাওয়া না হলে আমি খাব না।

: আজ আমার উপবাস।

: তাহলে উপবাসের যোগ্য খাদ্য খাও।

: উপবাসের আবার কিছু যোগ্য খাদ্য আছে নাকি ?

: তা বলে তুমি না খেয়ে থাকবে ? তোমার উপবাস থাকলে দিদি ওকথা বললেন কেন যে, তুমি অভুক্তা আছ ? দিদিকে ডাকব ?

মণিমালা কুঞ্চিত ললাটে বলে উঠল : উপবাসের দিন ভাত খেয়ে আমি নরকে যাব নাকি ? তোমার সত্যনিষ্ঠার বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত কি বলে ?

আমি চুপ করে বসেই ছিলাম। এমন সময় সদর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। আমি উৎকর্ণ হয়ে থাকলাম। মণিমালা এগিয়ে গেল। সদর দরজা খোলার শব্দ পেলাম। শ্যামসুন্দরবাবুর সঙ্গে একটি অপরিচিত কণ্ঠের হিন্দুস্থানী ভাষায় কথাবার্তা কানে এলো। মণিমালা ফিরে এলো, কিন্তু নির্বাক। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আগন্তুক কে ?

মণি : কেষ্টবাবু বলে এক ভদ্রলোক চিঠি লিখে পাঠিয়েছে।

আমি চমকে উঠে বললাম : কোন্ কেষ্টবাবু ? কাকে লিখেছে ?

মণি : আমি কি পৃথিবীর সব কেষ্টবাবুকে চিনে রেখেছি নাকি ? শ্যামসুন্দরবাবুর কোনও বন্ধু বোধহয়।

আমি : তুমি কিছু জিজ্ঞাসা কর নি?

: না।

: তবে তুমি কি করে জানলে, শ্যামসুন্দরবাবুর বন্ধু?

: তোমার বন্ধু মনে করলে যদি শান্তি পাও, তাই মনে করে দয়া ক'রে খেয়ে নাও।

আমি সাজানো থালা সরিয়ে রেখে উঠে পড়তেই মণি বলল : সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি। একটু কিছু মুখে দিয়ে উঠলে, তোমার কেষ্টবাবুর সর্বনাশ হোত না।

আমি কোন জবাব না দিয়ে তাড়াতাড়ি দরজার কাছে গিয়ে দেখি, একটি লোক—বোধহয় গাড়োয়ান—দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। শ্যামসুন্দরবাবুর হাতে একখানা খামে মোড়া চিঠি। ঠিকানাটায় আমার নাম। আমি তাড়াতাড়ি চিঠিখানা নিয়ে খুলে ফেলে দেখি, কেষ্ট আমাকে চিঠি লিখেছে—

ভাই·········

অন্ধকারের মধ্যে বাড়ী ফিরে দেখি, ফুলমামার শেষ অবস্থা। অস্পষ্ট স্বরে কি বললেন সব বুঝলাম না। শুধু "বিনয়" আর "মণি" এই কথা দুটো বুঝতে পারলাম। দৌড়ে তোদেরকে ডাকতে যেতেই পথে বিনয়বাবুর সঙ্গে দেখা। তিনি কলকাতার পথে ষ্টেশনে যাচ্ছিলেন। তাঁকে ফুলমামার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। তুই জানিস মণির সামনে আমি যাব না। তুই মণিকে নিয়ে এই টাঙ্গায় চলে যা। তাঁর শেষ ইচ্ছা। ইতি—

"কেষ্ট"

আমি চিঠিখানা হাতে নিয়ে স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে আছি। ততক্ষণে মণিমালা এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল : কার চিঠি?

: কেষ্টর।

: কোন কেষ্ট?

আমি : সংসারের হাজার হাজার কেষ্টর মধ্যে যাকে তুমি চেন সেই কেষ্ট।

: সে কে?

: এলাহাবাদের কৃষ্ণপদ।

বিস্ফারিত ছুটি চক্ষু নিয়ে মণি ছুপা পিছিয়ে গিয়ে বলল : সে কোথায়?

: এখানেই এসেছে, তার ফুলমামাকে নিয়ে। সেই ফুলমামার শেষ সময়। তিনি তোমাকে দেখতে চেয়েছেন। যাবে?

: যাব। তিনি আমার মেসোমশায়। তাঁর শেষ সময়? তিনি এখানে আছেন আর আমি জানি না?

বিস্মিত শ্যামসুন্দরবাবু ও দিদিকে ফিরে এসে সব বলব, একথা জানিয়ে, তাঁদেরকে রওনা করে দিয়ে, মণিকে নিয়ে টাঙ্গায় বসলাম। সাজানো থালা অন্ধকার ঘরে তালাবদ্ধ হয়ে পড়ে থাকল।

জনবিরল পথ দিয়ে টাঙ্গা এগিয়ে চলেছে। আমি আর মণিমালা বসে আছি। মণির মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল সে যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করে একটা রুদ্ধদ্বার অন্ধকার কক্ষে কি অনুসন্ধান করছে। কিন্তু নিঃশ্বাস বন্ধ করে মানুষ কতক্ষণ থাকতে পারে? সে আস্তে আস্তে বলল : কেষ্টদার সঙ্গে তোমার কতদিনের পরিচয়?

: এখানে তো দেখা হল কাল।

: আমি আগেকার কথা জিজ্ঞাসা করছি।

: আগেও পরিচয় ছিল। তুমি জান না? কেষ্ট কুচবিহারে পড়ত। সেখানেই সহপাঠি হিসেবে আলাপ।

: তারও আগে? তুমি এলাহাবাদ যাওনি কোনদিন?

আমি মণিমালার উদ্বেগ লক্ষ্য করলাম। কেষ্টর সঙ্গে মণিমালার সম্পর্কের কথা আমি কতখানি জানি, তাই তার জ্ঞাতব্য। আমি তার উদ্বেগ দূর করবার জন্য বললাম : এলাহাবাদে আমি কখনও

যাইনি। কুচবিহারেও আরও দশজন সহপাঠির সঙ্গে যেমন, কেষ্টর সঙ্গেও তেমনি আলাপ।

মণি : আমি এখানে আছি, একথা কেষ্টদা কি করে জানল? তুমি বলেছ?

: আমি কেন বলতে যাব? সে হয় তো তোমার সঙ্গে আমাকে দেখে থাকবে। সে সব আলোচনা পরে করব মণি। তোমার পথ চেয়ে কেষ্টর ফুলমামা তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ধরে রেখেছেন।

: কেষ্টদা আমার বাবার কথা কিছু বলেছেন?

আমার এলাহাবাদ জেলখানার কথা মনে পড়ল। বিনয়বাবু, মণিমালার সঙ্গে রক্তের সম্বন্ধের কথা জেনে, জেলখানার সামনে ঘোরাঘুরি করতেন, কারণ মণির বাবা, তৎকালীন গ্র্যাণ্ড এ্যাণ্ড কোম্পানীর কর্ণধার, তখন কারাগৃহে। কোনও কিছু না জানার ভান করে মণিকে নিশ্চিন্ত করলাম। রাত্রির নিস্তব্ধতায় মণিমালার দীর্ঘনিশ্বাসটা গোপন থাকল না।

মণির ভারাক্রান্ত মুখখানা দেখে আমার মনটা একেবারে বিরস হয়ে থাকল। আমি বাঁ হাতে মণির দেহখানা ধরে একটু কাছে টানতেই, সে একবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে, নিজের মুখখানা আমার কাঁধের ওপর রেখে চুপ করে বসে থাকল। অন্য সময় হলে এই প্রাপ্তির আনন্দে তার সর্বদেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠত। নিতান্ত ঘনিষ্ঠতায় দেহখানাতে সেদিন কোন ভাবান্তর অনুভব করি নি। চতুর্দিকে নৈরাশ্যের অন্ধকারের মধ্যে একটুখানি আলোর সন্ধান ব্যতীত সেদিন তার আর অন্য আকাঙ্ক্ষা কিছু ছিল না।

[বাইশ]

পি-ডবলিউ-ডি রেস্টহাউসের সামনে গাড়ী থামতেই আমরা নেমে পড়লাম। বেয়ারা আমাদের একটা সুসজ্জিত ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। দেখলাম, শয্যার ওপরে পাতালপুরীর অর্দ্ধপথে দেখে

আসা সেই অর্দ্ধস্থবির মূর্তি চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন। দেহ অচৈতন্য বলেই মনে হয়। বিনয়বাবু পায়ের ওপর মাথা রেখে নীরব, নিথর হয়ে বসে আছেন। বুঝলাম, তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের পালা শেষ হয়েছে। আমি মণিকে বললাম, এগিয়ে গিয়ে ঐ অচৈতন্য—প্রায় দেহ স্পর্শ করতে। মণি তাই করাতে ঐ শায়িত দেহ যেন একটু কেঁপে উঠল, অধরোষ্ঠ নড়ে উঠল আর চক্ষুপল্লব যেন ঈশৎ উন্মুক্ত হ'ল। মণি নিজের মুখখানা ফুলমামার মুখের দিকে এগিয়ে নিতেই কি কানে এলো জানি না।

নিকটে বজ্রপাত হলে মানুষের মুখের চেহারায় যে প্রতিক্রিয়া হয়, হঠাৎ মণিমালার মুখে সেই পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মত সোজা খাড়া হয়ে সে কঠিন স্বরে বলল : কেষ্টদা কোথায় ?

বুঝলাম বৃদ্ধের অন্তিম ঘোষণায় বিভ্রান্ত, দিশেহারা মণিমালা সত্যতার প্রমাণ চায়।

আমি সভয়ে বললাম : কেষ্ট তোমার সামনে আসবে না মণি।

: লুকোচুরি খেলার সময় নেই। তাকে এখুনি চাই।

: ব্যস্ত হয়ো না।

: পায়ের নীচে থেকে পৃথিবীটা সরে গেলে মানুষ কি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে পারে মামা ?

ইতিমধ্যে অশ্বত্থ গাছের পত্রাবকাশে নির্গলিত আলোর রেখায় চিত্রিত ইতিহাসের জন্মদাতা, কৃষ্ণপদর ফুলমামা ত্রিবেণী সঙ্গমের গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর মোহনায় অর্জিত জীবনের সর্ব পরিতাপ মুক্ত হয়ে কোন রহস্য লোকে পাড়ি দিলেন।

চশমাবিহীন বিনয়বাবুর মুখখানা তখনও ফুলমামার পদযুগলের ওপর ন্যস্ত ছিল। স্পষ্ট দেখলাম—বাঁ কানের পিছন দিকে একই অডুল চিহ্ন স্বমহিমায় অবস্থিত। মনে মনে ভাবলাম, এই দেহ ভস্মীভূত হবার আগেই সকল সন্দেহ দূর করে, মণিকে সত্য স্বীকার

করে নেবার সুযোগ দিতে হবে।

আমি মণিকে কাছে ডেকে, মৃতদেহের বাঁ কানটা সরিয়ে সেই পর্বত প্রমাণ ইতিহাসের কেন্দ্র, চিহ্নটি দেখিয়ে, বিনয়বাবুর উক্ত চিহ্নটি দেখালাম। মণি তার নিষ্পলক দৃষ্টি আমার দিকে নিবদ্ধ করে রেখেছে। আমি তার নিজের ঐ স্থানটি দেখিয়ে দিতেই, তার হঠাৎ কি মনে হ'ল। সে আয়নার সামনে গেল না। নতুন করে দেখার বোধহয় প্রয়োজন নেই। জীবনে বহুবার বহুভাবে নিজের অঙ্গে ঐ চিহ্ন সে দেখেছে। কোনও দিন ভাবতেও পারে নি, সামান্য একটি গাত্রচর্মের দাগ এমন প্রবলভাবে মানুষের জীবনে প্রভাব বিস্তার করতে পারে!

স্থান কাল পাত্র বিস্মৃত হয়ে, মণিমালা আনত বিনয়বাবুর দেহখানার পাশে বসে নিজের মাথাটা মৃতদেহের পায়ের ওপর রেখে বিনয়বাবুর কণ্ঠদেশ জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলে অনেক কথাই বলল, কিন্তু তার বিশেষ কিছুই বোঝা গেল না। শুধু মাঝে মাঝে দু'একবার "দাদা" শব্দটি বোঝা গেল। তারপরে শুধুই চোখের জল আর কান্না। তার যেন আদি নেই, তার যেন অন্ত নেই। বিনয়-বাবুর আনত মস্তক তখনও পায়ের ওপর পড়ে আছে। মনে হয় যেন মাথা সোজা করে এই সহজ অথবা কুটিল পৃথিবীটার দিকে তাকাতে যেন তার প্রস্তুতির প্রয়োজন। সেই প্রস্তুতির শক্তি সঞ্চয়ে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন।

*　　*　　*　　*

বিনয়বাবু এবং মণিমালা উভয়েই মুখাগ্নি করলেন। অন্তরালে অবস্থিত কৃষ্ণপদর আনুকূল্যে সংগৃহীত পর্যাপ্ত চন্দন কাষ্ঠে সিঞ্চিত গব্যঘৃতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। ত্রিবেণী সঙ্গমের মহানায়কের নশ্বর দেহ পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

পরদিন মণিমালা এবং বিনয়বাবু সিক্ত বস্ত্রে এবং সিক্ত নয়নে পাত্রপূর্ণ জল এবং দুধ নিয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করলেন—

শ্মশানানল দগ্ধোঽসি পরিত্যক্তোঽসি বান্ধবৈঃ।
ইদম্ নীরম্ ইদম্ ক্ষীরম্, অত্র স্নাহি ইদং পিব॥

ফুলমামার অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত আত্মার শ্রবনেন্দ্রিয় ছিল কিনা জানি না। এই মন্ত্রোচ্চারণের আকুলতা তার ইন্দ্রিয় গোচর হয়েছিল কিনা—তাও অজ্ঞাত। কিন্তু শ্মশানের অনলে তাপিত আত্মা বিনয়বাবু ও মণিমালার দেওয়া জলে স্নান করে বুঝি শীতল হয়েছে। তাদেরই দেওয়া দুগ্ধেও বোধহয় ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করেছিলেন।

প্রয়াগের ক্ষেত্রে কৃষ্ণপদর ফুলমামার জীবনে একে একে এলো গুপ্ত সরস্বতী, পুণ্যবতী গঙ্গা আর বেগবতী যমুনা। ত্রিবেণীর মহিমা প্রভাবে, পূর্ণ সমারোহ। গঙ্গার তীরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফুলমামা ক্রমে ক্রমে দেখলেন—লুপ্ত সরস্বতীর উষর বালুচরে পরিত্যক্ত বিনয়চন্দ্র, যমুনার স্রোতে ভেসে আসা মণিমালা। তারপরে একদিন চৈত্রের দাবদাহে গঙ্গার প্রবাহ গেল শুকিয়ে। রিক্ত, সর্বহারা ফুলমামা একদিন পঞ্চ-পর্বতের উপত্যকায় বানগঙ্গার তীরে নিজেও লুপ্ত হয়ে গেলেন। কে জানে পরিত্যক্ত রাজগৃহের অবজ্ঞাত বানগঙ্গার শীর্ণ প্রবাহের সঙ্গে, লোকচক্ষুর অন্তরালে ত্রিবেণী সঙ্গমের কোনও যোগ আছে কিনা।

বিনয়বাবু একেবারে নির্বাক। মণিমালার সঙ্গে কথা বলতেও ভয় হয়। কিন্তু কর্তব্যে এবং নিষ্ঠায় উভয়েই অবিচল। চতুর্থ দিনে যথাবিহিত মণিমালার কাজ শেষ হ'ল। বিনয়বাবু অকাতরে অর্থব্যয় করে নিজের পিতৃকার্য্য সমাপ্ত করলেন। শ্যামসুন্দরবাবুর মত অমন একজন আত্মভোলা লোক এই ক'দিন একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সর্ব ব্যবস্থাপনা করেছেন। শকুন্তলাদিদি বারবার নিজের চোখের জল গোপন করে মণির চোখের জল মুছিয়ে দিয়েছেন। কৃষ্ণপদ নিজেকে সম্পূর্ণ অন্তরালে রেখেও সর্বদাই তার অস্তিত্ব ঘোষণা করেছে। নিতান্ত অকর্মণ্য আমি, শুধু অবাক বিস্ময়ে সকলের কর্মকুশলতায় হতবাক হয়েছি।

বিনয়বাবু স্থির করেছেন তিনি কলকাতার কাজ ছেড়ে দিয়ে তাঁর পূর্বস্থানে বিলেতে চলে যাবেন। মণিমালাকেও তিনি সঙ্গে যেতে বলেছেন। কিন্তু সে এখনও কিছু বলেনি। মণিমালা যাবে অথবা থাকবে, তাতে আমার ভাবনার বা বলবার কিছু নেই, এইই স্বাভাবিক। কিন্তু অস্বাভাবিক ঘটনাও জগতে ঘটে। মণি যাবার ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, এ বিষয়ে প্রকাশ্যে নীরব দর্শক হলেও, অন্তরে নিরপেক্ষ থাকা নিতান্তই বেদনাদায়ক হয়ে উঠল। মনকে শাসন করি। এইভাবেই দু একদিন চলে গেল।

একসময় দেখি মণিমালা গৃহকোণে একা বসে আছে। এতদিন সকলের কর্মব্যস্ততার মধ্যে মণির সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তাও হয় নি। বিশেষতঃ সে তার যাওয়া সম্বন্ধে কি স্থির করল—তাও জানি না। নিজে থেকে কিছু জিজ্ঞেস করতেও সঙ্কোচ বোধ হয়। এও মনে ভাবি, মণি যদি তার দাদার সঙ্গে গিয়ে মনে শান্তি লাভ করে, তবে বিচ্ছেদের বেদনা যতই কঠিন হোক, আমি আনন্দের সঙ্গে সম্মতি দেব। মণি ডাকতে আমি এগিয়ে গেলাম এবং সে বসতে বলল। দুজনে মুখোমুখি বসলাম।

একটু ম্লান হেসে মণি বলল : কার মুখ দেখে রাজগীরে রওনা হয়েছিলাম জানি না। এত ঘটনা ঘটল, মনে হচ্ছে একটা যুগ পার হয়ে এসেছি।

: সত্যি তাই। পিতৃ পরিচয় হল, পিতৃহীনাও হলে।

: ঐ যেখানে বাবাকে রেখে এলাম, ও জায়গাটাকে কি বলে ?

: বানগঙ্গা।

: আমাকে একবার বানগঙ্গায় নিয়ে যাবে ? যদি সত্যি দাদার সঙ্গে চলে যাই, তবে আর কোনও দিন দেখা হবে না।

: কেন ? বিলেতে গেলে, লোকে আর ফিরে আসে না ?

: লোকে কি করে জানি না। আমার বোধ হয় আর আসা হবে না। যাক্, তোমার একটা আপদ দূর হবে।

: তুমি আমার আপদ—এমন কথা তুমি বললে ?

: আপদ না হলে তুমি নিশ্চয়ই বাধা দিতে।

: বাধা দেবার অধিকার আমাকে সমাজ দেয় নি, সংসার দেয় নি, মণি !

: তোমাদের ঐ প্রতি কথায় সমাজ, সংসার। অধিকার কেউ কাউকে দেয় না।

: তুমি বলবে, অর্জন করতে হয়। তাই বা পারলাম কোথায় ? হয়ত আমি দুর্বল, তাই পারি না।

: তবে আর আমার কিছু বাধা নেই। বলবারও কিছু নেই।

মণি বিনয়বাবুর সঙ্গে চলে যাবে সাতসমুদ্র তের নদী পার হয়ে সেই কোন বিদেশে। সেই আসন্ন বিচ্ছেদ-বেদনা মনে গভীর ভাবে রেখাপাত করে বসে আছে। মনকে বোঝাতে চাই—এ তো মুক্তির আনন্দ। মণি নিজের জীবনকে আমার সঙ্গে জড়িয়ে ফেলে আমার যে বন্ধন সৃষ্টি করেছে, নিজেকে সরিয়ে ফেলে সে তো আমাকে মুক্তিই দিতে চলেছে : কিন্তু মনের বিষণ্ণতা কিছুতেই দূর হয় না। সারাদিন সকল ব্যস্ততার মধ্যেও এই বেদনা বোধ আমাকে কেবলই বিড়ম্বিত করে।

বিষণ্ণ মনে জানালার কাছে বোসে সেই কথাই ভাবছি। এমন সময়ে বিনয়বাবু এসে যা বললেন, তাতে আমি বিস্মিত। দেখলাম তাঁর মুখে সেই চির-পরিচিত বিনয়ের চিহ্নমাত্র নেই। মনে হল, জীবনব্যাপী তাঁর অঙ্গে তুলে দেওয়া সকল মালিন্য অপসারিত করে মুক্তিস্নানের শুচিস্নিগ্ধতায় অভিষিক্ত হয়েছেন। তিনি শান্তস্বরে বললেন : মণিমালা তো কিছুতেই আমার সঙ্গে যেতে রাজী হচ্ছে না।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম : সে কি !

: ওকে তো জানেন। একবার যা বলবে, তা করবেই। আমি আজই রওনা হয়ে যাব। ওর সম্বন্ধে যা করণীয় তা আপনি করবেন।

আমার আর দেরী করবার উপায় নেই।

এমন সময় মণি এসে প্রবেশ করল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: তুমি নাকি তোমার দাদার সঙ্গে যাবে না?

মণি বলল: আমার জন্য তোমরা অনেক ভেবেছ। এইবার সকল ভাবনা আমার ওপরে ছেড়ে দাও। আমার স্থান নির্দিষ্ট হয়ে আছে।

নির্দিষ্ট স্থানটি বিষয়ে অনুমান করবার চেষ্টায় মণির মুখের দিকে তাকালাম। কিন্তু একেবারেই দুর্বোধ্য।

এতদিন মণির সঙ্গে বিচ্ছেদের বেদনাকেই বড় করে দেখেছি। সেই বেদনাই বিড়ম্বিত করেছে। কিন্তু তার বিপরীত অবস্থার সঙ্গে জড়িত নানা সমস্যার কথা বিশেষ মনে হয় নি। মণিকে বোঝাতে চেষ্টা করেছি, তার সঙ্গে প্রার্থিত সান্নিধ্যের পরিণতি হয়ত নতুন সঙ্কটের সৃষ্টি করবে। কিন্তু সে সিদ্ধান্তে অবিচল। বিনয়বাবু চলে যাবেন। তারপর কিছুদিন আমার সাহচর্য্যে কাটিয়ে কলকাতায় গিয়ে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেবে।

আজ বিনয়বাবু রওনা হবেন। মণিমালার সাংসারিক জীবনে বিনয়বাবুর স্থলাভিষিক্ত হয়ে কিছু কিছু প্রয়োজনীয় জিনিষ সংগ্রহ করে ফেরার পথে দেখি, অশ্বত্থ গাছের নীচে বিনয়বাবু টাঙ্গায় বসে আছেন। মণিমালা নীচে দাঁড়িয়ে। আমি কাছে আসতেই মণি বিনা বাক্যব্যয়ে গলায় আঁচল দিয়ে আমাকে প্রণাম করে আস্তে বিনয়বাবুর পাশে গিয়ে বসে পড়ল। আমার দিকে একবার তাকাল না পর্য্যন্ত। অশ্রুজল গোপন করার জন্য কিনা কে জানে।

গাড়ী ছেড়ে দিল। মণিমালার জন্য সংগ্রহ করে আনা কিছু কিছু জিনিস সহ থলেটি সকলের অজ্ঞাতে আমি গাড়ীতে তুলে দিলাম। তাকিয়ে দেখি অদূরে কৃষ্ণপদ দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখে আজ আর প্রসাধনের প্রলেপ নেই। তার পরিবর্তে আছে প্রশান্ত হাসি।

গাড়ী মোড় নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি অশ্বত্থ গাছের নীচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম, দৈবক্রমে রাজগৃহের পটভূমিকায় আমাদের সকলের সমবেত হবার কথা। প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রয়োজনে এখানে এসেছিল। ফুলমামা এসেছিলেন, অঙ্গে অঙ্গে ফুটে ওঠা বিষের প্রতিকার করতে। কৃষ্ণপদ এসেছিল তার পান্থনিবাসের পথ চিনতে। বিনয়বাবু এসেছিলেন কুণ্ডের জল পরীক্ষা করতে। মণিমালা এসেছিল বোধহয় বিনয়বাবুকে সঙ্গ দিতে। আমি এসেছিলাম, পাশসুন্দরীর কর্ণবিমর্দনে। সকলের একত্রীভূত সকল প্রয়োজন বানগঙ্গার তীরে প্রশ্ন নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। কিন্তু সকলেই কিছু না কিছু পেল। ফুলমামা পেলেন, ত্রিবেণীসঙ্গমে অর্জিত সকল তাপের অবসানে শান্তিময় শূন্য পরিণাম। বিনয়বাবু আর মণিমালা পেল নতুন পরিচয়ের ভবিষ্যৎ জীবন। কৃষ্ণপদ পেল মসীলিপ্ত মুখে প্রশান্ত হাসি। আর আমি? আমিও পেয়েছি। আর কিছু যদি নাও পেয়ে থাকি, আমার অন্তরে থাকল বিচ্ছেদের বেদনা-ভরা দহন জ্বালা। তাই বা মন্দ কি?

"এই করেছ ভালো, নিঠুর,
এই করেছ ভালো।
এমনি করে হৃদয়ে মোর
তীব্র দহন জ্বালো।"

সমাপ্ত